স্বাস্থ্য সুরক্ষায়
ইসলামের দিক নির্দেশনা : একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মার্চ ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

RB
B
613
MIS

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যায়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ আশরাফুল হক মিয়া কর্তৃক উপস্থাপিত "স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলামের দিক নির্দেশনা : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। আমার জানামতে, এটি একটি মৌলিক গবেষণা এবং এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ ডিগ্রী লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হলো।

465381

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

09.03.2013

(ড. মোঃ মাসুদ আলম)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

ঢাকা
মার্চ ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলামের দিক নির্দেশনা : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে, এই শিরোনামে ইতিপূর্বে কোন গবেষণা হয়নি। এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী লাভ বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

০৭.৩.২০১৩

(মোঃ আশরাফুল হক মিয়া)
এম. ফিল. গবেষক
রেজি নং - ২০১/ ২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

ঢাকা
মার্চ ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়ন পত্র		iii
ঘোষণা পত্র		iv
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		xi
শব্দ সংক্ষেপ		xiii
নির্দেশণা		
ভূমিকা		১৪
প্রথম অধ্যায়	**চিকিৎসা বিজ্ঞানের পূর্বকথা**	**১৭-৪৯**
	বোখরাত বা হিপোক্রীটিস	১৮
	আরাস্ত বা এ্যারিষ্টোটল	১৯
	জালিনুস বা ক্লাডিয়াস গ্যালেন	২০
	স্বাস্থ্য	২২
	সুস্থতা ও অসুস্থতার ধারণা	২২
	আবেগ ও কল্পনার শক্তি	৩১
	রোগ এবং রোগী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি	৩৬
	রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কিত দর্শন	৩৬
	রোগ কল্যাণ লাভের মাধ্যম	৩৭
	রোগ মহান আল্লাহর পরীক্ষা	৩৮
	রোগ ধৈর্য পরীক্ষার মাধ্যম	৩৮
	রোগ গোনাহের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ	৩৯
	রোগ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	৪০
	প্রতিটি রোগেরই ঔষধ রয়েছে	৪১
	মাত্র একটি রোগই দূরারোগ্য	৪২
	রোগী দেখতে যাওয়া ও সেবা শুশ্রুষা করার প্রতিদান	৪৩
	রোগীর সেবা শুশ্রুষা ও দেখার আদব	৪৪
	আমেরিকার কেনেডী হাসপাতালের কার্যবিধি	৪৬
	আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা	৪৬
	রোগীর অন্তিম মুহূর্তের করণীয়	৪৮
দ্বিতীয় অধ্যায় :	**ইসলাম নির্দেশিত জীবন পদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা**	**৫০-৭৭**
	বিবেক বুদ্ধি	৫৭
	খাদ্য, পুষ্টি ও মানবদেহ	৫৮
	মৃত প্রাণী হারাম	৬০

Dhaka University Institutional Repository

রক্ত হারাম	৬০
শূকরের গোশত ও অন্যান্য খাদ্য হারাম	৬০
আল্লাহর নাম ছাড়া যবেহ করা প্রাণীর গোশত হারাম	৬২
শ্বাসরোধ করে হত্যা করা প্রাণীর গোশত হারাম	৬৩
কঠিন আঘাতে নিহত জন্তুর গোশত হারাম	৬৩
উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে আঘাত প্রাপ্ত প্রাণীর গোশত হারাম	৬৩
পশুর লড়াইতে নিহত প্রাণীর গোশত হারাম	৬৩
হিংস্র জন্তুর কামড়ে নিহত প্রাণীর গোশত হারাম	৬৪
দেবীর উপর বলি দেয়া প্রাণীর গোশত হারাম	৬৪
তীর ছুড়ে ভাগ করা গোশত হারাম	৬৪
শিকারী প্রাণী দ্বারা ধৃত প্রাণী যবেহ না করলে গোশত হারাম	৬৪
পুষ্টির উপাদানসমূহ, বৈশিষ্ট্য এবং দেহে তাদের ভূমিকা	৬৭
পুষ্টিতে আমিষের ভূমিকা	৬৮
শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য	৭০
স্নেহ জাতীয় খাদ্য	৭০
সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড	৭১
অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড	৭১
খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন জাতীয় খাদ্য	৭১
ভিটামিন ‘এ’ জাতীয় খাদ্য	৭১
ভিটামিন ‘ডি’ জাতীয় খাদ্য	৭২
ভিটামিন ‘ই’ জাতীয় খাদ্য	৭২
ভিটামিন ‘কে’ জাতীয় খাদ্য	৭২
পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন জাতীয় খাদ্য	৭২
রাইবোফ্লাভিন জাতীয় খাদ্য	৭৩
থায়ামিন জাতীয় খাদ্য	৭৩
নায়াসিন জাতীয় খাদ্য	৭৩
বায়োটিন জাতীয় খাদ্য	৭৪
ফলিক অ্যাসিড জাতীয় খাদ্য	৭৪
ভিটামিন ‘বি’$_{১২}$ জাতীয় খাদ্য	৭৪
প্যান্টোথনিক অ্যাসিড জাতীয় খাদ্য	৭৪
পাইরোডক্সিন ‘বি’$_{৬}$ জাতীয় খাদ্য	৭৪
ভিটামিন ‘সি’ জাতীয় খাদ্য	৭৫
অজৈব পুষ্টি উপাদান	৭৫
লৌহ জাতীয় খাদ্য	৭৫
ক্যালসিয়াম জাতীয় খাদ্য	৭৬
আয়োডিন জাতীয় খাদ্য	৭৬

Dhaka University Institutional Repository

	দানাশস্য জাতীয় খাদ্য	৭৭
	কন্দাল জাতীয় খাদ্য	৭৭
তৃতীয় অধ্যায় :	**পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানুষের খাদ্যদ্রব্য : একটি পর্যালোচনা**	**৭৮-৯৭**
	কুরআনের বর্ণনায় সুষম খাবার	৭৯
	আনার	৮৫
	ত্বীন	৮৫
	আঙ্গুর	৮৫
	যানজাবিল (শুকনা আদা)	৮৬
	সালসাবীল :	৮৬
	যাইতুন	৮৬
	রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পছন্দনীয় খাদ্য দ্রব্য	৮৬
	মধু ও স্বাস্থ্য	৯০
	মধুর এন্টিবায়াটিক কার্যক্রম	৯১
	মধু কিভাবে কাজ করে	৯২
	মধুর বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের রাসায়নিক পরীক্ষা	৯৩
	মধুর রাসায়নিক উপাদান	৯৩
	মধুর ঔষধি গুণাবলী	৯৩
	মধুর পুষ্টিমান ও প্রশান্তিদায়ক গুণ	৯৪
	হজমের জন্য এবং ত্বক ও কেশ চর্চায় মধু	৯৫
	চিকিৎসা বিজ্ঞানে কালোজিরার গুণাবলী	৯৫
	এইচ আইভি প্রতিরোধে গরুর দুধ	৯৭
	ঔষধ হিসাবে লবণের ব্যবহার	৯৭
চতুর্থ অধ্যায় :	**ইসলাম ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান**	**৯৯-১৩৩**
	হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিকিৎসা ব্যবস্থা	১০১
	মেস্ওয়াক বা দাঁত পরিস্কার	১০৩
	মেস্ওয়কের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	১০৫
	অজুর বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর দিক	১০৭
	হাত ধোয়া	১০৮
	মুখ ধোয়া	১০৮
	নাক ধোয়া	১০৮
	মুখোমন্ডল ধোয়া	১০৯
	বাহু ধোয়া	১০৯
	মাথা ও ঘাড় মাছেহ করা	১০৯
	পা ধোয়া	১০৯
	নামাযের স্বাস্থ্যপোকার	১০৯

Dhaka University Institutional Repository

	ফজরে ওঠার স্বাস্থ্যসুবিধা	১১০
	রোযা রাখার স্বাস্থ্যপোকার	১১২
	শারীরিক দিক	১১৪
	মানসিক দিক	১১৫
	সামাজিক দিক	১১৫
	আধ্যাত্মিক দিক	১১৫
	রমযানের খাবার-দাবার	১১৬
	স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাত্না	১১৭
	ইসলামের দৃষ্টিতে খাত্না	১১৭
	চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খাত্না	১১৮
	খাত্না না করলে যে সমস্ত রোগ হয়	১১৯
	খাত্না না করলে এইড্সে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি	১২০
	চিকিৎসা এবং সংযম	১২১
	চিকিৎসা গ্রহণ রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত	১২১
	ব্যাধি ও প্রতিকার	১২১
	স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ	১২৩
	স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ার প্রয়োজনীয়তা	১২৩
	নিয়মিত ব্যায়ামের সুফল	১২৪
	দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার গুরুত্ব	১২৪
	অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব	১২৪
	ব্লাডপ্রেশার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা	১২৫
	রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা	১২৬
	এইচ ডি এল বাড়ানো এবং এল ডি এল কমানোর উপায়	১২৭
	মনমেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনীয়তা	১২৭
	পরিমিত আহার	১২৮
	খাবারের মধ্যে ফুঁক না দেওয়া	১৩০
	হেলান দিয়ে খাদ্য গস্থহণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর	১৩০
	পায়ে হাঁটা এবং আধুনিক বিজ্ঞান	১৩১
	গ্যাষ্ট্রিক	১৩১
	কোষ্ঠকাঠিন্য	১৩২
	অর্শ্বরোগ	১৩২
	মেদভূড়ি	১৩২
	হৃৎপিন্ডের রোগ	১৩২
	অনিদ্রা	১৩৩
পঞ্চম অধ্যায় :	**স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলামী বিধান**	**১৩৪-১৬৭**
	স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিধান	১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

	বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ	১৩৭
	প্রস্রাব আটকিয়ে রাখা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর	১৩৭
	মলমুত্র ত্যাগের পর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	১৩৮
	অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও তার ক্ষতিকর দিক	১৪০
	স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ	১৪২
	জন্মনিয়ন্ত্রণের ভয়াবহ পরিণাম	১৪৪
	হারাম জিনিসের মধ্যে আরোগ্য নেই	১৪৬
	রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অপরিমিত ব্যবহার	১৪৬
	বিষের মধ্যে বসবাস	১৪৮
	ক্ষতিকর ঔষধ ব্যবহার না করা	১৪৯
	মাছিবাহিত বিভিন্ন রোগের কারণ ও চিকিৎসা	১৫০
	বসে কাজ করলে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে	১৫০
	সকালের নাস্তা না খেলে চর্বি বাড়ে	১৫১
	টেলিভিশন দেখলে আয়ু কমে	১৫২
	হাতুড়ে ডাক্তার	১৫২
	মেকআপের ক্ষতি	১৫৩
	লিপিস্টিকের ক্ষতি	১৫৪
	নখপালিশের ক্ষতি	১৫৪
	নখ লম্বা করা	১৫৫
	সুগন্ধি ও তার ব্যবহার	১৫৫
	শরাব বা মদ সভ্যতা ও মানবতার দুশমন	১৫৬
	হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধে ইসলামের বিধান	১৫৮
	ক্রোধ, স্বাস্থ্য ও ইসলাম	১৬১
	অনাড়ম্বর জীবন	১৬৩
ষষ্ঠ অধ্যায় :	**ইসলামের আলোকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার কতিপয় দিক নির্দেশনা**	**১৬৮-১৮১**
	শরীর ও মন উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ	১৬৯
	অসুস্থ মন সকল অপকর্মের মূল	১৬৯
	দেহ ও মন সম্পর্কযুক্ত	১৭০
	শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ	১৭০
	অন্তর-রোগের চিকিৎসা	১৭০
	রোগের লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন ও সেবন কর্তব্য	১৭১
	রোগ নয়, রোগী চিকিৎসার বিষয়	১৭১
	রোগ চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ করা শ্রেয়	১৭১
	রোগী দেখতে যাওয়া	১৭১
	সদ্য আরোগ্য লাভকারী ব্যক্তির জন্য দ্রুত হজম যোগ্য খাদ্য উত্তম	১৭২
	রাতের খাবারের গুরুত্ব	১৭২

Dhaka University Institutional Repository

	মিস্‌ওয়াকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১৭২
	অজু একটি স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি	১৭৩
	নামায একটি স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি	১৭৩
	রোযা একটি স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি	১৭৩
	খাদ্য গ্রহণের নিয়মাবলী	১৭৪
	স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন	১৭৪
	সুস্থ থাকতে হলে নিয়মিত ব্যায়াম প্রয়োজন	১৭৪
	দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণ	১৭৪
	নেশার অভ্যাস ত্যাগ	১৭৫
	ব্লাডপ্রেশার নিয়ন্ত্রণ	১৭৫
	রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ	১৭৫
	রক্তের এইচ ডি এল বাড়ানো এবং এল ডি এল কমানোর উপায়	১৭৫
	মনমেজাজ নিয়ন্ত্রণ	১৭৬
	শিশুর মেধা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয়	১৭৬
	অবৈধ যৌন সম্পর্ক ত্যাগ	১৭৭
	জন্মনিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন ব্যাধির উৎস	১৭৭
	রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বর্জন	১৭৮
	বিষাক্ত কেমিক্যাল পরিহার	১৭৮
	লিপিস্টিক পরিহার	১৭৮
	নখপালিশের ব্যবহার পরিহার।	১৭৯
	নিয়মিত নখ কাটা	১৭৯
	ক্ষতিকর সুগন্ধি বর্জন	১৭৯
	নিয়মিত হাঁটা	১৭৯
	হৃদরোগ প্রতিরোধে ইসলামের বিধান	১৮০
	সাধারণ জীবন-যাপন	১৮০
	সুস্থ থাকার সহজ উপায়	১৮১
উপসংহার :		১৮২
গ্রন্থপঞ্জি :		১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার যিনি জগৎসমূহের মালিক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যার অশেষ মেহেরবানীতে আমি **"স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলামের দিক নির্দেশনা : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক এম. ফিল. অভিসন্দর্ভটি যথাসময়ে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অগণিত দরূদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবেন তাঁদের প্রতি।

যথাযথ সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব ড. মোঃ মাসুদ আলম এর প্রতি যিনি আমাকে হাতে কলমে গবেষণাকর্ম শিখিয়েছেন। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও যিনি আমার গবেষণাকর্মের তদারকি করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। যিনি নিরলস পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে এ অভিসন্দর্ভটির প্রতিটি লাইন পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটি প্রাণবন্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, গবেষণা পদ্ধতি, অধ্যায়, উপাধ্যায় বিন্যাস এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁরই আন্তরিক সহযোগিতার কারণে। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়া আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সকল শিক্ষকের প্রতি।

গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মরহুম আজিজুল হক মিয়া, দাদী মরহুমা আয়েশা বেগমকে যাদের অকৃত্রিম ত্যাগ ও ভালবাসায় আজ আমি এ পথে আসতে পেরেছি। স্মরণ করছি আমার মরহুম নানা আব্দুল কুদ্দুস মোল্লা ও মরহুমা নানী মোমেনা বেগমকে যাদের স্নেহ ও ভালবাসা সব সময় আমার সঙ্গে রয়েছে। সর্বাত্মক শ্রদ্ধা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মোঃ জহুরুল হক মিয়া ও মাতা কামরুন্নাহারকে যাদের অপরিসীম আত্মত্যাগ ও দু'আর বরকতে মহান আল্লাহ আমাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। আমি তাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবন কামনা করছি। আমি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর বিশিষ্ট ব্যাংকার, মোঃ আতিয়ার রহমান বিশ্বাসকে। যিনি আমাকে অত্র গবেষণাকর্মে সার্বক্ষণিক উৎসাহ যুগিয়েছেন। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় শ্বাশুড়ি মোছাঃ আম্বিয়া খাতুনকে তিনি আমার গবেষণাকর্মের সময় আমার কন্যা আতিকা মাহ্জাবিন ও পূত্র ইমাম আশরফের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সহধর্মিনী রোকসানা পারভীন রিপাকে যার অকৃত্রিম ত্যাগ, ভালবাসা ও অনুপ্রেরণা আমার এ গবেষণাকর্মকে সুন্দর করেছে। আমার গবেষণাকর্ম নির্বিঘ্নে করার ক্ষেত্রে তার ত্যাগ অতুলনীয়।

আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার বড়বোন শাহীনা আক্তার বেনু, মেজবোন শিরীনা আক্তার লিনু এবং ছোটবোন শারমীনা আক্তার অনুকে। যারা আমার জন্য সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধা করেনা। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার মামা মোঃ আমজাদ হোসেন মোল্লা ও মামী রাশিদা খাতুন কে যারা আমার অন্যতম শুভাকাঙ্খী। স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় চাচা শিক্ষাবিদ মোঃ মতিনুল হক বাবুকে তিনি শিশুকালে আমার জন্য অনেক ত্যাগ শিকার করেছেন। আমি তাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গল কামনা করছি। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান, সহকারী অধ্যাপক, জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ এর প্রতি। তিনি আমাকে অত্র গবেষণাকর্ম দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যাপারে অনেক উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শুভাকাঙ্খী জনাব মোঃ সাইফুল ইসলামের প্রতি যিনি নিজেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. গবেষণারত। তিনি সর্বক্ষণ আমাকে পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি যে সকল দেশী বিদেশী লেখকগণের রচনার সাহায্য নিয়েছি তাদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। অভিসন্দর্ভের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা নিয়েছি। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সবশেষে আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

মহান আল্লাহ্ তাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন।

মোঃ আশরাফুল হক মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

আল-কুরআন ১০:২০	প্রথম সংখ্যা সূরা ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের
আ.	'আলাইহিস্ সালাম
ইমাম বুখারী	আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী
ইমাম তিরমিযী	আবূ'ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আত-তিরমিযী
ইমাম আবূ দাউদ	আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশআছ আস-সিজিস্তানী
ইমাম নাসাঈ	আহমদ ইব্ন শু'আইব আন-নাসাঈ
ইমাম ইব্ন মাজাহ্	আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী
ইমাম আহমাদ	আহমাদ ইব্ন হাম্বল
ইমাম ত্বাহাবী	আবূ জা'ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আ-ত্বাহাবী
ইব্ন কাছীর	আবূল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাছীর
ইব্ন জারীর	আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী
ই. ফা. বা.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কুরতুবী	আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন ফার্‌রাহ আল-কুরতুবী
তাবারানী	আবুল কাশেম সুলায়মান ইব্ন আহম্‌দ আত-তাবারানী
বায়হাকী	আহমাদ ইব্ন হুসাইন আল-বায়হাকী
যাহাভী	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন 'উছমান আয-যাহাভী
রাযী	আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'উমর ইবনুল হুসাইন আত-তামিমী ফখরুদ্দীন আর-রাযী
শাওকানী	মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আশ-শাওকানী
খ্রি. পূ.	খ্রিস্ট পূর্ব
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ
হি	হিজরি
ব.	বঙ্গাব্দ
তা. বি.	তারিখ বিহীন
রহ. / র.	রহমাতুল্লাহ আলাইহি
রা.	রাদিয়াল্লাহু 'আনহু/ 'আনহুম/ 'আনহা/ 'আনহুমা/ 'আনহুন্না
সা.	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বি. দ্র.	বিস্তারিত দ্রষ্টব্য
ed.	Ediotor (s) / Edited
Ibid	ibidem
N.B	Note bene
N.D	No Date

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম বিধান দান করেছে। মানব জীবনের সকল কর্মকেই ইসলাম ইবাদত বলে আখ্যায়িত করেছে যদি তা মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নীতি আদর্শ অনুস্মরণে হয়। তাই দেখা যায় মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও গবেষণা এবং এর প্রচার প্রসারের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করেছেন। পাশাপাশি ইসলামে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এত বেশী তথ্য উপাত্ত ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও মুসলিম জাতি আজ অন্যান্য জাতির থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। ইসলামী নীতির আলোকে চিকিৎসা সেবা পরিচালিত না হওয়ায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে মিথ্যা, অসততা, ধোঁকা ও প্রতারণা, সনদ বিহীন চিকিৎসক, ভেজাল ঔষধ ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। জনজীবনে সৃষ্টি হয়েছে দুর্ভোগ।

বিশ্বের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানব জাতির মধ্যে ব্যাধি এসেছে অতি ধীরে-ধীরে। জন্ম যখন হয়েছে আল্লাহর বিধানে, মৃত্যুও ঘটবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এটাই স্বাভাবিক মৃত্যু বলে ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু জন্ম গ্রহণের পর শিশুকালে, কিশোর বয়সে, যৌবনে বা যৌবনের পর যে অপরিণত বয়সে মৃত্যু, সেটা অস্বাভাবিক এবং প্রতিটি মানুষের জন্যই অবাঞ্ছিত বেদনাদায়ক ঘটনা। কিন্তু এই অবাঞ্ছিত মৃত্যুর জন্য অনেকাংশেই দায়ী আমাদের মানব সমাজ। সৃষ্টির পর থেকে মানুষ যতই প্রকৃতি বিমুখ হয়েছে ততই তার মধ্যে রোগ গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমশঃ সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছে মানব শরীরে রোগ-ব্যাধি। মানুষের মধ্যেই প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মকাল থেকেই রোগ প্রতিরোধ শক্তি সঞ্চারিত আছে। যে শক্তি মানুষকে বাইরের নানা রোগ-ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। মানুষ যে সময় থেকে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ বা প্রকৃতির আশ্রয় থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে লাগলো, আশ্রয় নিল নানা কৃত্রিমতার তখন থেকেই তার অভ্যন্তরস্থ ঐ শক্তিও দুর্বল হতে থাকলো আর দেহ-মনে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার উপস্থিতি আরম্ভ হলো। আচারে-ব্যবহারে, বেশ-ভূষায়, আহারে-বিহারে, নিত্যকর্মে এহেন কৃত্রিমতার ফলে মানুষ ক্রমান্বয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট করলো, আর মানব শরীরের প্রতিরক্ষা শক্তির বিকৃতির কারণে নানা প্রকার অসুস্থতা আশ্রয় পেতে থাকলো। আজকের চিকিৎসা শাস্ত্রে যে অসংখ্য রোগের নাম আমরা জানতে পারছি তার মূল কারণ হলো প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ। এ বিরুদ্ধাচরণের ফলে মানুষের মধ্যে প্রকৃতি প্রদত্ত প্রাণশক্তি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছে। হাজারো ব্যাধির কবলে পড়ে বর্তমানে মানুষ একান্ত অসহায় অবস্থায় নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে মৃত্যুবরণ করছে, অথচ অল্প সংখক তরুণ রোগ ও অপারেশনের নামে অঙ্গকর্তন ব্যতিত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আদর্শ কোন দিক নির্দেশনা দিতে চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত সক্ষম হয়নি। মানবকুল যদি প্রকৃতির বিধান অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার বিধান তথা ইসলামের বিধি-বিধান সঠিকভাবে পালন করে, তাহলে আবার হারানো সবল প্রাণশক্তি ফিরে পেতে পারে। পরিত্রাণ পেতে পারে জীবন ধ্বংসকারী ব্যাধি, যথা: সিফিলিস, গনোরিয়া, এইড্স, ক্যান্সার, মানসিকসহ বিভিন্ন প্রকারের যন্তনাদায়ক মরণ ব্যাধি হতে। কর্মময় জীবন ইসলামের আলোকে পরিচালিত হলে গোটা মানব জাতি কঠিন যন্ত্রদায়ক ব্যাধি হতে রক্ষা পেতে পারে। সে কারণে বিশ্ব মানবতাকে কঠিন যন্ত্রদায়ক ব্যাধি হতে রক্ষা এবং অধিকতর সুখী ও

Dhaka University Institutional Repository

স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন লাভ করতে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলামের দিক নির্দেশনা জানাতে পারলে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হবে।

জনগণ সাধারণত ইসলামকে শুধুমাত্র একটি ধর্ম হিসাবে জানে। মুসলিম জন-সাধারণের মধ্যে যারা নামাজ-রোজা করে তাদের মধ্যেও অনেকে বাস্তব জীবনে এর কোনো প্রভাব আছে বলে ধারণা রাখেনা। জন-সাধারণ আলেম সমাজ থেকে ইসলামের যে আলো পেয়েছে এবং তাঁরা দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন এর সামান্যই তারা গ্রহণ করেছে। মানুষের জীবনের বহু দিক রয়েছে যেগুলোকে তারা ইসলাম হতে আলাদা মনে করে, অন্যান্য ধর্মে অবশ্য ঐসব দিক ধর্ম হতে আলাদা। ইসলামে ধর্মীয় দিকটি অন্যান্য দিক থেকে আলাদা নয় বরং সকল দিকই ধর্মীয় দিকের নিয়ন্ত্রণে। স্বাস্থ্যগত দিকটিও এর অন্তর্ভূক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন মানব জাতির ত্রানকর্তা হিসাবে। তিনি প্রথাগত চিকিৎসক না হয়েও মানব জাতির শিক্ষক হিসেবে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে রেখে গেছেন এক অমূল্য স্বাস্থ্য নীতি। আজ হতে প্রায় ১৫০০ (পনের শত) বৎসর পূর্বে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসের মাধ্যমে মানব জাতির সুস্বাস্থ্যের জন্য যে অমূল্য বিধান রেখে গেছেন বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা তা দেখে বিস্ময়ে অবিভূত। বর্তমান যুগে এর সংকলন, সংরক্ষণ, গবেষণা ও ইসলামের অন্যান্য বিধানের মত মেনে চলা অপরিহার্য।

অধিকাংশ লোকই দু'টি নেয়ামত হতে বঞ্চিত একটি স্বাস্থ্য, অপরটি অবসর। স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও অসুস্থতা কি ? কিভাবে মানবের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় ? এর পরিণতি কি ? আধুনিক ও ইসলাম নির্দেশিত জীবন পদ্ধতি ও বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায়। ইসলামে স্বাস্থ্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ও বর্জন স্বাস্থ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে খাদ্যদ্রব্যের সঠিক ব্যবহার ও উপকারিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিধি বিধান ও পুনরুদ্ধারের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য মুসলিমদের সৎ ও আদর্শ চিকিৎসা সেবা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তাদের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এ দেশের স্বাস্থ্য সুরক্ষার অবস্থা খুবই নাজুক। ফলে সাধারণ জনগণ স্বাস্থ্যসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

অভিসন্দর্ভটির অবয়ব সুন্দর ও আকর্ষনীয় করার জন্য এর বিষয়বস্তুকে ছয়টি অধ্যায়ে সুবিন্যাস্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের পূর্বকথা' শিরোনামে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও অসুস্থতা, রোগ ও রোগী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কিত দর্শন, রোগী দেখতে যাওয়া ও সেবা শুশ্রূষা করার প্রতিদান, রোগীর অন্তিম মুহুর্তে করণীয় ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
'ইসলাম নির্দেশিত জীবন পদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা' শিরোনামে অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানুষের খাদ্যদ্রব্য : একটি পর্যালোচনা' শিরোনামে অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

'ইসলাম ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান' শিরোনামে অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

'স্বাস্থ্য সুরক্ষার ইসলামী বিধি-বিধান' শিরোনামে অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলামের আলোকে কতিপয় দিক নির্দেশনা' তুলে ধরে প্রয়োজনীয় সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

শেষ পর্যায়ে উপসংহার শিরোনামে অভিসন্দর্ভের মূল বক্তব্যকে অতিসংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে একটি সুবিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জিতে গবেষণাকর্মে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে এমন বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির বিস্তারিত তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরিশেষে বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভের পরিধিভুক্ত তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভিসন্দর্ভকে গবেষণার স্তরে উন্নীত করার যথার্থ চেষ্টা করা হয়েছে। অত্র গবেষণাকর্মটি মানুষের স্বাস্থ্য বিষয়ক জানার পরিধিকে যেমন বিস্তৃত করবে তেমনি জ্ঞানের জগতে এটি একটি নতুন সংযোজন হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি আরো বিশ্বাস করি যে, আলোচিত বিষয়ের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিচালিত হলে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ সহ সমগ্র বিশ্ব সুখ ও শান্তিতে ভরে যাবে। অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভে মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ইসলামের আলোকে এমন কিছু দিক-নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে যা দ্বারা মানুষ সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারে। পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক বহুবিধ রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে পারে। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর নির্দেশ ও প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লমের আদর্শ মোতাবেক চিকিৎসা বিজ্ঞান সহ জীবনের সার্বিকক্ষেত্র পরিচালনার তাওফীক দান করুন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

চিকিৎসা বিজ্ঞানের পূর্বকথা

প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও গবেষণার মাধ্যমেই বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান, পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও বিস্তার লাভ করে। প্রাক সভ্যতার যুগে অর্থাৎ বাইজেন্টাইন, মিশর, ভারত উপমহাদেশ এবং চীনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা ও মৌলিকত্ব সুবিদিত। ৩০০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে প্রাচীন চীন দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা হয়।[১] সে সময়ের অনেক চিকিৎসক বিভিন্ন অঙ্গের চিকিৎসা করতেন। অবাক হতে হয়, তারা কাউচিং পদ্ধতিতে চোখের ছানিরও অপরেশন করতেন।

২৩০৩ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে বাইজেন্টাইনের চিকিৎসাবিদরা সাধারণ চিকিৎসার বিভিন্ন ঔষধপত্র, তার গুনাগুণ লিপিবদ্ধ করা ছাড়াও বিভিন্ন রোগের ছোট-খাট অপারেশণের বর্ণনা করে গেছেন। সে যুগে তাদের একটি চিকিৎসা সংস্থাও ছিল। শৈল্য চিকিৎসার বিশদ ব্যাখ্যা ১৭০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে পাপিরাসে (পাপিরাস-প্রাচীন কালে ব্যবহৃত কাগজের মত এক প্রকার গাছের বাকল) চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে গেছেন বলে গবেষণায় জানা যায়। ঐ সময়ে মিশরে অনেক খ্যাতিমান চিকিৎসক ছিলেন। ১৫৭০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসকরাও পাপিরাসে চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্রাচীন যুগের পর গ্রীক সভ্যতার যুগ শুরু হয়। এ সময় গ্রীকরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। গ্রীক চিকিৎসাবিদদের মধ্যে যাঁরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে হিপোক্রীটিস, এ্যারিষ্টোটল, ক্লাডিয়াস গ্যালেনের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

বোখরাত বা হিপোক্রীটিসঃ মানুষের মনের অন্ধকারে যারা জ্ঞানের আলো জ্বেলে বিশ্ববাসীকে করেছে আলোকিত, হিপোক্রীটিস তাঁদের অন্যতম। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদান রেখে উজ্জল নক্ষত্রের মতো দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। ক্ষণজন্ম এই মহামনিষী ৪৬০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে অ্যাপিয়ান সাগরের 'কচ দ্বীপে' জন্ম গ্রহণ করেন।[২] তখনকার চিকিৎসাবিদ্যাকে বলা হত গুপ্তবিদ্যা। তখনকার যুগে পিতা শুধুমাত্র তার সন্তানকে এ বিদ্যা শিক্ষা দিত। হিপোক্রীটিস ছিলেন এমনই এক চিকিৎসক পিতার সন্তান। তাঁর সমসাময়িক সময়ে গ্রীসে সক্রেটিস, এ্যাসকাইলাস এবং কয়েক বছর পরে সোফেক্লিস, প্লেটোর মতো মহান দার্শনিকগন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের জ্ঞানের আলো এবং মুক্ত স্বাধীন চিন্তা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। শিক্ষার সূত্রপাত পিতার নিকট হতে শুরু হয়। পিতার নিকট থেকে যাবতীয় শিক্ষা অর্জন শেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এথেন্স গমন করেন। সেখানে তিনি সেই যুগের অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি ডিমোক্রিটাসের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি গড়ে তোলেন, যার ভিত্তি ছিল যুক্তি, সততা, প্রত্যক্ষজ্ঞান আর বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা ভাবনা। ফলে অল্প দিনের

---

[১] ডাক্তার এম. এ. ওয়াহেদ, *চক্ষু চিকিৎসার বিকাশে ইসলামের অবদান,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ খ্রি. পৃ. ১

[২] ডা. ইবনে আখতার, *যুগে যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানী,* মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকাঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ খ্রি. পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে সমগ্র গ্রীসেই তাঁর চিকিৎসার সুনাম জনগণের নিকট পৌঁছে যায়। তাঁর পূর্বে চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রীকদেশে কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম পরিবারতান্ত্রিক শিক্ষাব্যাবস্থা ভেঙ্গে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় রুপান্তর করেন। প্রায় একই সময়ে তিনি রোগীকে পরীক্ষা করার বিভিন্ন পদ্ধতি নির্ণয় করেন এবং চিকিৎসকেরা যাতে তাদের সুমহান আদর্শ থেকে বিচ্যুতি না হন সে জন্য তিনি চিকিৎসকদের জন্যে একটা আইন প্রণয়ন করেন যাকে "Hipocretes Outh" বলা হয়।[৩] বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের লেখাপড়া শেষে নব্য চিকিৎসকদের এই শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অবশেষে এই মহান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ৩৬৩ মতান্তরে ৩৬৫ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে[৪] এই ধরণী হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

আরাস্ত বা এ্যারিষ্টোটল : এ্যরিস্টটলকে আধুনিক জীব বিজ্ঞানের জনক[৫] বলা হয়। বিশ্ববিজয়ী বীর সম্রাট আলেকজান্ডার দূঃখ করে বলেছিলেন, জয় করবার মত পৃথিবীর আর কোন দেশ বাকি রইল না। তাঁর শিক্ষক মহাপন্ডিত এ্যারিস্টটল সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। জ্ঞানের এমন কোন দিক নেই যার তিনি পথপ্রদর্শক নন।চিকিৎসা বিজ্ঞানেও তাঁর অসাধারন অবদান রয়েছে। ৩৮৪ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে[৬] এ্যারিষ্টোটল গ্রীসের অন্তর্গত স্তাজেইরা শহরে[৭] জন্ম গ্রহণ করেন। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটোর শিক্ষালয়ে এ্যারিস্টটল শিক্ষা গ্রহণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই নিজের যোগ্যতায় তিনি হয়ে উঠেন একাডেমির একজন সেরা ছাত্র। প্লেটোও তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হন। তিনি নানা বিষয়ে গবেষণার কাজ করতেন। তর্কবিদ্যা, অধিবিদ্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞান ও পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি জীব বিজ্ঞানের মৌলিক সংজ্ঞা, লিঙ্গভেদ, বংশধারা, ক্রমবিকাশ এবং শোষণ ক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
তিনি দেহ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার ব্যপারে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বেশির ভাগ পুস্তকাদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপরই লিখেছেন। আলেকজান্ডার যখন এশিয়া জয়ের নেশায় সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হলেন, এ্যারিস্টটল তখন নিজ জন্ম ভূমি এথেন্সে ফিরে গেলেন। এথেন্স তখন শিল্প-সংস্কৃতি শিক্ষার পীঠস্থান। তিনি সেখানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর বয়স যখন পঞ্চাশ বছর তখন বীর ছাত্র আলেকজান্ডারের আকস্মিক মৃত্যু হল। এতদিন বীর ছাত্রের ছত্রচ্ছায়ায় যে জীবন-যপন করতেন তাতে বিপর্যয় নেমে এল। কয়েকজন অনুগত ছাত্রের মাধ্যমে জানতে পারলেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সক্রেটিসের অন্তিম পরিনতির কথা তাঁর অজানা ছিল না। তিনি গোপনে এথেন্স ত্যাগ করে ইউরিয়া দ্বিপে আশ্রয় নেন। অবশেষে সেচ্চানির্বাসনের যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে ৩২২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

---

[৩] ডাক্তার এম. এ. ওয়াহেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
[৪] ডা. ইবনে আখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
[৬] ডাক্তার এম. এ. ওয়াহেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
[৭] ডা. ইবনে আখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

জালিনুস বা ক্লাডিয়াস গ্যালেন : ৯৫ অথবা ১৩০ খৃষ্টাব্দে ক্লাডিয়াস গ্যালেন ইউনান বা গ্রীকে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবন শুরু করেন গ্রীক ও ইসকান্দারিয়ায় (আলেকজান্দ্রিয়ায়)। তিনিই সর্বপ্রথম গিনিপিগের দেহ ব্যবচ্ছেদ করেন এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধারণা বিষয় ভিত্তিক লিপিবদ্ধ করেন। তিনি শল্য চিকিৎসা বা সার্জারী বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি মানুষ ব্যতিত জীবজন্তুর মরদেহ ব্যবচ্ছেদ করেন। তিনি চিকিৎসক হিসাবে খুবই সুনাম অর্জন করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ ছিল। তিনি কাউচিং পদ্ধতিতে চোখের ছানি অপারেশন করতেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। জগৎ বিখ্যাত প্রাচীন এই চিকিৎসা বিজ্ঞানী ১৬০ অথবা ২০০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৮]

রোমীওরা গ্রীকদের চাইতে আরেক ধাপ অগ্রসর হয়। তারা গ্রীক সভ্যতার বহু নিদর্শন ও বই-পুস্তক ধবংস করে দেয়। তবে কিছু কিছু রোমীও চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধন করেন। ইসলামের আগমনের পর গ্রীক সভ্যতার স্বর্ণ-যুগের অবসান ঘটে।

গ্রীক সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুতার শুরু হয় ইসলামের আশ্চর্য রকম গৌরবদীপ্ত যুগে। সপ্তম শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তাঁরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, ললিতকলা, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও দর্শনে স্বর্ণ-যুগের সৃষ্টি করেন। ৫৭০ ঈসায়ী সালে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট মহামানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তিনি যাযাবর ও কালিমালিপ্ত আরব জাতিকে সভ্য ও সুসংহত জাতিতে পরিণত করেন। মুসলমানদের তিনি এক সাধনালিপ্ত জাতিতে পরিণত করবার পথে সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করেন। জীবনবোধ ও সঠিক পদক্ষেপে মুসলমানগণ এক জ্ঞান উদ্বুদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়। আরবী ভাষা সমৃদ্ধি ও বিস্তারের এক আন্তর্জাতিক সীমারেখা নির্ধারিত হয়। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে সহায়তা করে। তাছাড়া হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবনে, হাতে কলমে এক আদর্শ, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রূপরেখা দিয়ে যেতে সমর্থ হন। ফলে পূর্ণাঙ্গতা আসে সৃজনশীল জীবন বিন্যাসে। ইসলামের দাওয়াত কবুল করে চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন জাতি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে থাকে এবং বিস্ফোরণের মত ইসলাম সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

অষ্টম শতকে বাগদাদকে কেন্দ্র করে এক বিরাট ইসলামী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ব্যাপকতার সীমা কাঠামোর এ যুগ মহান সাধনার ক্ষেত্রে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। একে ঐতিহাসিকগণ জ্ঞানের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেছেন। বাগদাদ সভ্যতার শিখরে উঠে যায়। বাগদাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত হয়। দর্শন, সাহিত্য, ললিতকলা, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ে উন্নীত হয়। খলিফা আল-মনসূর (৭৫৪-৭৭৫), খলিফা হারুন-অর রশীদ (৭৮৬- ৮০২), খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩) এবং পরের খলিফাদের সময়ে অর্থাৎ ৭৫৪ থেকে ১২৫৮ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল স্বর্ণযুগ ছিল।[৯] তখন থেকেই সাধনা ও অনুশীলনের ক্রম-বিকাশ ঘটে। এ সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ও চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য বড় বড় হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। হাসপাতাল বিন্যাস ও পরিচর্যায় উৎকর্ষতা লাভ করে, যার নিদর্শন আজও বর্তমান। এ যুগে আরবরা প্রাগৈতিহাসিক গ্রীক ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি উদ্ধার করে এবং সেগুলো

---

[৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[৯] ডাক্তার এম. এ. ওয়াহেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষায় অনুবাদ করে। ভাষা হিসাবে আরবীর তখন পুরা যৌবন। তখন পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ এলাকার লোক এই ভাষায় কথা বলে। যে অবদান অন্ধকারে ছিলো, মানব কল্যানে মুসলমানগণ তা বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরেন। তাঁরা বিরাট খেলাফতের বিভিন্ন স্থানের পন্ডিতগণের নিকট সাধনালব্দ এই সব আরবী অনুবাদ বিলিয়ে দেন জ্ঞান চর্চার জন্য। গবেষক, জ্ঞানী, গুণী ও পন্ডিতগণ চমকিত হন। আকৃষ্ট হন নব নব জ্ঞান অনুশীলনে। জ্ঞান-বিজ্ঞান নতুন রূপ ধারণ করলো। মানুষ জ্ঞান পিপাসা নিবারণার্থে ভীড় জমালো। মুসলমান এক উদর জাতি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে পৃথিবী এ নজীর-বিহীন উদারতা আর দেখেনি। তখন মুসলমানগণ নব নব গবেষণার মাধ্যমে অনেক মৌলিক তথ্য ও উপাদান সংযোজন করে নতুন বিজ্ঞান সৃষ্টি করেন।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মহান সৃষ্টিকর্তার চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন নির্দেশনা এবং বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন হাদীসের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান এক নতুন রূপ লাভ করে। সপ্তম শতক থেকে ১৬৮০ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত বহু মুসলিম গুণিজন চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উম্মোচন করে আরেক দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর জন্য রেখে গেছেন ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। মুসলিম চিকিৎসাবিদদের মধ্যে যাঁরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য অমর হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে হালাফ আল-তুলুনি (৮৪২-৮৯৭), আলী ইবনে রাববানী আত-তাবারী (জন্ম ৮৫০), আবুবকর মুহাম্মাদ জাকারিয়া আল-রাজী (জন্ম ৮৬৫), আবূল কাসেম বিন্ আব্বাস আল জাহরবী (৯৩৬-১০১৩), আলী ইবনে ঈসা (৯৫০-১০১০), আলী ইবনুল আব্বাস (৯৬০-৯৯৪), আবূ আলী আল হাসান ইবনুল হায়সাম (৯৬৫-১০৪৩), আবূ মনসুর (জন্ম ৯৭০), আবূল কাসেম আমর বিন আলী আল মাওয়াসিসী (জন্ম ৯৭০), আবূ আলিয়ুল হুসায়ন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সী'না (৯৮০-১০৩৮), আবেন গুফেট (৯৯৮-১০৪৭), আবূ রূহ (জন্ম ১০৭০), উসায়বী (জন্ম ১২০৩), আবূল হাসান আলাউদ্দীন আলী ইবনে আবূল হাসেম ইবনে নফিস (১২১০-১২৮৮), আসসামরকান্দি (মৃত্যু ১০৯৫), আবূ ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহম্মদ ইবনে রূশদ (১১২৬-১১৯৮), শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন সৈয়দুল আন্সারী, হালিফা বিন আবূল মহসীন আল হালাবী, কামাল উদ্দিন হাসানুল ফারেসী, মুমিন বিন মকবুল (জন্ম ১৪২২), হাফেজ হাসান আফেন্দী (১৭২৮-১৮০১) নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

এ ছাড়া আরো অনেক চিকিৎসক ছিলেন, যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদানের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ অবদানের কারণে সে বিষয়ে পরিচিতি লাভ করেন। চিকিৎসার পাশাপাশি দর্শন, রসায়ণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর যারা পরিচিতি লাভ করেন, তাঁরা হলেন আবুবকর মুহাম্মদ ইয়াহইয়া ইবনে বাজা। তিনি পাশ্চাত্যে আভেম পোস নামে খ্যাত, আল কিন্দী, পূর্ণ নাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল কিন্দী, ইমাম আবু হামিদ মুহম্মদ আল গাযালী, তিনি আল গাজ্জালী নামে বিশ্বের দরবারে বিশেষ ভাবে পরিচিত। ওমর খৈয়াম, আল বিরুণী প্রমুখ রসায়ণবিদ, জ্যোতিষী ও ঐতিহাসিক রূপে খ্যাতি লাভ করলেও তাঁরা একেক জন বড় মাপের চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছিলেন। জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে এ প্রতিভাধর চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবাক করার মতো যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা সত্যিই বিরল। আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞানে যা কিছু অবদান তার সিংহ ভাগই তাঁদের।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্য

Health is man's most valuable possession because it influences all the activities. It is the solid foundation on which a man's happiness rest. Health is a resource in which the whole community has a stake and it is desirable to maintain and promote it.[10]

স্বাস্থ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা; শুধু কোন রোগ বা অক্ষমতার অনুপস্থিতিই নয়। অর্থাৎ কোন ব্যাক্তির শরীরে কোন রোগ বা অক্ষমতা না থাকলেই যে তিনি স্বাস্থ্যবান বা সুস্থ, তা ঠিক নয়। সুস্থ হতে হলে তাঁকে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে হবে। এর সাথে আধ্যাত্মিক দিকের কথাও বলা হয়। কিভাবে আমরা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ থাকতে পারি? শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর খাবার, ব্যায়াম, বিশ্রাম ইত্যাদি। মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের জন্য চায় সুস্থ শরীর, সুস্থ সমাজ।

সুস্থতা ও অসুস্থতার ধারণা

'শারীরিক ও মানসিক সুস্থ অবস্থার নামই স্বাস্থ্য'। 'স্বাস্থ্য' মহান আল্লাহর দেওয়া একটি বিশেষ নিয়ামত।[১১] মহান আল্লাহ দেওয়া নিয়ামতের মধ্যে ঈমানের পরেই স্বাস্থ্যের স্থান। অতএব এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। অপরদিকে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার অবস্থার নাম রোগ-ব্যাধি। Disease is a disordered condition of mind or body.[১২]

A disease is an abnormal condition affecting the body of an organism. It is often construed to be a medical condition associated with specific symptoms and signs. It may be caused by factors originally from an external source, such as infectious disease, or it may be caused by internal dysfunctions, such as autoimmune diseases. In humans, "disease" is often used more broadly to refer to any condition that causes pain, dysfunction, distress, social problems, or death to the person afflicted, or similar problems for those in contact with the person. In this broader sense, it sometimes includes injuries, disabilities, disorders, syndromes, infections, isolated symptoms, deviant behaviors, and atypical variations of structure and function, while in other contexts and for other purposes these may be considered distinguishable categories. Diseases

---

[১০] S. Dheer, Dr. Mitra Basu, *Indruction to Health Education,* Frends publications, 6, Mukherjee Tower, Mukherjee Nagar, com. Complex, Delhi: 110009, India. N.D, P.4

[১১] প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুয্ যমান, *তিব্বে নববী (স)*, হক লাইব্রেরী, বাইতুল মুকাররম, ঢাকা: মার্চ ২০০২ খ্রি. পৃ. ১৫

[১২] Prof. Md. Nur nobi, *Oxford Dictionary of contemporary English,* Joneki prokashani, Dhaka: March 2012

Dhaka University Institutional Repository

usually affect people not only physically, but also emotionally, as contracting and living with many diseases can alter one's perspective on life, and their personality.[১৩]

A disordered or incorrectly functioning organ, part, structure, or system of the body resulting from the effect of genetic or developmental errors, infection, poisons, nutritional deficiency or imbalance, toxicity, or unfavorable environmental factors; illness; sickness; ailment.[১৪]

স্বীয় স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার মৌলিক নীতিমালা সমূহ মেনে চলা মানুষের জন্য একান্ত কর্তব্য। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাহি ওয়া সাল্লাম স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং স্বাস্থ্যের হিফাযত ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার মৌলিক বিধি-বিধান সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে অত্যন্ত সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক ও উপকারী বস্তুনিচয় এবং সে সকল বিষয়াবলী চিহ্নিত করে দিয়েছেন, যা স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরী। সুস্থ থাকার চেষ্টাটা থাকতে হবে নিরন্তর। কারণ অসুস্থ হলে কষ্ট এবং খরচ দুটোই বৃদ্ধি পায়। সুস্থ থাকার চেষ্টা করাটা খুব কঠিন কাজ নয়। স্বাস্থ্যকর খাবার, সুস্থ অভ্যাস, প্রাকৃতিক বিধান এবং সময় সময় হেলথ চেকআপ এভাবে সুস্থ থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়।
যদি আমার স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং আমি সুস্থ থাকি তবে আমি শোকর আদায় করি। এই অবস্থাটি আমার নিকট সেই অবস্থার চেয়ে বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় যা আমি অসুস্থতার দ্বারা পরীক্ষায় পতিত হলে অনুভব করি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও এমনি ভাবে স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে পছন্দ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন নিয়ামত দান করেননি।[১৫] স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ মহান রাব্বুল আলামীনের নিয়ামত সমূহের মধ্যে দুটি বিশেষ নিয়ামত। অধিকাংশ লোক এই দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে ক্ষতি ও ধোঁকায় রয়েছে। এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নাই যে, পার্থিব ভোগ-বিলাসের লালসার কারণে অধিকাংশ লোক এই দুইটি নিয়ামত হতে বঞ্চিত হয়। তারা ভাবে স্বাস্থ্য সব সময় অটুট থাকবে এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতা কোন দিন শেষ হবে না। তারা শরীর ও মানসিক বিভিন্ন প্রকার চাহিদার প্রতি অনিয়ম করে তাদের শরীরকে নানা ধরনের রোগ-ব্যাধির আবাস স্থল রূপে গড়ে তোলে।

লোকে দেহের রোগকেই সাধারণত রোগ বলে এবং তারই চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হয়। মনের সুস্থতা বা অসুস্থতা বড় একটা লক্ষ্য করে না। যখন মনের এরূপ পীড়া হয় যে, তার জন্য রোগীর দ্বারা আর সাংসারিক কাজ চলে না অর্থাৎ যাকে লোকে 'উম্মাদ' রোগ বলে তাই দেখা দেয়, তখনই কেবল তাকে সুস্থ করার জন্য চিকিৎসকের দ্বারস্থ হয়। যদি সাংসারিক কাজের

---

[১৩] Wikipedia, the free encyclopedia, *en.wikipedia.org/wiki/Disease*

[১৪] Define *Disease* at Dictionary.com, *dictionary. reference.com/browse/disease*

[১৫] প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

কোন অসুবিধা না হয়, অর্থাৎ হিসাবনিকাশ বা লোকজনের সাথে ব্যবহারের বিষয়ে কোন বিশৃঙ্খলা না ঘটে, তবে মনের যে অবস্থাই হোক না কেন, তা কেউই নজর রাখে না এবং চিকিৎসার প্রয়োজন বলে মনে করে না। একটু যত্ন সহকারে লোক-চরিত্র পর্যবেক্ষণ করলেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে, শত-শত ব্যক্তির মধ্যে এক জনেরও বোধ হয় সুস্থ মন নেই। অথচ মনের রোগ আরোগ্য করার জন্য কারো মধ্যে বড় কোন আগ্রহ দেখা যায় না। অবস্থা দেখে মনে হয় যেন সম্পূর্ণ সমাজের একই অবস্থা। তাহলে কে কার অসুস্থতা বুঝতে পারবে?

মহান শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ অবগত আছেন যে, তাঁদের শত চেষ্টা, যত্ন, উপদেশ শাসনাদির সাহায্যেও কোন কোন ছাত্রের চরিত্র সংশোধন করতে একেবারে অপারক হন। একই শ্রেণীর ছাত্রগণ একই অধ্যাপকের কাছে শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা লাভ করেও প্রত্যেকে বিভিন্ন ভাবে বিদ্যা অর্জন বা চরিত্র গঠন করে। এমন কি একই পিতামাতার সন্তানেরা বিভিন্ন চরিত্রের হতে দেখা যায়। যদি কেউ বার বার অন্যায় কাজ করে, লোকে তাকে দুষ্ট বলে। সকলেই শিশুকাল হতে বড়দের উপদেশ পেয়ে থাকে। 'সদা সত্য কথা বলিবে' 'কখনও মিথ্যা বলিবে না' 'অন্যের দ্রব্য না বলে নিবে না' সৃষ্টিকর্তার আদেশ নিষেধ পালন করিবে' প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে' ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে ঐ সব উপদেশ বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন রকম ফল প্রদান করে। চোরকে চুরি করো না বললে চোর কি চুরি না করে থাকতে পারে? কখনই না। সে কেন চুরি করে? যেহেতু সে চুরি না করে থাকতে পারে না। সাধারণ কথায় লোকে বলে থাকে, অভ্যাস দোষে চুরি করেছে। অভ্যাস দোষ বললে প্রকৃত দোষ বলা হয় না। একজন একই প্রকার কাজ করতে করতে ক্রমে তার অভ্যাস হয়ে যায় সত্য কথা, কিন্তু একই পিতামাতার সন্তান, একই বাড়িতে খেয়ে, একই পরিবেশে থেকে, একেক জন একেক প্রকার অভ্যাস করে কেন? চোর বা মিথ্যাবাদী, চুরি করা বা মিথ্যা কথা বলা অন্যায় বা পাপ তারা জানে। বার বার তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও চুরি বা করে বা মিথ্যা কথা বা বলে সে থাকতে পারে না।

আবার আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করলে, বিভিন্ন রকমের চরিত্রের সমাহার দেখতে পায়। আপাতদৃষ্টিতে আমরা সবাই জানি দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চতর জ্ঞানার্জনের জন্য দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষালয়ে ভর্তি হয়। তাহলে এতসব সন্ত্রাসী, মারামারি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, নারীঘটিত অপরাধ কেন? কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কোন পিতামাতা এগুলো শিক্ষা দেননি। তারা জানে এসব কাজ বড় ধরনের অপরাধ। পরিবার, সমাজ, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক সবাই তাদের ঘৃনা করে। এর পরেও কি তারা এসব ত্যাগ করতে পারছে? এসব অপরাধ থেকে বার বার বিরত রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কতিপয় ছাত্র নামধারী ব্যক্তিকে এসব থেকে বিরত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আর এটাই বাস্তবতা। এ সবের প্রকৃত কারণ কি? প্রকৃত কারণ তাদের মন অসুস্থ। সুস্থ মনে চুরি করার প্রবৃত্তিই আসবে না, বার বার অভ্যাস করা তো দূরের কথা। সুস্থ মনে মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছাই থাকে না। সুস্থ মনে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে অপরাধ করা তো দূরের কথা, সে সব সময় অন্যের মঙ্গল কামনায় ব্যাস্ত থাকবে। পিতামাতা বা শিক্ষকগণ বালক-বালিকাদেরকে শাসন অথবা উপদেশ দিয়ে যথেষ্ট প্রতিকার করা হয়েছে বলে মনে করেন। কিছু কিছু পিতামাতা বা শিক্ষক মারধোর পর্যন্ত করতে ছাড়েন না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব পন্থায় প্রতিকার তো হয়ই না বরং খারাপই হয় বেশী। আজকাল প্রায়ই স্কুল-কলেজের ছাত্রকে অতি অল্প বয়স হতেই ইন্দ্রিয়সেবী হতে দেখা যায়। এর ফলে

Dhaka University Institutional Repository

অবৈধ উপায়ে শরীরটি চিরজীবনের জন্য নষ্ট হতে থাকে। এর কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসুস্থ মন। তবে অতি অল্প সংখ্যক বালক-বালিকা, যারা কেবলমাত্র সঙ্গদোষে এই কাজ করে, তারা অতি শিঘ্রই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে বিরত হয়। সামান্য উপদেশই তাদের পক্ষে যথেষ্ট হয়। এমন কি নিজেদের ভুলের জন্য অনুশোচনাবোধ জাগ্রত হয় এবং তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়। আমরা অবশ্য এসব বিষয়ে এতটা সূক্ষভাবে দেখি না এবং চিন্তাও করি না। কিন্তু এই কথা অতীব সত্য যে, সুস্থ মনে কোন অসৎ কাজ বা অসৎ চিন্তা আসতে পারে না।

প্রায়ই দেখা যায় যে, কোনও বাড়িতে হয়ত অতিশয় দুঃখজনক ঘটনা, যেমন কারো অকালমৃত্যু বা অগ্নিকান্ড অথবা ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ফলাফল, বাড়ির সকলের পক্ষে সমান ক্ষতিজনক হলেও কেউ বা অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ে, আবার কেউ বা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ঐ প্রকার উপেক্ষা করতে সামর্থ হয় তার মন অপেক্ষাকৃত অনেক সুস্থ, নতুবা সে ব্যক্তি মনকে কখনও দমন করতে পারতো না। দুর্বল বা অসুস্থ মনে সামান্য ঘটনাও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে, কিন্তু সুস্থ মনে তা হয় না। আমরা প্রায়ই দেখে থাকি যে, সবার মন সমান ক্রোধী নয়। কেউ হয়ত অতি সামান্য কারণে ভয়ানক অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে, অনেকের সহিষ্ণুতা অতীব প্রশংসনীয়। এই প্রকারের তারতম্য, কেবলমাত্র মনের সুস্থতা ও অসুস্থতার উপর নির্ভর করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মেজাজ খারাপ হলে, তারা তা চাপা দিয়ে বাইরে প্রফুল্লতার ভান করতে জানে না, কিন্তু বড় হলে ভিতরের ভাব ভিতরে রেখে, বাইরে 'ভালোমানুষ' সাজতে পারে। তাই বলে যে তারা মানসিক ভাবে সুস্থ, একথা বলা যায় না। এমন কি চাপা দিয়ে 'ভাল মানুষ সাজবার' প্রবৃত্তিটিও একটি কপটতা, যা মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ।

যাবতীয় পীড়া মন হতেই দেহে বিকাশ পায়। দেহটিকে মনই পরিচালনা করে, এমন কি দেহটি মনেরই স্থুলরূপ মাত্র। মনটি যেমন, দেহটিও তেমনি হবে। মনটি অসুস্থ হলে দেহটি সুস্থ হতে পারে না। দেহটিকে সুস্থ রাখতে হলে, আগে মনটিকে সুস্থ করতে হবে, অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু এখন মনের দিকে কারো কোন দৃষ্টি নেই। শরীরের প্রকৃত সুস্থতা কিসে আসবে, সে দিকেও দৃষ্টি নেই। দৃষ্টি কেবল একেবারে বাইরে, কেবল বাইরে ভাল চাই। ভিতরে ভিতরে যাই থাক না কেন, বাইরে ভাল থাকলেই হলো। মনের মধ্যে যথেষ্ট অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও দেখা হওয়া মাত্রই মুখে কপট হাসি দিয়ে ঘাড় নেড়ে বলে ভাল আছি। আমাদের সমাজে যুগ যুগ ধরে এটাই চলে আসছে। আগের চেয়ে ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতি আরো খারাপেরে দিকে যাচ্ছে। ভিতরটা কেউ দেখে না, বাইরে নিয়েই সবাই ব্যস্ত। ফলে, ভিতরটি অতি ভয়ানক ব্যাধিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই ভয়ানক ব্যাধি শরীরে প্রকাশিত হলে আবার তা চাপা দেওয়ার ফলে ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন ব্যাধিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। তখন চিকিৎসার কোন উপায়ান্তর না পেয়ে আমরা ভাগ্যকে দোষারোপ করতে থাকি।[১৬]

আমরা যাকে রোগ বলি তা রোগ নয়, রোগের ফল মাত্র। এই ফলস্বরূপ যে রোগ, তা চিকিৎসার বিষয় নয়। প্রকৃত চিকিৎসার বিষয় হল রোগী। এই রোগীকে তার বিশৃংখল অবস্থা হতে সুশৃংখল

---

[১৬] বি. দ্র. ডাঃ নীলমণি ঘটক, *প্রাচীন পীড়ার কারণ ও তাহার চিকিৎসা,* দি হ্যানিম্যান হোমিও ফার্মেসী, কলিকাতা: পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০১ খ্রি. পৃ. ১৩-২৩

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় আনাই সুচিকিৎসা এবং আনতে পারলে উক্ত ফলস্বরূপ রোগ এমনিতেই ভাল হয়ে যায়। যদি মনের সুস্থতার উপরই শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করে, যদি মনকে সুস্থ করাই প্রকৃত কাজ হয়, তবে কিভাবে তা করা যেতে পারে? কি উপায়ে মনকে নিরোগ করা যায়? এরও আগে দেখা প্রয়োজন মন কি জন্য রোগাক্রান্ত হয়? তাহলেই আমরা সঠিক সমাধানে পৌছাতে সক্ষম হবো।

যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বিনা কারণে তীব্র ভৎসনা করে, ঐ ভৎসনা সর্ব প্রথমে ঐ ব্যক্তির মনে আঘাত করে। তারপর হয়ত শারীরিক লক্ষণ যথা কান্না, হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ বৃদ্ধি, কম্পন, মূর্ছা এমনকি স্ট্রোক বা হার্টফেল পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। অতএব কোন দোষ যখন ক্রিয়া করে তখন সর্বপ্রথম মনে ক্রিয়া করে। যদি মনটাকে সুস্থ এবং পবিত্র রাখা যায় তাহলে তার দ্বারা সমাজের শুধু মাত্র মঙ্গলই হতে পারে, অমঙ্গল হতে পারে না। মনের রোগ সম্পর্কে মানুষের সৃষ্টিকর্তা, মহা বিজ্ঞানী মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে একাধিক আয়াত নাযিল করেছেন। মনের পবিত্রতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।[১৭]

এদের মনের ভিতর রয়েছে এক ধরণের মারাত্মক ব্যাধি, আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।[১৮]

যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না?[১৯]

আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেস্তাই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই তার এই সংখ্যা করেছি যাতে কিতাবীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটাতো মানুষের জন্য উপদেশ বৈ নয়।[২০]

বস্তুত যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে তারা বলে আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হয়। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যে দিন আল্লাহ তা'য়ালা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন। ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে।[২১]

---

[১৭] الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (আল-কুরআন ১৩ : ২৮)

[১৮] فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (আল-কুরআন ২ : ১০)

[১৯] أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (আল-কুরআন ৪৭ : ২৯)

[২০] وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ (আল-কুরআন ৭৪ : ৩১)

[২১] فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ (আল-কুরআন ৫ : ৫২)

Dhaka University Institutional Repository

যখন মোনাফেকরা বলতে লাগল এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, এরা নিজেদের ধর্মের উপর গর্বিত। বস্তুতঃ যে ভরসা করে আল্লাহর উপর, সে নিশ্চিন্ত, কেননা আল্লাহ্ অতি পরাক্রমশীল সুবিজ্ঞ।[২২]
বস্তুতঃ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করলো।[২৩]
এ কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা পাষাণহৃদয় গোনাহগাররা দূরবর্তী বিরোধিতায় লিপ্ত আছে।[২৪] এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়।[২৫]
উপরে উল্লেখিত আয়াত সমূহে একটি বিষয় গভীর ভাবে লক্ষণীয়। যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত তারা কখনও সঠিক চিন্তা-ভাবনা করতে পারেনি। তারা সব সময় ভুল চিন্তা করেছে কিন্তু তারা তা একটিবারের জন্যও বোঝেনি। উপরন্তু তারা সবসময় নিজেদের চিন্তা ধারাকেই সঠিক বলে দৃঢ়তা পোষণ করেছে। তারা নিজেদের কাজকর্মকে সঠিক এবং এর বিপরীত কাজকে বিশৃঙ্খলা এবং অপরাধ মনে করেছে। কারণ তাদের চিন্তা, জ্ঞান ও বিবেক তাদের কে ভুল তথ্য দিচ্ছে। ফলে সমাজে তারা বিভিন্ন প্রকারের অশান্তি সৃষ্টি করেছে, ফেতনা-ফ্যাসাদ তৈরী করেছে, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এরা সব সময় সত্যের বাণী মহান রাব্বুল আলামিনের কুরআনের নির্দেশনার বিপরীত কাজে লিপ্ত থেকেছে। তাদেরকে যখন বলা হয় তোমরা অশান্তি সৃষ্টি করো না। তারা তখন বলে, আমরাই শান্তি স্থাপনকারী।[২৬] তারা যা বলেছে, তা তারা জেনে বুঝেই বলেছে যে, তারা শান্তি স্থাপন কারী, আমরা অশান্তি সৃষ্টিকারী নই। কারণ, তাদের অন্তর রোগগ্রস্ত। রোগ গ্রস্ত ব্যক্তি যেমন ভাল এবং মন্দকে সঠিক ভাবে বুঝতে পারে না। তেমনি অন্তরের রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও কোনটি সঠিক এবং কোনটি সঠিক নয় এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে না। সে সব সময় মন্দটিকেই সঠিক মনে করে। কোন ব্যক্তি যখন সাপের কামড়ের ফলে সাপের বিষ দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন, তার নিকট কাঁচা মরিচ মিষ্টি মনে হয়। কিন্তু একজন সুস্থ ব্যক্তি কাঁচা মরিচ খেলে তার আসল বৈশিষ্ট ঝালযুক্তই পাবে। কোন ব্যক্তি যখন জ্বরে আক্রান্ত হয় তখন তার অনেক প্রিয় খাবারও মুখে অরুচি বোধ হয়। কারণ সে অসুস্থ এবং তার মুখটি জ্বরাগ্রস্ত।
পৃথিবীর বুকে সংঘঠিত সমস্ত খারাপ কাজ অন্তর রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই হয়। কিন্তু যাদের অন্তর এমনই রোগগ্রস্ত, বড় বড় অপরাধ করেও তাদের বিন্দু মাত্র অনুশোচনাবোধ জাগ্রত হয় না। তারা মনে করে, তাদের কাজটিই ঠিক হয়েছে, বরং অন্যদেরটি ভুল। পক্ষান্তরে, যারা অন্তর রোগে আক্রান্ত নয় তারা ভুলবশত কোন অন্যায় কাজ করলেও, পরক্ষণেই তাদের মধ্যে অনুশোচনাবোধ জন্ম নেয়। তারা নিজেরাই নিজেদের অন্যায় বুঝতে পারে। সামাজিক বিভিন্ন স্তরের অপরাধ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় এমনকি আন্তর্জাতিক বড় বড় অপরাধ অন্তর রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই

---

[২২] إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـؤُلاء دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (আল-কুরআন ৮ : ৪৯)
[২৩] وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (আল-কুরআন ৯ : ১২৫)
[২৪] لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (আল-কুরআন ২২ : ৫৩)
[২৫] وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً (আল-কুরআন ৩৩ : ১২)
[২৬] وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (আল-কুরআন ২ : ১১)

Dhaka University Institutional Repository

সংঘটিত হয়। এদের অন্তর রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি নয়, বরং সমগ্র সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি সমগ্র বিশ্ববাসী পেতে পারে একটি সুন্দর জীবন ও একটি সুন্দর পৃথিবী। মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষের জন্য পবিত্র কুরআনকে অন্তর রোগের ঔষধ হিসাবে পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মানবকুল! তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এবং অন্তর রোগের ঔষধ এসেছে।[২৭] হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উত্তম দাওয়া হলো কুরআন।[২৮]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য সারাটিজীবন চেষ্টা করেছেন। মহান আল্লাহ মানুষের জন্য পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন, শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যাস্ত করেছেন তাঁর অতপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, যে নিজেকে শুদ্ধ করে সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।[২৯] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথাগত কোন চিকিৎসক ছিলেন না। মহান আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, মানুষ অন্তর রোগে আক্রান্ত। অন্তরের অসুস্থতার কারনে তারা কোন সুস্থ চিন্তা ভাবনা করতে পারছে না। তাদেরকে আপনি উপদেশ দিন, তাহলে তারা আস্তে আস্তে আপনার দিকে ফিরে আসবে। ক্রমান্বয়ে দেখা গেল, তারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতে ও বুঝতে পারলো। সমাজের মঙ্গলকামী লোকেরা ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত হলো। পক্ষান্তরে, যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতেও পারলো না, বুঝতে পারলো না।

চোখের রোগ হলে মানুষ যেমন সঠিক ভাবে দেখতে পায় না, তেমনি অন্তরে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও অন্তর রোগের কারণে সঠিক ভাবে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন, তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচারকারী।[৩০]

মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে।[৩১]

মহান রাব্বুল আলামিন উপরোক্ত আয়াতে মুসলমানদের মধ্যে গুজব রটিয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হিসাবে দুই ধরণের লোককে সতর্ক করেছেন। এরা হলো মুনাফেক এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে। যখন মানুষ সুস্থ থাকে, তখন তার জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এগুলোর মাধ্যমে সঠিক সময়ে, সঠিক ভাবে, সঠিক কাজ করতে পারে। কিন্তু যখন সে অসুস্থ হয় তখন তার ইন্দ্রীয়গুলো সঠিক ভাবে

---

[২৭] يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (আল-কুরআন ১০ : ৫৭)

[২৮] ইমাম ইব্ন মাজাহ (র), *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, চিকিৎসা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কুরআন দ্বারা শিফা গ্রহণ, হাদীস নং ৩৫০১

[২৯] نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا- فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا- قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (আল-কুরআন ৯১ : ৭-১০)

[৩০] أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (আল-কুরআন ২৪ : ৫০)

[৩১] لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (আল-কুরআন ৩৩ : ৬০)

Dhaka University Institutional Repository

সাড়া দেয় না। আর অন্তর অসুস্থ হলে প্রথমত সে সঠিক কাজটি বুঝতেই পারে না, অপরদিকে সে বোঝেইনা যে, সে অসুস্থ। আর রোগগ্রস্ত অন্তর সবসময় খারাপ কাজটি করে থাকে। এই অন্তর রোগ, দেহ রোগ অপেক্ষাও মারাত্মক।

যারা মুমিন, তারা বলে, একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যার্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য।[৩২]

মদীনায় তখন আনসার, মুহাজির সব ধরণের মুসলমানের বসবাস। আবার এদের মধ্যে ধনী, গরীব, সবল, দূর্বল সবই আছে। কিন্তু মহান আল্লাহ দুর্বলদের কথা না বলে অন্তরে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করে কঠোর বাস্তবতা দেখিয়ে দিলেন। বললেন, যখন কোন দ্ব্যার্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। যেখানে অন্যান্য মুসলমানদের ঈমান বেড়ে যায়, সেখানে অন্তরে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত তাকিয়ে থাকে। তারা অল্পতে কিভাবে আলোড়িত হয়। সঠিকতা এবং বাস্তবতা তারা অনুধাবন করতে পারে না।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।[৩৩]

নবী পত্নীগণ, উম্মূল মুমিনীন; তাঁরা সকল মুমিনদের মাতা, পরম শ্রদ্ধেয়া ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরেও তাঁদেরকে বিয়ে করা মুমিনদের জন্য নিষিদ্ধ। দুনিয়া এবং আখেরাত, উভয় জাহানের বাদশা, মহান আল্লাহর বন্ধু, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদেরকে 'যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে' তাদের থেকে সতর্ক করে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন। অন্তরে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সব সময় খারাপ চিন্তা করতে থাকে। তারা ভাল-মন্দ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে খারাপ কাজ করতে করতে তাদের অন্তর এমন হয়ে যায় যে তারা বিবেক বুদ্ধি শূন্য হয়ে পড়ে। বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত বড় বড় অপরাধিদেরকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা সেটা বুঝতে পারি। যাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোও সমীচীন নয়, তাদের কথা শুনতে পেয়ে মনে কুবাসনা জন্ম নেয়।

অতএব উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, অন্তরের ব্যাধি কত মারাত্মক। অতএব আমাদেরকে অবশ্যই ক্ষতিকর অন্তর রোগ থেকে পরিত্রাণের পথ বের করতে হবে।

অন্তরের এই ব্যাধি একদিনে সৃষ্টি হয়নি। কোন ব্যক্তির একদিনের পাপের ফসল নয়। ব্যাধি এসেছে ধীরে-ধীরে। সৃষ্টির পর থেকে মানুষ আচারে-ব্যবহারে, বেশ-ভূষায়, আহারে-বিহারে, নিত্যকর্মে যতই কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়েছে ততই প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। মানুষ বিভিন্ন প্রকারের অপরাধে

---

[৩২] وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُ (আল-কুরআন ৪৭ : ২০)

[৩৩] يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً (আল-কুরআন ৩৩ : ৩২)

Dhaka University Institutional Repository

জড়িয়ে গেল। আর মানব শরীরের প্রতিরক্ষা শক্তিও দুর্বল হলো। মানুষের মন অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠলো। (মন অর্থে জ্ঞানশক্তি, বোধশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি, এই তিনটি শক্তির সমষ্টি) যদি মানুষের মনে রোগ হয়, তাহলে তার ফলে জ্ঞান, বোধ ও ইচ্ছা এই তিনটিই দূষিত হয়। যার যেমন মন, তার তেমনই চিন্তা এবং তেমনই কর্ম। আগে মনে ইচ্ছা ও কল্পনার সৃষ্টি হয়, পরে সেই ইচ্ছা ও কল্পনা অনুসারে কাজ হয়। দুষিত মনে, দূষিত ইচ্ছা ও দূষিত কল্পনাই হয়। আর দুষিত মনে, দূষিত ইচ্ছা ও দূষিত কল্পনা হতে যে কাজ হয় তা দূষিত হতে বাধ্য।

আরেক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের অন্তরে কোন রোগ নেই। তারা সব সময়ই সত্য উপলব্ধী করতে পারে। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, অতএব তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও; যাদের অন্তর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্য্যধারন করে এবং নামায কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[৩৪] মহান আল্লাহ আরো বলেন, হে মানবকুল! তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এবং অন্তর রোগের ঔষধ এসেছে।[৩৫]

এ বিধান মেনে চললেই আমাদের তথা আল্লাহর সৃষ্টির সর্বোচ্চ মঙ্গল হবে। এই শ্রেণীর লোকেরাই যুগ যুগ ধরে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে, এবং এরাই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হয়েছে। এরা যেমন অন্তর রোগ হতে রক্ষা পেয়েছে, তেমনি রক্ষা পেয়েছে দেহ রোগ হতে। ফলে, তাঁরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছে। সঠিক ভাবে ইসলামের বিধিবিধান পালন করার মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়েছে। আর ইসলামের এই সুমহান ব্যাবস্থা রয়েছে সবার জন্য উন্মুক্ত।

মানুষের শরীর একটি জটিল যন্ত্রের সমাহার। এর প্রতিটি অংশ কিভাবে কাজ করে শরীর বিজ্ঞানীরা তা আজও পুরোপুরি ভাবে জানতে সক্ষম হননি। গবেষণার ফলে যতদুর জ্ঞান অর্জিত হয়েছে শুধু মাত্র ততটাই মানুষের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আশারবাণী, গবেষণা একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

মানুষের শরীর সুস্থ রাখে জীবনী শক্তি। জীবনী শক্তি দেহের প্রতিটি জীবিত কোষের মধ্যে বিদ্যমান। জীবনী শক্তি বিহীন শরীরের কোন কোষ অবশ্যই মৃত। জীবনী শক্তিই কোষগুলোকে সঞ্জীবিত রাখে এবং কোন দেহে জীবনী শক্তির অনুপস্থিতির অর্থ হলো সে দেহ জীবিত নয় বরং মৃত। রোগ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ভাবনা রয়েছে। কিছু লোক রোগকে জ্বিন-ভুত এবং প্রেতাত্মার আছর বলে থাকে।[৩৬] আবার কিছু লোক রোগকে আল্লাহর গজব মনে করে। রোগ অর্থ পীড়া, ব্যাধি, অসুখ, ব্যারাম বা অসুস্থতা। এই অসুস্থতা সর্ব প্রথম মানুষের মনে দেখা দেয়। ধীরে ধীরে শরীর যন্ত্রের মধ্যে দেখা দিতে থাকে নানা রকম বিশৃংখলা। এই অসুস্থতা ও বিশৃংখলা হতে দ্রুত, বিনাকষ্টে, স্বল্পতম সময়ে, সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও নির্দোষ উপায়ে সহজবোধ্য নীতির সাহায্যে সামগ্রিক ভাবে রোগের লক্ষণ দূরীকরণ ও বিনাশ সাধন এবং স্থায়ী ভাবে স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করা

---

[৩৪] وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ - الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (আল-কুরআন ২২ : ৩৪-৩৫)

[৩৫] يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (আল-কুরআন ১০ : ৫৭)

[৩৬] প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন।[৩৭] রুগ্ন মানব জাতির স্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার মত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করতে হলে এক দিকে যেমন শরীর বিজ্ঞানী, অপর দিকে তেমনি জীবন শিল্পীর প্রয়োজন। জীবদেহ জৈব ও অজৈব পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ। এদের কোনটির ক্রিয়ার অভাব হলেই শরীর ব্যাধিযুক্ত হয়। জীবদেহের এই স্বভাব প্রকৃত অবস্থায় আছে কিনা তা নির্ধারণ করা এবং না থাকলে তাকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র অনুযায়ী ব্যাধি নিরাময় করাই চিকিৎসকের উদ্দেশ্য।

আবেগ ও কল্পনার শক্তি

আত্মিক উদ্দীপনা শরীরের উপর কিভাবে রাজত্ব করে? আবেগজনিত অবস্থা কোন সুস্থ লোককে অসুস্থ কিংবা কোন অসুস্থ লোককে সুস্থ করতে পারে কি না? মানসিক লক্ষণকে শারীরিক রোগ নিরাময়ের জন্য ডাক্তারী ব্যবস্থাপত্রের অর্ন্তভূক্ত করা যায় কি না? এ প্রশ্নগুলো খুব কঠিন হলেও অনেক পূর্ব থেকেই মানুষ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। সমস্ত ধর্মাবলম্বীগণ স্বীকার করেন যে, অন্তর আমাদের শরীরের উপর রাজত্ব করে। তবে শরীর কিভাবে অন্তর দ্বারা প্রভাবিত হয় এ বিষয়ে তাদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। ঔষধ-পত্র ছাড়াও ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ, পানি পড়া, দোয়া, মানত, প্রার্থনা, দেব-দেবীর মন্দিরে ধরণা প্রভৃতি দ্বারা ব্যাধির নিরাময় এ সবগুলোর মূলনীতি হল বিশ্বাস বা কল্পনা শক্তিকে রোগ ব্যাধির বিরূদ্ধে ব্যবহার।[৩৮]

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ সব সময় আত্মা ও শরীরকে একক বস্তু হিসেবে গণ্য করত। তখন মানুষ ধারণা করত আসমানী শক্তি অসন্তুষ্ট হলে মানুষের আত্মা ও শরীরে কোন না কোন রোগ দেখা দেয়। গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্রে মানবের শরীর ও আত্মার ভারসাম্যহীনতাকে রোগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং শরীর ও আত্মা একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করা সংক্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুমানিক ৩০০ বছর পূর্বে ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত শরীর ও আত্মা পৃথক দুটি বস্তু এবং উভয়ই স্বাতন্ত্র এই মতবাদ পেশ করেন। এই চিন্তা ধারার উপরই বর্তমানে এ্যালোপ্যাথি নামে পরিচিত ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত।[৩৯]

প্রায় ২০০ বছর পূর্বে ডক্টর অব মেডিসিন ডিগ্রীধারী প্রসিদ্ধ জার্মানী চিকিৎসাবিদ, ডাক্তার স্যামুয়েল কৃষ্টিয়ান ফ্রেডারিক হ্যানিম্যান (১৭৫৫-১৮৪৩) চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি নতুন চমক সৃষ্টিকারী চিন্তাধারা পেশ করেন। তিনি বলেন, জীবনীশক্তি ব্যতীত আমাদের জড় শরীর অনুভব করতে পারে না, স্বীয় কার্যাদি করতে অক্ষম এবং আত্মরক্ষা বিষয়ে অপারগ হয়। যে অশরীরি বস্তু (জীবনীশক্তি) আমাদের জড় দেহকে কি সুস্থ অবস্থায় কি অসুস্থ অবস্থায় সজীব রাখে কেবল সেই শক্তিবলেই আমাদের সমস্ত অনুভূতি ও ইহজীবনের সমস্ত কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে।[৪০]

যখন কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তার সর্ব শরীরব্যাপি অশরীরী, স্বতশ্চল জীবনীশক্তিই প্রধানতঃ জীবননাশে উদ্যত রোগোৎপাদিকা শক্তি কতৃক বিশৃঙ্খলাগ্রস্থ হয় এবং তজ্জন্যই ইহা শরীরে

---

[৩৭] ডাঃ জি. দীর্ঘাঙ্গী, *অর্গ্যানন*, রায় পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা: ১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ১৬১

[৩৮] ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, অনুবাদ, হাকেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আধুনিক বিজ্ঞান*, খন্ড, ৩ - ৪, আল-কাওসার প্রকাশনী, ঢাকা: নভেম্বর ২০০৯ খ্রি. পৃ. ১৪৭

[৩৯] প্রাগুক্ত

[৪০] ডাঃ জি. দীর্ঘাঙ্গী, পৃ. ১৯৪, সূত্র ১০

Dhaka University Institutional Repository

নানা প্রকার কষ্টজনক অনুভূতি ও নানাপ্রকার অবৈধ প্রক্রিয়া উৎপাদন করে, তাদেরই আমরা রোগ বলি। কারণ, জীবনীশক্তি নিজে অদৃশ্য এবং স্থূলশরীরের উপর এর ক্রিয়ার দ্বারাই কেবল উপলব্ধি হয়। এই রোগজ বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত শরীরের যে যে অংশ দর্শক বা চিকিৎসকের ইন্দ্রিয় গোচর হয় সেই সেই অংশের অনুভূতি ও কার্যের গোলযোগ দ্বারা জানা যায়। অর্থাৎ রোগ জীবনীশক্তির রোগাক্রান্ত অবস্থা বিকৃত লক্ষণসকলের দ্বারা আত্মপ্রকাশ করে অন্য কোনও উপায়ে পারে না।[৪১] সুতরাং, যদি আমরা প্রত্যেক রোগের ক্ষেত্রে। এমন কি স্বল্প স্থায়ী নতুন রোগসমূহের ক্ষেত্রেও, অন্যান্য লক্ষণের সহিত মনের ও প্রকৃতির অবস্থার পরিবর্তনগুলো লক্ষ না করি। আমরা যদি রোগীর যন্ত্রনা দূরকল্পে ঔষধসমূহের মধ্য হতে এমন একটি রোগোৎপাদিকা শক্তি নির্ধারণ না করি, যা রোগের অন্যান্য লক্ষণের সদৃশ লক্ষণ ব্যতীত মনের ও প্রকৃতির পরিবর্তনের সদৃশ অবস্থা উৎপাদন করতে পারে। তবে আমরা কখনই প্রকৃতিসম্মতভাবে অর্থাৎ সমলক্ষণানুসারে আরোগ্য করতে সমর্থ হব না।[৪২]

তিনি আরো বলেন, সূক্ষ্ম প্রভাব, সূক্ষ্ম শক্তি- আমাদের পৃথিবী একটি গুপ্ত অদৃশ্য শক্তির দ্বারা আটাশ দিন এবং কয়েক ঘন্টায় চন্দ্রকে তাহার চতুর্দিকে ঘুরিয়ে থাকে এবং চন্দ্র নির্দিষ্ট সময়ে পর্যায়ক্রমে জোয়ার এবং ভাটার সৃষ্টি করে। দৃশ্যতঃ কোন স্থূল শক্তিতে কিংবা মানুষের পরিশ্রমে উৎপন্ন কোন যান্ত্রিক উপায়ে তা সম্ভব হয় না। আর সেই কারণে আমরা আমাদের চতুর্দিকে একটি বস্তুর উপর অপর বস্তুর ক্রিয়ার ফলাফলরূপে অসংখ্য ঘটনা দেখি যার কার্য এবং কারণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্পর্ক আমাদের বোধগম্য হয় না। কেবলমাত্র তুলনা এবং অবরোহমূলক সিদ্ধান্তে অভ্যস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিই এমন একটি অতীন্দ্রিয় মত গঠন করতে পারেন যা তাঁর নিজের চিন্তার সকল প্রকার স্থূল এবং যান্ত্রিকতাকে দূরে রাখার জন্য যথেষ্ট। কেমন করে একটি চুম্বকদণ্ড এক টুকরা লৌহ খন্ডকে আকৃষ্ট করে, এই সত্য কাজটি কি কোন স্থূল বুদ্ধি দিয়ে উৎঘাটন করা সম্ভব? রোগ সব সময় অন্তর থেকে শুরু হয়।

এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের গবেষণায় জানা যায় যে, চিকিৎসার অযোগ্য রোগীদেরকে যদি শুধু পরিস্কার চিনির পাউডার দ্বারা তৈরী পুরিয়া দেওয়া হয়, তবে তাদের মধ্যে অনেকেই তাকে ঔষধ দেওয়া হয়েছে এমন ধারণা করে উপকৃত হবে। এরূপ আত্মিক ও স্নায়ূবিক শক্তি পারস্পরিক ধারণা বিনিময় করে নিজেদেরকে রোগমুক্ত করে তোলে এবং এই অবস্থায় রোগী দ্রুত রোগমুক্তির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।[৪৩]

বর্তমানে আমেরিকাতে গবেষণা চলছে যে যখন নৈরাশ্য, বিষন্নতা, অথবা ক্রোধ আমাদেরকে পেয়ে বসে তখন কোন্ কোন্ রোগ আমাদের দ্রুত আক্রান্ত করতে পারে অথবা আমরা যখন আশান্বিত, আনন্দিত ও আশ্বস্ত থাকি তখন কোন্ কোন্ রোগ থেকে রক্ষা পাই। শরীরের উপর মনের প্রভাব সম্পর্কীয় এ জাতীয় গবেষণা "সাইকো নিওরো ইমিউনোলোজি" নামক একেবারে নতুন একটি বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে।

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যে ব্যক্তির অন্তরঙ্গ ও সান্ত্বনা দানকারী বন্ধু বা সাথী তার থেকে পৃথক হয়ে যায়, ঐ ব্যাক্তির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা মনোবেদনার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। সংসারে যারা একা, যাদের আপন কেহ নেই, এমন লোকদের অবস্থাও এ রকম। একাকীত্বের অনুভূতি তাদেরকে

---

৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫, সূত্র ১১

৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৬-৫৭৭, সূত্র ২১৩

৪৩ ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, খন্ড ৩ - ৪, পৃ. ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

দুর্বল করে দেয়। অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে যে, যাদের নিকটতম আত্মীয়-স্বজন অথবা ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধু নেই তাদের মৃত্যুর হার যাদের নিকটতম আত্মীয়-স্বজন অথবা ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধু আছে তাদের তুলনায় তিনগুণ বেশী। কেননা নিজেকে রক্ষা করার অনুভূতি যা একটি খাঁটি মানসিক অবস্থা, তা থেকে তারা বঞ্চিত থাকে।[৪৪]

মন এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মূলতত্ত্ব যতোই সামনে আসছে ততই দিবালোকের ন্যায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমরা ক্রমান্বয়ে এক রহস্যাবৃত জগতের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। একটি বিস্ময়কর রহস্যের জাল আমাদেরকে জড়িয়ে ফেলছে। শরীর এবং মন একটি আরেকটির সাথে এমন ভাবে সম্পৃক্ত যে, তাদেরকে আলাদা করা এবং দুই বস্তু গণ্যকরা কঠিন। এখন ৩০০ বৎসর পূর্বের ঐ মতবাদ, যে মতবাদে বলা হয়েছিল মন এবং শরীরের চিকিৎসা পৃথক ভাবে হওয়া চাই তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হচ্ছে। এখন এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হচ্ছে যে, শরীর এবং মন এদের একটি আরেকটির সাথে এমন ভাবে সম্পৃক্ত যে, এদের একটি অপরকে নিজের কার্যক্রমে যুক্ত করে।

ডাক্তার স্যামুয়েল কৃষ্টিয়ান ফ্রেডারিক হ্যানিম্যান (১৭৫৫-১৮৪৩) আজ থেকে ২০০ বৎসর পূর্বে এ কথাই বলেছেন। তিনি বলেন, যে সূক্ষ্মশক্তি (জীবনীশক্তি) আমাদের শরীরের অদৃশ্য অভ্যন্তরে থেকে তাকে সজীব রাখে, সেই শক্তির বিকৃতিজাত অসুস্থতা এবং সেই শক্তি কতৃক উৎপাদিত বর্তমান রোগসূচক বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গোচর শারীরিক লক্ষণসমূহ মিলিয়ে একটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। তারা এক এবং অভিন্ন। শরীর আমাদের জীবন পরিচালনের স্থূল যন্ত্র কিন্তু স্বতঃই বোধশক্তিসম্পন্ন ও পরিচালন করার ক্ষমতাসপন্ন জীবনীশক্তিপ্রদত্ত সজীবতাকে বাদ দিয়ে, একে ধারণা করা যায় না। জীবনীশক্তিকেও এইরূপে স্থূল শরীর হতে পৃথক ভাবে ধারণা করা যায় না। সুতরাং, তারা উভয়ে মিলে একত্ব প্রাপ্ত হয়। বুঝবার সুবিধার জন্যই, আমাদের মন চিন্তাকালে এই এককে দুইটি ভিন্নরূপে পৃথক করে।[৪৫]

মন ও শরীরের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি একটি বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। শুরুতে মানসিক উপসর্গগুলোকে শুধু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। কিন্তু এখন এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তাররাও সব ধরণের রোগীদের ক্ষেত্রে তাদের রিপোর্ট (Case History) লেখার সময় মানসিক উপসর্গও লিপিবদ্ধ করা শুরু করেছেন। তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এখন থেকে শরীর এবং মনকে একক বস্তু বলে স্বীকার করে নিতে হবে।

আজ হতে প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, তাদের অন্তকরণ ব্যাধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।[৪৬] মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন আরো বলেন, হে নবী, এরা আপনার কাছে জানতে চায় 'রুহ' কি, আপনি বলুন 'রুহ' হলো আমার মালিকের আদেশ। তোমাদের যা কিছু জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা নিতান্তই কম।[৪৭] যা অসুস্থ হলে গোটা মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়। 'রুহ' এর আশ্রয়স্থল হচ্ছে 'কল্ব'। এই 'কল্ব'ই হচ্ছে অন্তর বা মন। আর 'রুহ' হচ্ছে জীবন বা জীবনীশক্তি। মানুষ কিভাবে রোগাক্রান্ত হয়, এর উত্তর অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বাহিরের রোগশক্তি শরীরের জীবনীশক্তির (রোগ প্রতিরোধ শক্তি) উপর আক্রমন করে যখন জয়লাভ করে

---

৪৪ প্রাগুক্ত, খন্ড ৩ - ৪, পৃ. ১৪৯

৪৫ ডাঃ জি. দীর্ঘাঙ্গী, প্রাগুক্ত, পৃ.২১০-২১১, সূত্র ১৫

৪৬ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (আল-কুরআন, ২ : ১০)

৪৭ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (আল-কুরআন ১৭ : ৮৫)

Dhaka University Institutional Repository

তখন শরীর রোগাক্রান্ত হয়। আর বাহিরের রোগশক্তি শরীরের জীবনীশক্তির (রোগ প্রতিরোধ শক্তি) উপর আক্রমন করে যখন পরাজিত হয় করে তখন শরীর রোগাক্রান্ত হতে পারে না। রোগশক্তি একটি সূক্ষ্ম শক্তি, তদ্রুপ জীবনীশক্তিও একটি সূক্ষ্ম শক্তি। উভয় সূক্ষ্ম শক্তি স্থূল শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শরীরকে যুদ্ধ-ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করে।

রোগ চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ করা শ্রেয়। বর্তমানে রোগ প্রতিরোধের উপর চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণারত পৃথিবীর সমস্ত প্রতিষ্ঠান মনোনিবেশ করেছে। এমনকি প্যারামেডিক্যাল কলেজে কমিউনিটি মেডিসিন নামে এ বিষয়ে একটি সতন্ত্র বিভাগও খোলা হয়েছে।[৪৮] রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে রোগ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সারা বিশ্বে লাখ লাখ ডলার খরচ করা হচ্ছে। অথচ আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে এমন কিছু অমূল্য নীতি রেখে গেছেন, যেগুলো আজকের বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের বিষয়। ইসলামের স্বাস্থ্য বিষয়ক অমূল্য নীতিগুলো যথাযথ ভাবে অনুসরণ করলে রোগ-ব্যাধি অনেক কম হবে এবং সৃষ্ট রোগ-ব্যাধির শতকরা ৯০ ভাগ চিকিৎসা ব্যতীত উপশম হওয়া সম্ভব।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। এ যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কুরআনে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়ে গবেষণা করে যে অগ্রগতি সাধন করেছে পর্যায়ক্রমে তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো।

সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে মনের রোগ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন। তিনি বলেন, এদের মনের ভিতর রয়েছে এক ধরণের মারাত্মক ব্যাধি, আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের জন্য।[৪৯]

বস্তুত, সর্বোপ্রথম মানুষের মনে খারাপ চিন্তার সৃষ্টি হয়। সে কোন প্রকার নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে না। তার জীবন-যাপনের প্রতিটি পর্যায়ে চলতে থাকে স্বেচ্ছাচারিতা। জীবন-যাপনের কোন বিধি-বিধানই সে মেনে চলে না। ক্রমান্বয়ে তার জীবনীশক্তি দুর্বল হতে থাকে এবং এক সময় সে রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ইসলাম প্রতিটি মানুষের সঠিক জীবন-যাপন পদ্ধতি নির্দষ্ট করে দিয়েছে। যিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা তাঁর দেয়া পথই আসল পথ। সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত প্রতিনিধির দেখানো পথই সঠিক পথ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঠিক ভাবে জীবন-যাপনের যে পদ্ধতি আমাদের মধ্যে রেখে গেছেন, সেগুলো অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা পেতেপারি সুস্থ ও সুন্দর জীবন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, প্রস্রাব-পায়খানা, পানাহার, মধু সেবন, যায়তুন ও ডুমুরের তেল ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে যে সকল নিয়ম-নীতি উল্লেখ করেছেন, বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান তাঁর সেই অমূল্য উপদেশমালাকে স্বাস্থ্যের জন্য অতীব জরুরী শর্ত হিসাবে গ্রহণ করেছে। পবিত্র কুরআন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ শিক্ষার সঙ্গে চিকিৎসা ক্ষেত্রে আধুনিক আবিষ্কৃত বিষয়গুলোর বিস্তর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আল-কুরআন চিরস্থায়ী ও সন্দেহ মুক্ত গ্রন্থ। ইসলামের চিরন্তন নীতির ধারক এ গ্রন্থে এমন আয়াত ও নির্দেশাবলী রয়েছে যা সর্ব বয়সী লোকের শিক্ষা ও মানসিক পটভূমির প্রতি

---

[৪৮] ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, খন্ড ৩ - ৪, পৃ. ২৪৪

[৪৯] فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (আল-কুরআন ২ : ১০)

Dhaka University Institutional Repository

দিক নির্দেশ করে। ইসলাম আর্ন্তজার্তিক ও সর্বজনীন ধর্ম। মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মহান রাব্বুল আলামীন সৃষ্টি জীব সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য পবিত্র কুরআনে বার বার আহবান জানিয়েছেন।

কুরআনের শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, এই সেই মহাগ্রন্থ, (যা অবতীর্ণ করা হয়েছে মানুষের মঙ্গলের জন্য) যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।[৫০]

অর্থাৎ, পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু প্রয়োজন হবে এবং আবিষ্কার হবে এর সবকিছু এই কুরআনে রয়েছে। কুরআন আমাদের পবিত্র গ্রন্থ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস। মহান রব্বুল আলামিন ঘোষণা করেন, শপথ তীন ও যায়তুনের এবং সিনাই প্রান্তরস্থ পর্বত ও এই নিরাপদ নগরীর। নিশ্চয় আমি মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাকে হীনতম অবস্থানে নিপতিত করি। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার। এর পরেও কেন কিয়ামতকে অবিশ্বাস করছো? আল্লাহ কি শেষ্ঠতম বিচারক নন?[৫১] নিঃসন্দেহে যায়তুন অত্যন্ত কল্যাণকর ও ফলপ্রদ বৃক্ষ। এ বৃক্ষের নাম অন্যান্য আসমানী গ্রন্থ সমূহেও বহুবার এসেছে। আরব ছাড়া অন্যান্য দেশেও এ বৃক্ষ পাওয়া যায়। উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যায়তুন তেল দিয়ে রুটি খাও এবং তা দেহে মাখ, কারণ তা বরকতপূর্ণ গাছ থেকে হয়।[৫২] আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যায়তুন তেল খাও এবং তা দেহে মাখ, কারণ তা বরকত পূর্ণ।[৫৩] তাছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়তুন তেলকে ভোজ্য তেল হিসাবে ব্যবহার করার তাকীদ দিয়েছেন। এই তেল হৃৎপিন্ড এবং মস্তিষ্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বিভিন্ন প্রকার সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত চর্বির মধ্যে যায়তুন তেল রক্তনালীতে সবচেয়ে নূন্যতম পরিমাণ চর্বি জমাটবদ্ধ করে। বর্তমানে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণ মস্তিষ্কে রক্ত কণিকার ফেঁটে যাওয়া, পক্ষাঘাত ও প্যারালাইসিসের ঔষধ হিসাবে যায়তুন তেল নির্বাচন করেন।[৫৪] যায়তুনের ফল খাওয়া এবং এর তেল ব্যবহার করা যায়। কারণ এটা একটা বরকতপূর্ণ বৃক্ষ। যায়তুন একটা ফলদার গাছের নাম এবং ঐ গাছের ফলকেও যায়তুন বলা হয়। ইংরেজীতে এটাকে (OLIVE) বলা হয়। শামদেশ এবং এর আশেপাশে এই গাছ প্রচুর জন্মে। কোন কোন শীত প্রধান দেশেও এ গাছ পাওয়া যায়। আর তীন সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে যদি জান্নাতী খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে আমি তীনের নাম বলবো। তিনি সাহাবীদের তীনের তেল খাওয়ার আদেশ দিতেন। বৃটেনে তীনের শরবত 'ঔষধের খনি' হিসেবে পরিচিত। ইহা পেটের বিভিন্ন রোগ, অর্শ্বরোগ, বাত রোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

---

[৫০] ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (আল-কুরআন ২ : ২)

[৫১] وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ- وَطُورِ سِينِينَ - وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ- لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ- ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ - فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ- أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (আল-কুরআন ৯৫ : ১-৮)

[৫২] আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল কাযবীনী, (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ ও মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক), *সুনানু ইবনে মাজাহ্*, খন্ড ৩য়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রি. অধ্যায়: আহার, অনুচ্ছেদ: যায়তুন তৈল, হাদীস নং ৩৩১৯

[৫৩] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৩২০

[৫৪] ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, খন্ড ৩ - ৪, পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

রোগ এবং রোগী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি

ঈমানদার ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ইতিবাচক চিন্তা চেতনার মূর্ত প্রতিক। রুগ্ন ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা করা পরোপকার। অপরের ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য রাখা, প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের আবেগের মূল্যায়ন করা ইত্যাদি গুণাবলী ইসলামি জীবনাদর্শের অংশ। রোগ সম্পর্কে দুনিয়ার মানুষের মধ্যে অদ্ভুত ধরনের চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। অধিকাংশ লোক রোগকে খোদার গযব এবং মুসীবত মনে করে থাকে। কখনও বা রোগকে খারাপ জ্বিন-ভূত অথবা প্রেতাত্মার আছর বলে থাকে। এ ধরনের আক্বীদার লোকেরা চিকিৎসার নামে রোগীর সঙ্গে ভ্রান্ত এবং খুবই বেদনাদায়ক আচরণ করে। এমনকি আধুনিক যুগেও অনেকের মধ্যে এ অবস্থাটা বিদ্যমান রয়েছে।

রোগ এবং রোগী সম্পর্কে আধুনিক জ্ঞানী সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট করে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। এ আলোচনার মাধ্যমে ইসলাম এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে আধুনিক জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জ্ঞানভান্ডার আরো সমৃদ্ধ হবে। ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে এবং ইসলাম সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের যথাযথ জবাব পাওয়া যাবে।

রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কিত দর্শন

মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টির সূচনাতেই চিকিৎসা বিষয়ে মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আদিম মানুষ পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য সংগ্রহ এবং রোগব্যাধির মোকাবেলায় যে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তা থেকেই চিকিৎসা শাস্ত্রের সূত্রপাত হয়। আর তখনকার চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল তাদেরই সৃষ্টি ঝাড় ফুঁক ইত্যাদি মাধ্যমে। এরপর আসে লতা-পাতা, গাছ-গাছড়ার ব্যবহার। ঔষধের প্রথম আবিষ্কার কে করেছেন তা নিয়ে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। আল কিফতি তাঁর 'তারীখুল হুকুমাতে' লিখেছেন, নবী ইদরিস (আ.) প্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং এ সম্পর্কে তাঁর কাছে 'ওহী' আসে।[৫৫] জার্মান পন্ডিত তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ৯৭টি সূরার ৩৫৫টি আয়াত চিকিৎসা বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট। হাদীসের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ বুখারীতে 'তিব্বুন নবী' শীর্ষক ৮০টি পরিচ্ছেদ রয়েছে[৫৬]। আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ অবতীর্ণ করেন নি যার নিরাময়ের উপকরণ তিনি সৃষ্টি করেন নি।[৫৭] রোগ মহান প্রতিপালক রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে। আবার ঔষধও মহান প্রতিপালক রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে। আল্লাহ তা'আলা চিকিৎসকের মাধ্যমেই ঔষধ পাঠান। আলোচিত হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়, রোগ এবং তার চিকিৎসা উভয়ই মহান প্রতিপালক রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে। উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে রোগ, চিকিৎসা ও ঔষধ পত্র ইত্যাদির পরিপূর্ণ দর্শন এসে গেছে। রোগ যেমন আল্লাহর পক্ষ হতে আসে তেমনি নিরাময়ের ঔষধও সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মহান আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। চিকিৎসককে তো ঔষধ আল্লাহই চিনিয়ে দেন। বড় বড় ইসলামী চিকিৎসাবিদগণ তাদের নিজ নিজ ব্যবস্থা পত্রের উপর (হুয়াশ শাফী) অর্থাৎ আল্লাহই

---

[৫৫] মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান,* আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা: ফ্রেব্রুয়ারী ২০০৮ খ্রি. পৃ. ৫৪

[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

[৫৭] ইমাম বুখারী (র), *সহীহ আল বুখারী,* খন্ড ৯ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: জুন ২০০৩ খ্রি. চিকিৎসা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ২২৭২, হাদীস নং ৫২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

আরোগ্য দানকারী লিখতেন, যাতে করে ডাক্তার এবং রোগী উভয়েরই স্মরণ থাকে যে আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র আরোগ্য দানকারী। চিকিৎসক এবং ঔষধ আরোগ্যের মাধ্যম মাত্র, ভরসা আল্লাহর উপর।

উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয়, চিকিৎসা কখনও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যখন এক সাহাবী আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি ঔষধ-পত্র (চিকিৎসা) গ্রহণ করব? চিকিৎসক কি খোদার বিধান রোগ ফিরাতে পারে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "চিকিৎসাও খোদায়ী বিধান"।

রোগ কল্যাণ লাভের মাধ্যম

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে কল্যাণ দান করতে চান তাকে কষ্টে ফেলেন।[৫৮]

ইসলাম আধুনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্ম। ইসলামের সমস্ত নিয়ম কানুন ও মৌলিক বিষয়াবলী সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত। কোন ব্যাক্তি যখন পৃথিবীতে সফলতা লাভ করতে চায় তখন তাকে পরীক্ষার সম্মুখিন হতে হয়। ইসলামী শিক্ষানুযায়ী অসুস্থতা কোন আযাব নয়, বরং আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির পরীক্ষা মাত্র। রোগ আমাদের জন্য বরকত ও সফলতা লাভের অছিলা হয়ে যায়। প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়, রোগ কঠোর প্রকৃতির অবাধ্যদেরকেও মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ ভীরু ব্যাক্তিতে পরিণত করে। অনেক কঠোর হৃদয়ের লোকের মধ্যেও অন্তর জ্বালা ও কোমলতা সৃষ্টি করে। রোগগ্রস্ত অনেক ধনী ব্যক্তির মুখেও আল্লাহর নাম শোনা যায় এবং তাঁদের দিলে আল্লাহর স্মরণ জাগে।[৫৯] তবে যার পরিণাম একান্তই খারাপ তার জন্যে কোন চিকিৎসা নাই। কোন ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা তার নিকট দু'জন ফেরেস্তা পাঠিয়ে বলেন, দেখ হে ফেরেস্তা, সে তার শুশ্রূষাকারীর সঙ্গে কি কথাবার্তা বলছে। যদি সে অসুস্থ হওয়ার কারণে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতে থাকে তবে সে খবর ফেরেস্তাগণ আল্লাহর নিকট নিয়ে যায়। যদিও আল্লাহ স্বয়ং সব কিছু জানেন।

আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমন কি একটি কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয় এ সবের দ্বারা আল্লাহ তার গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।[৬০]

---

[৫৮] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৫০, হাদীস নং ৫২৪২

[৫৯] প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

[৬০] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৫০, হাদীস নং ৫২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

রোগ মহান আল্লাহর পরীক্ষা

এটা কারো অজানা নয় যে, সর্বপ্রথম উন্নতির জন্যই মানুষকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। কোন সফলতাই পরীক্ষা ও যাচাই বাছাই ব্যতীত অর্জিত হয় না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, আর আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিঞ্চিৎ ভয় দ্বারা, উপবাস দ্বারা এবং ধনের, প্রাণের ও ফসলের স্বল্পতা দ্বারা[৬১]

এভাবে পরীক্ষার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে প্রাণের ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চাই সেটা রোগের ছুরতে হোক বা মৃত্যুর আকারে হোক। এ কারণে আলেমগণ রোগকে আল্লাহর রহমতের অছিলা এবং পদোন্নতির একটা সোপান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৬২] মহান আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর কোন প্রিয় বান্দাকে পরীক্ষা করতে চান, তখন তিনি তাকে বিভিন্ন কষ্টে ফেলেন। সে যদি ধৈর্য্যের আঁচল হাত থেকে না ছাড়ে, তবে এর বদলায় তাকে জান্নাত দেন।

রোগ ধৈর্য পরীক্ষার মাধ্যম

হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আতা ইবনে আবী রোবাহ্ (রাঃ) বলেন, একবার আমাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমি কি আপনাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখিয়ে দেব না? আমি বললাম, কেন দেখাবেন না? অবশ্যই দেখান। তিনি বললেন, 'ঐ কালো মহিলাকে দেখুন।' এই মহিলা একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন আমার মৃগী রোগের চাপ শুরু হয় তখন কখনও কখনও আমার ছতর খুলে যায়, তাই আল্লাহর দরবারে আমার সুস্থতার জন্য দু'আ করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি পারলে ধৈর্য্য ধারণ কর, তুমি জান্নাত পাবে। আর যদি তুমি চাও তবে আমি আল্লাহর নিকট তোমার রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করি। উক্ত মহিলা বলল, হুযূর, (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি সবর করব। অতঃপর মহিলা বলল, তবে আপনি আল্লাহর নিকট এই দু'আ করুন যেন আমার ছতর খুলে না যায়। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য ঐ দু'আ করলেন।[৬৩]

কিছু মানুষ রোগকে এক ধরনের আযাব ও অভিশাপ মনে করে থাকে। এ সকল লোকের নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র হাদীস নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা উচিত। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগকে জান্নাত লাভের অছিলা বলেছেন।

---

[৬১] وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (আল-কুরআন ২ : ১৫৫)

[৬২] প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

[৬৩] ইমাম বুখারী (র), *সহীহ আল বুখারী*, খন্ড ৯ম, রোগীদের বর্ণনা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ২২৫৫, হাদীস নং ৫২৪৯

Dhaka University Institutional Repository

রোগ গোনাহের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ

কোন কোন লোক রোগ-ব্যাধিকে এক ধরনের আযাব মনে করে থাকে। অথচ সকল প্রকার কষ্ট সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষের জন্য রোগ-ব্যাধি রহমতের অছিলা বলে প্রমাণিত। রোগ-ব্যাধি নিঃসন্দেহে কষ্টদায়ক, তবে সর্বদা এটা আযাব হিসেবে আসে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, রোগ-ব্যাধি অধিকাংশ মানুষের জন্য গোনাহের কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলমানের যে কোন ব্যথা, কষ্ট, ক্লান্তি, রোগ, পেরেশানি এমন কি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।[৬৪] নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমান ব্যক্তির উপর যে সকল বিপদ-আপদ আপতিত হয় এর দ্বারা আল্লাহ তার পাপ মোচন করে দেন। এমন কি যে কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয় তার দ্বারাও।[৬৫]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন ব্যক্তির উপমা হল, সে যেন শস্য ক্ষেত্রের কোমল চারাগাছ। যে কোন দিক থেকে তার দিকে বাতাস আসলে বাতাস তাকে নুইয়ে দেয়। আবার যখন বাতাসের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তখন তা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। (তদ্রুপ অবস্থা হল মুমিনের) বালা-মুসিবত তাকে নোয়াতে থাকে। আর ফাসিক হলো শক্ত ভূমির উপর কঠিন ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো বৃক্ষের ন্যায়, যাকে আল্লাহ যখন ইচ্ছা ভেঙ্গে দেন।[৬৬]

মুমিন পুরুষ অথবা মহিলা মাত্রই কোন রোগগ্রস্থ হলে আল্লাহ্ উক্ত রোগীকে তার পূর্বের গোনাহ মাফের একটা অছিলা করে দেন। যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায় রোগ তার কাফফারা স্বরূপ। যেমন ভাবে আগুনের ভাট্টি লোহার মরিচা দূর করে, তেমনি রোগ শয্যায় মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে। তার মুখে অকৃত্রিম ভাবে আল্লাহ্ আল্লাহ্ শব্দ এসে পড়ে। সে তার স্বীয় অপরাধের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্যে সে গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রোগ শয্যা ত্যাগ করে। এভাবে রোগ গোনাহের কাফফারা হয়। দয়াময় আল্লাহর নিকট বান্দার এ ভঙ্গিটা খুবই পছন্দনীয়।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমান ব্যক্তির উপর যে সকল বিপদ-আপদ আপতিত হয় এর দ্বারা আল্লাহ তার পাপ মোচন করে দেন। এমন কি যে কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয় তার দ্বারাও।[৬৭]

অতএব আমাদের কোন কাঁটাও যদি বিঁধে তাহলেও তা আমাদের গোনাহের কাফফারা এবং আমাদের পাপ মোচন হওয়ার একটা উত্তম কারণ হতে পারে।

---

[৬৪] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৫০, হাদীস নং ৫২৩৯
[৬৫] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫২৩৮
[৬৬] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫২৪১
[৬৭] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

অতএব উপরে আলোচিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, রোগের কারণে গোনাহ মাফ হয়ে যায়। রোগ বালা মানুষের মধ্যে অনুতাপ, কোমলতা, বিনয়, বশ্যতা, নম্রতা, খোদা ভীতি এবং পরকালের স্মরণ সৃষ্টি করে। ধৈর্য্য ও শুকরিয়ার মানসিকতা পয়দা করে। সৌভাগ্য সেই ব্যক্তির, যে রোগের মাধ্যমে লাভবান হয়ে স্বীয় যিন্দেগীকে নেকী দ্বারা সুসজ্জিত করেছে এবং আখের গুছিয়ে নিয়েছে।

রোগ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগকে গোনাহের কাফফারা, সওয়াবের অগ্রদূত এবং নেকীর কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে আলেমগণ সুস্থ থাকার জন্যও এভাবে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! রোগের মত নিয়ামতকে সুস্থতার নিয়ামত দ্বারা বদলিয়ে দিন।[৬৮] এ কারণে কোন সাচ্চা মুসলমানের পক্ষে রোগকে গালমন্দ করা কখনও ভাল কাজ নয়। আর রোগের কারনে যদি মৃত্যুও হয়, মৃত্যুবরণ করার অর্থ অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া নয় বরং এক জীবন থেকে অন্য জীবনে পাড়ি জমানো। মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে আনন্দের বিষয় এদিক থেকেই মৃত্যু মু'মিনের জন্য উপহার স্বরূপ। রোগ-ব্যাধি কোন দুঃখের কিংবা বিপদের বিষয় নয়। বরং একদিক থেকে তা রহমত ও বটে। কারণ এর দ্বারা পাপ বিমোচিত হয়। রোগব্যাধি ও অপরাপর বিপদাপদকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য সতর্কবাণী বলে মনে করতে হবে এবং নিজের সংশোধনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। নিম্নবর্ণিত হাদীসে এসব বিষয়ে শিক্ষা ও নির্দেশনা রয়েছে।

হযরত অবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মু'মিন নারী ও পুরুষের বিপদ লেগেই থাকে। কখনও তার নিজের উপর, কখনও তার ধন-সম্পদে, কখনও তার সন্তান-সন্ততিতে। যার দরুণ তার গোনাহ মাফ হয়ে যায়। এমনকি সে আল্লাহর দরবারে এমন অবস্থায় হাযির হয় যে তার কোন পাপই থাকে না।[৬৯]

মুহাম্মদ ইবনে খালিদ সুলামী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও তাঁর পিতামহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন বান্দার জন্য যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে মর্যাদা নির্ধারিত থাকে এবং সে যদি তা আমল করে অর্জন করতে না পারে তখন আল্লাহ তাঁর শরীর, সম্পদ ও সন্তানের দ্বারা পরীক্ষা করেন। তারপর তাকে ধৈয্যের তাওফিক দেন যাতে সে বিপদে ধৈয্যধারণ করে আল্লাহর নির্ধরিত মর্যাদা লাভ করতে পারে।[৭০]

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসলেন, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীকি (রাঃ) ও হযরত বিলাল (রাঃ) জ্বরে আক্রান্ত হলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁদের কাছে গেলাম এবং বললাম আব্বাজান আপনার কাছে কেমন লাগছে? হে বিলাল! আপনি কিরূপ অনুভব করছেন? তিনি বললেন, আবূ বকর (রাঃ) যখন জ্বরাক্রান্ত

---

[৬৮] প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

[৬৯] মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী (র), (অনু. মাওলানা সাঈদুল হক), *মা'আরিফুল হাদীস*, ৩য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: তা. বি. সালাত অধ্যায়, হাদীস নং ২৯৫

[৭০] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

হতেন তখন আবৃতি করতেন, সব মানুষ সুপ্রভাত ভোগ করে পরিবার পরিজন নিয়ে। আর মৃত্যু অপেক্ষমান থাকে তার জুতার ফিতার চেয়েও সন্নিকটে।

আর বিলাল (রাঃ) এর নিয়ম ছিল, যখন তাঁর জ্বর ছেড়ে যেত, তিনি তখন উচ্চস্বরে বলতেন, হায়! আমি যদি লাভ করতাম একটি রাত কাটানোর সুযোগ এমন উপত্যাকায় যেখানে আমার পাশে আছে ইজখির ও জালিল ঘাস। যদি আমার অবতরণ হত কোন দিন মাযিন্না অঞ্চলের কূপের কাছে, যদি আমার চোখে ভেসে আসতো শামা ও তাফীল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এরপর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং তাঁকে সংবাদ দিলাম। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ মদীনাকে তুমি আমাদের কাছে প্রিয় বানিয়ে দাও, যে ভাবে আমাদের কাছে প্রিয় ছিল মক্কা এবং মদীনাকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। আর মদীনার মুদ্দ ও সা'কে বরকতময় করে দাও এবং মদীনার জ্বরকে স্থানান্তরিত করে 'জুহ্ফা অঞ্চলে স্থাপন করে দাও।[৭১]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাইতে অধিক রোগ যাতনা ভোগকারী আর কাউকে দেখিনি।[৭২]

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পীড়িত অবস্থায় তাঁর কাছে গেলাম এ সময় তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আমি বললাম, নিশ্চয় আপনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত। আমি এও বললাম যে , এটা এ জন্য যে, আপনার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। তিনি বললেন, হাঁ। যে কোন মুসলিম মুসীবতে আক্রান্ত হয় তার উপর থেকে গুনাসমূহ এভাবে ঝরে যায়, যে ভাবে বৃক্ষ থেকে ঝরে যায় তার পাতাগুলো।[৭৩]

প্রতিটি রোগেরই ঔষধ রয়েছে

ঔষধ-পত্র ও চিকিৎসা সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্ন উঠে, ঔষধ কি খোদায়ী বিধান পরিবর্তন করতে পারে? রোগ-ব্যাধি যদি তাকদীরের লিখন এবং খোদায়ী বিধান হয়ে থাকে তবে চিকিৎসা করায় কি ফায়দা ?

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি যার জন্য তিনি প্রতিষেধক পাঠান নি।[৭৪] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সংক্ষিপ্ত জবাবে কত বড় সমস্যাকে এ কথা বলে মীমাংসা করে দিলেন যে, তোমরা তাকদীরের অর্থই ভুল বুঝেছ। যদি রোগ খোদার বিধান হয়ে থাকে তবে চিকিৎসাও খোদার বিধান। আর যদি কষ্টভোগ ভাগ্যের লিখন হয়ে থাকে তবে রোগ নিরাময়ও ভাগ্য লিপির অংশ হবে, সুতরাং কোন অবস্থায়ই নিরাশ হওয়া যাবে না। আমাদের এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন ব্যক্তিরই তার ভাল হোক কি মন্দ হোক কোন প্রকার তাকদীরের জ্ঞান নেই। এ কারণে চেষ্টা এবং ইচ্ছা ভাল করা চাই। আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি যার জন্য

[৭১] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদঃ ২২৭০, হাদীস নং ৫২৭৫
[৭২] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদঃ ২২৫১, হাদীস নং ৫২৪৩
[৭৩] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫২৪৪
[৭৪] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদঃ ২২৭২, হাদীস নং ৫২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

তিনি প্রতিষেধক পাঠান নি। অতএব রোগ যেমন তিনি পাঠিয়েছেন তার নিরাময়ের বিধানও তিনিই পাঠিয়েছেন।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রতিটি রোগের ঔষধ রয়েছে, যখন রোগ অনুযায়ী ঔষধ মিলে যায় তখন রোগ আল্লাহর ইচ্ছায় ভাল হয়ে যায়।[৭৫]

ইমাম নববী (র) বলেন, বর্ণিত হাদীসের উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ঔষধ সেবন করা মুস্তাহাব। কাযী আয়ায বলেন, ডাক্তারী বিদ্যা যে জায়েয এবং সঠিক এ হাদীসই তার প্রমাণ। আল্লাহ যখন কাউকে আরোগ্য দান করার ইচ্ছা করেন তখনই কেবল ঔষধ প্রয়োগ কার্যকর হয়।

অতএব উপরোক্ত হাদীস দুটি থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে, রোগ আমাদের যাচাই ও পরীক্ষা অথবা উচ্চ মর্যাদাশীল করার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আসে, অতএব এর নিন্দা করা উচিত নয়। একচ্ছত্র শেফাদানকারী মহান আল্লাহ্ প্রতিটি রোগের সঙ্গে প্রতিষেধক সৃষ্টি করেছেন। কোন রোগই দূরারোগ্য নয়। কোন অবস্থায়ই চিকিৎসা বা ঔষধপত্র বর্জন করা উচিত নয় এবং কোন ভাবেই আরোগ্য থেকে নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়। প্রতিটি রোগেরই ঔষধ নির্দিষ্ট। কোন ঔষধে কাজ না হলে মনে করতে হবে রোগের সঠিক ঔষধ ব্যবহার হচ্ছে না। তখন একচ্ছত্র শেফাদানকারী আল্লাহ্‌র নিকট সঠিক ঔষধের জন্য তাওফীক চাইতে হবে এবং শেফার আশা করতে হবে।

মাত্র একটি রোগই দূরারোগ্য

মহান আল্লাহ্ বার্ধক্য ব্যতীত প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক সৃষ্টি করেছেন।

হযরত উসামা ইবনে শরীক (রাঃ) থেকে হযরত যিয়াদ ইবনে আলাকা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন কয়েকজন বেদুঈন লোক সেখানে এসে প্রশ্ন করে যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা চিকিৎসা গ্রহণ না করলে কি আমাদের কোন গোনাহ হবে?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা একটা ব্যাধি ব্যতীত এমন কোন ব্যাধি সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক সৃষ্টি করেননি এবং যা দুরারোগ্য। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সেটা কোন ব্যাধি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেটা হল বার্ধক্য।[৭৬]

উপরোক্ত হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বৃদ্ধাবস্থায় যৌবন প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখা নিরর্থক। এটা এমন নয় যা চাইলেই এসে যাবে। তাই এ সময়ে প্রশান্ত চিত্তে বার্ধক্য গ্রহণ করে নেওয়া উচিত। বার্ধক্য ব্যতীত প্রত্যেক রোগেরই উপযুক্ত চিকিৎসা রয়েছে। কোন রোগের ক্ষেত্রেই নিরাশ হওয়া

---

[৭৫] ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র), (অনুবাদ মাওলানা আফলাতুন কায়সার), *সহীহ মুসলিম*, খন্ডঃ ৭ম, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকাঃ জুন ১৯৯৯ খ্রি. অনুচ্ছেদ : ২৪, হাদীস নং ৫৫৭৮

[৭৬] ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদঃ সব রোগেরই আল্লাহ্ শিফা দিয়েছেন ২২৭২, হাদীস নং ৩৪৩৬

Dhaka University Institutional Repository

উতিৎ নয়। ঔষধ-পত্র ব্যবহার ও চিকিৎসা গ্রহণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত এবং তা বর্জন করা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের সুস্পষ্ট লংঘন।

রোগী দেখতে যাওয়া ও সেবা শুশ্রুষা করার প্রতিদান

রোগী আপন কি পর, দেখার ব্যপারে তা কোন শর্ত নয়। রোগী যে কেউ হোক ধনী-গরীব, আত্মীয় অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত যে কারো রোগ শয্যায় তার পাশে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। এতে বড় রকমের সওয়াব রয়েছে। রোগীকে দেখতে যাওয়ার সওয়াব ও প্রতিদানের বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীর সেবা কর এবং কয়েদীকে মুক্ত কর।[৭৭]

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যায় সত্তর হাজার ফেরেস্তা সকাল পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে এবং তার জন্য বেহেশতে একটি বাগান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি সকালে কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যায় সত্তর হাজার ফেরেস্তা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে এবং তার জন্য বেহেশতে একটি বাগান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।[৭৮]

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করল এবং মুসলমান রুগ্ন ভাইকে দেখতে গেল তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর ফরসখের সমান রাস্তা দূরে সরিয়ে নেওয়া হল।[৭৯]

সুবহানাল্লাহ, বান্দার খেদমত অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার মর্যাদা কত বড়। মহান অল্লাহ্ তা'য়ালা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার জন্য তাঁর প্রিয় রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে বান্দাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করল এবং মুসলমান রুগ্ন ভাইকে দেখতে গেল তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর ফরসখের সমান রাস্তা দূরে সরিয়ে নেওয়া হল। এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যায় সত্তর হাজার ফেরেস্তা সকাল পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে এবং তার জন্য বেহেশতে একটি বাগান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি সকালে কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যায় সত্তর হাজার ফেরেস্তা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে। রোগী দেখতে যাওয়াকে এই মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছেন। মহান অল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্যই তাঁর প্রিয় হাবীবের মাধ্যমে এই ঘোষণা প্রদান করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বিপদ-আপদে, সুখ-দূঃখে একে অন্যের সাথী করার যে অনুপম আদর্শ ইসলাম দেখিয়েছে, সমাজে শান্তি স্থাপনে এর চেয়ে মহানুভবতা আর কি হতে পারে। সমাজে একে অন্যের অসুখ-বিসুখ, বিপদ-

[৭৭] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫২৪৬

[৭৮] আবূ দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, কিতাবুল জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ১৮৬, হাদীস নং ৩০৮৫

[৭৯] আবূ দাউদ শরীফ, খন্ড ৪র্থ, কিতাবুল জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ১৮৬, হাদীস নং ৩০৮৪

Dhaka University Institutional Repository

আপদের কথা শুনে যদি আন্তরিকতার সাথে একে অন্যের খোঁজ খবর নেয় তাহলে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ কোথায়?

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রোগীকে দেখার জন্য তার কাছে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি বললেন কোন ক্ষতি নেই, ইনশাআল্লাহ গোনাহ থেকে তোমার পবিত্রতা লাভ হবে। রোগী বলে উঠল, কখন না বরং এটি এমন জ্বর, যা এক অতি বৃদ্ধের গায়ে টগবগ করছে। আশংকা হয় যেন তাকে কবরে পৌছাবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ, হবে তাই।[৮০]

আয়েশা বিনতে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা বলেছেন, আমি যখন মক্কায় কঠিন ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখার জন্য আসেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি সম্পদ রেখে যাচ্ছি। আর আমার একটি মাত্র কন্যা ছাড়া আর কেহ নেই। এ অবস্থায় আমি কি আমার দু'তৃতীয়াংশ সম্পদের প্রতি অসিয়ত করে এক তৃতীয়াংশ রেখে যাব? তিনি উত্তরে বললেন, না। আমি বললাম তাহলে অর্ধেক রেখে দিয়ে আর অর্ধেকের ব্যাপারে অসীয়ত করে যেতে পারি। তিনি বললেন, না। আমি বললাম তাহলে দু'তৃতীয়াংশ' রেখে এক-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসীয়ত করে যেতে পারি? তিনি উত্তর দিলেন এক-তৃতীয়াংশের পার, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তারপর তিনি আমার কপালের উপর তাঁর হাত রাখলেন এবং আমার চেহারা ও পেটের উপর হাত বুলিয়ে বললেন, হে আল্লাহ সা'দকে তুমি নিরাময় কর। তাঁর হিযরত পূর্ণ করতে দাও। আমি তাঁর হাতের হিমেল পরশ এখনও পাচ্ছি এবং মনে করি আমি তা কিয়ামত পর্যন্ত পাব।[৮১]

বর্তমানে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞগণ খুবই তাগিদ দিয়ে বলেছেন, তোমরা নিজ নিজ রোগীর চিকিৎসা সেবার দ্বারা কর। কারণ, তোমাদের সেবা রোগীকে দ্রুত সুস্থতা দান করবে।[৮২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে মানব জাতিকে রোগী দেখার যে আদর্শ পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়েছেন, আধুনিক বিশ্ব ১৫০০ বছর পরে এসে তার উপকারিতা উপলব্ধী করতে সক্ষম হয়েছে। একজন রোগীকে দেখতে যাওয়ার ফলে রোগীর মন সান্ত্বনা লাভের মাধ্যমে রোগের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ ব্যাবস্থা গড়ে তোলে, ফলে সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। অন্য দিকে বিপদের সময় কাউকে সাহায্য করা বা দেখতে যাওয়ার মাধ্যমে সমাজে যেমন শান্তি দায়ক পরিবেশ বজায় থাকে তেমনি অন্তরও প্রশান্তি লাভ করে, ফলে মানুষের মন ও শরীর উভয়ই সুস্থ থাকে।

রোগীর সেবা শুশ্রুষা ও দেখার আদব

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং তার সেবা শুশ্রূষা করা সৃষ্টির সেবা এবং মানবতা বোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ কারণে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং তার সেবা শুশ্রূষা করা ইসলামের চারিত্রিক ও নৈতিক বিধানে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

[৮০] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৬৩, হাদীস নং ৫২৬০

[৮১] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৬২, হাদীস নং ৫২৫৭

[৮২] ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, খন্ড ১ - ২ পৃ. ৩৪৪

Dhaka University Institutional Repository

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং তার সেবা শুশ্রূষা করার ব্যাপারে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

যেমন রোগী দেখার দু'আ, রোগী দেখার আদব, রোগী দেখার প্রতিদান, রোগীর সাথে কিরূপ ব্যবহারে করতে হবে, রোগীকে কিরূপ সান্ত্বনা প্রদান করতে হবে ইত্যাদি বিয়য়ের উপর বর্ণিত দিক নির্দেশনা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাতটি জিনিসের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতিটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো নিষেধ করেছেন, সোনার আংটি, মোটা ও পাতলা এবং কারুকার্য খচিত রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং কাস্‌সী ও মিয়সারা কাপড় ব্যবহার করতে। আর তিনি আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন জানাযার অনুসরণ করি, রোগীর সেবা করি এবং বেশি বেশি করে সালাম করি।[৮৩]

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন কোন রোগীর কাছে যাবে তার জীবন সম্পর্কে আনন্দদায়ক কথাবার্তা বলে তাকে সান্ত্বনা দেবে। এ সান্ত্বনার বাণী তার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে না, যা ঘটার তাই ঘটবে কিন্তু তার মন সান্ত্বনা লাভ করবে। যা রোগীকে দেখতে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য।[৮৪]

হযরত ছাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন মুসলমান ভাই তার কোন মুসলমান রুগ্ন ভাইকে দেখতে যায়, সে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না অসে ততক্ষণ সে বেহেস্তের বাগানে থাকে।[৮৫]

রোগীর সেবাযত্ন করা এবং সান্তনা দেওয়াকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোচ্চ সৎকাজ এবং গ্রহণযোগ্য ইবাদত হিসাবে ঘোষণা করেছেন এবং বিভিন্ন ভাবে এ সবের প্রতি অনুপ্রাণিতও করেছেন। তিনি স্বয়ং রোগীদের সেবা করতেন এবং তাদের সাথে এমন কথা বলতেন ফলে তাদের মন প্রশান্তিতে ভরে যেত এবং দুশ্চিন্তা হালকা হয়ে যেত। আল্লাহর নাম এবং কুরআন পাঠ করে তার উপর ফুঁক দিতেন এবং অন্যদেরকেও এ বিষয়ে উৎসাহিত করতেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন অসুস্থ লোক কে দেখতে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কি খেতে ইচ্ছা করছে? তখন সে বলল, আমার গমের রুটি খেতে ইচ্ছা করছে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার কাছে গমের রুটি আছে সে যেন তার ভাইয়ের কাছে তা পাঠিয়ে দেয়। অতপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কোন রোগী যখন কিছু খেতে ইচ্ছা করবে তখন সে যেন তাকে তা খেতে দেয়।[৮৬]

---

[৮৩] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৫৩, হাদীস নং ৫২৪৭

[৮৪] মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী (র), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩০৩

[৮৫] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩০১

[৮৬] ইমাম ইবনে মাজাহ্ (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ রোগীর কিছু (খেতে) ইচ্ছা হলে, হাদীস নং ৩৪৪০

Dhaka University Institutional Repository

আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীর সেবা কর এবং কয়েদীকে মুক্ত কর।[৮৭]

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন অসুস্থ ব্যক্তির সেবার জন্য তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, তুমি কি কিছু খেতে চাও? সে বলল, আমি কেক খেতে চাই, তিনি বললেন হ্যাঁ। তখন তারা তার জন্য তা চেয়ে নেয়।[৮৮]

উকবা ইবনে আমির যুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের অসূস্থ ব্যক্তিকে পানাহারের ব্যাপারে জোর-দস্তি করবে না। কেননা আল্লাহ তাদেরকে পানাহার করান।[৮৯]

আমেরিকার কেনেডী হাসপাতালের কার্যবিধি

এক ব্যক্তি চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সেখানে গেলেন। তিনি বলেন, প্রতিদিন দু'বার প্রত্যেক রোগীর নিকট তাদের পাদ্রী ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ এসে হাসিমুখে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। রোগীকে সান্ত্বনা দেন। সুস্থতার জন্য দু'আ করেন। এরপর অন্য রোগীদের কাছে যান। আমি এ অবস্থা দেখলাম, রোগীর সেবা করার এ শিক্ষাই তো ইসলাম দিয়েছে। আমি আমেরিকার ঐ হাসপাতালে ভালভাবে লক্ষ্য করেছি যে, তাদের এ সেবার কারণে অভিভাবকগণ তাদের রোগীকে ঐ হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর চেষ্টা করেন। কারণ, সেখানকার রোগীরা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থতা লাভ করে।[৯০]

আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা

নিউইয়র্কের হাসপাতালসমূহে একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে, যে সকল রোগী হাসপাতালে বেওয়ারিশ হয়ে একাকী পড়ে থাকতো, তাদেরকে উন্নত চিকিৎসা দান এবং তাদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও পুরোপুরি ফায়দা হচ্ছিল না। অথচ যে সকল রোগীদের আত্মীয়-স্বজন ও সেবাকারী আসা যাওয়া করত, তাদের মধ্যে সুস্থতা অন্যদের তুলনায় দ্রুত আসত। এ পর্যবেক্ষণের পর নিউইয়ার্কের পাদ্রীগণ হাসপাতালে যাওয়া শুরু করলেন। তারা রোগীদের সাথে স্বাক্ষাত করতেন। তাদের কাছ থেকে অসুস্থতার বিবরণ শুনতেন। অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে তাদের সুস্থতার জন্য দু'আ করতেন। অনেক রোগী চিকিৎসা ছাড়াই পাদ্রীদের সুদৃষ্টি পেয়েই ভাল হয়ে যেত।[৯১] "Readers Digest" নামক একটি আমেরিকান পত্রিকায় এ ব্যাপারটিকে রূহানিয়াত বা আত্মিক ব্যাপার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু আসল কথা হল, অসুস্থতার সময় রোগীর মন থাকে বিষণ্ন। সে তার রোগের দুশ্চিন্তায় যে কোন উপায় অবলম্বন করতে তৈরী থাকে। সংবাদপত্রে প্রতিদিন এরূপ অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যে নিঃসন্তান মহিলারা রাতের অন্ধকারে কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের হাড্ডি উঠিয়ে তার উপর গোসল করে। কোথাও কোথাও, কোন পড়শীর শিশুকে হত্যা করে তার লাশের উপর নিরর্থক

---

[৮৭] ইমাম আবূ দাউদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ১৯০, হাদীস নং ৩০৯১

[৮৮] ইমাম ইবনে মাজাহ্ (র), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৪৪১

[৮৯] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ অসূস্থকে জোর করে খাওয়ানো, হাদীস নং ৩৪৪৪

[৯০] ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, খন্ড ১ - ২ পৃ. ৩৪৪

[৯১] প্রাগুক্ত, খন্ড ১ - ২ পৃ. ৩৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ও বেহুদা মন্ত্র পাঠ করে। নিজের সন্তানহীনতা অথবা রোগের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সে যে কোন অনর্থক বা শরী'আতের খেলাপ কাজ করতেও দ্বিধা করে না। ইসলাম সর্বপ্রথম রোগীর মানসিক অবস্থাকে অনুভব করেছে। সেই সঙ্গে এ ব্যাপারে এমন কার্যকরী পরামর্শ দিয়েছে, যা রোগীর মন-মানসিকতায় প্রশান্তি আনে।

রোগী দেখার দ্বারা শুধু তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা উদ্দেশ্য নয়। বরং আসল বিষয় হল রোগীকে সান্ত্বনা ও শান্তি দেওয়া। আমরা কারো দুঃখ-বেদনা তো নিয়ে নিতে পারিনা, তবে সুন্দর ব্যবহার ও উত্তম আচরণ দ্বারা তার হৃদয় মন অবশ্যই প্রফুল্ল করতে পারি। এভাবে তার দুঃখ কষ্ট কিছুটা হলেও হালকা করতে পারি। রোগীর মাথায় বা তার হাতে হাত রাখার দ্বারা এক দিকে যেমন তার শরীরের অবস্থা অনুভব করা যায়। তেমনি তার প্রতি নিজের ঐকান্তিকতা এবং অকৃত্রিম সহমর্মিতার প্রকাশ ঘটে। আর এটা এমন একটি বিষয় যা একজন রোগীর জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাবার সময় তার দীর্ঘ হায়াত সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করলে এটা অবশ্য তকদীরকে রদ করতে পারে না, তবে এতে রোগীর মন অবশ্যই খুশী হয়। এ কারণে আমাদের অবশ্যই রোগীকে অশার বাণী শুনাতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগ শয্যায় শায়ীত একজন গ্রাম্য ব্যক্তিকে দেখার জন্য গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি যখন কোন রোগী দেখতে যেতেন তখন তাকে বলতেন, চিন্তার কোন কারণ নেই, ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে।[৯২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে উল্লেখিত হাদীস থেকে আমরা রোগী দেখা সম্পর্কিত হেদায়াত লাভ করি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, কোন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট গেলে তার সাথে ভাল ভাল কথা বলতে। যদি কোন রোগীকে তার দীর্ঘ জীবন লাভের দু'আ করা হয় তাহলে রোগীর মন অবশ্যয় আন্দোলিত ও প্রফুল্ল হবে। রোগীকে যদি বলা হয় যে আল্লাহ চাহেন তো ভয়ের কোন কারণ নেই এবং যদি তার সাথে অতি উত্তম ব্যবহার করা হয় তাহলে রোগীর মনে ভয় দূর হবে, মনে সাহস সঞ্চয় হবে এবং মানসিক শক্তি বেড়ে যাবে। ফলে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। তবে কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার নিকট দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করা ঠিক নয়। কেননা, রুগ্ন ব্যক্তির নিকট বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে তার কষ্ট বেড়ে যেতে পারে। বিশ্রাম রোগীর জন্য খুবই প্রয়োজন।

ইসলাম স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য একটি সর্বাধুনিক ধর্ম এটা তার একটা বাস্তব নমুনা। ইসলাম রুগ্ন ব্যক্তিদের দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে, কেননা এটা বড় ইবাদত। অপর দিকে বলেছেন যে, কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার নিকট দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করবে না। কেননা, রুগ্ন ব্যক্তির নিকট বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা অপছন্দনীয়। এটা কত বড় বিজ্ঞানময় কথা। বাস্তবে আমরা দেখতে পায় রোগীর নিকট দর্শনার্থীর দীর্ঘ সময় অবস্থানের কারনে রোগীর এবং রোগীর পরিজন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের খুবই পেরেশানী হয়। তারা তাদের কাজ-কর্ম স্বাভাবিক ভাবে করতে পারে না। রোগী ঠিক মত বিশ্রাম নিতে পারে না।

---

[৯২] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৫৪, হাদীস নং ৫২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে গেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখার জন্য যান এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ছেলেটি ইসলাম কবুল করে।[৯৩]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুমহান উন্নত চরিত্র এবং একজন অসুস্থ খাদেমকে দেখা এবং খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য তার বাড়িতে গমন করাই তাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অতএব একবার ভাবুন, একজন অসুস্থ ব্যাক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য তার বাড়িতে গমন করা অসুস্থ ব্যক্তির মনে যে প্রভাব পড়েছিল তার ফলশ্রুতিতেই সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন। একদা আমি পেটের ব্যথায় অসুস্থ ছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু হুরাইরা! তোমার কি পেটে ব্যথা? আমি আরজ করলাম হ্যাঁ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উঠ, নামাজ পড়। কেননা নামাজে আরোগ্য রয়েছে।[৯৪]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজকে মুমিনের মিরাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি নির্বিষ্ট হওয়ার সর্বোত্তম মাধ্যমটি বলেছেন। আল্লাহর বান্দা যখন নামাযের জন্য নিয়ত বাঁধে তখন সে দুনিয়ার সব চিন্তা-ভাবনা ও দূঃখ কষ্ট ভুলে যায়। নামাযে পঠিত দু'আ সমূহ নামাযের ভাব-ভঙ্গি, উঠা-বসা সব কিছু একথাই প্রকাশ ও প্রমান করে। উপরোক্ত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর একজন মর্যাদাবান সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) কে নামাজের আরো একটি ফায়দার কথা বলেছেন যে, যেকোন দূঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা যাই হোক, নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে তাহলে দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তা দূর করে দেবেন। কেননা নামাযে শেফা ও আরোগ্য রয়েছে।

রোগীর অন্তিম মুহূর্তের করণীয়

প্রত্যেক জীবন্ত জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দুনিয়াতে আসার পর একদিন তাকে বিদায় নিতেই হবে। দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার এই অন্তিম মূহূর্তটি কিভাবে অতিক্রান্ত হবে?

এ সম্পর্কে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সম্মানিত সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা মৃত্যু পথযাত্রী লোকদের তার অন্তিম মূহূর্তে কালেমায়ে তাইয়েবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- এর তালক্বীন কর।[৯৫]

---

[৯৩] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৬০, হাদীস নং ৫২৫৫

[৯৪] ইমাম ইবনে মাজাহ্ (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ সালাত একটি শিফা, হাদীস নং ৩৪৫৮

[৯৫] মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী (র), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩০৯

Dhaka University Institutional Repository

যদি কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বড়ত্ব ও মহত্মের বাণী শুনানো হয় তাহলে তার অন্তর দুঃখের পরিবর্তে প্রশান্তি লাভ করে। সে মৃত্যুর সময়েও শান্তিপূর্ণ ভাবে মৃত্যু লাভ করতে পারে।

হযরত মু'আয (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার জীবনের শেষ কালাম হবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৯৬]

হযরত মালিক ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের মুমূর্ষদের উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে।[৯৭] আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি প্রিয় বান্দার মৃত্যুর মুহূর্তগুলো থাকে খুবই কঠিন এবং কষ্টদায়ক। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও কষ্টকর সময় কেঁটেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলে তাঁর পাশে রক্ষিত একটি পানির পাত্রে বার বার হাত ভিজিয়ে এনে স্বীয় চেহারা মুবারকে মাছেহ করেছেন। এ সময় তিনি মৃত্যুর কঠিন যাতনা থেকে আল্লাহর নিকট সাহায্য চেয়েছেন। জীবনের অন্তিম মূহুর্তটি কত কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে, আল্লাহর প্রিয় হাবীবের জীবনেও সেই চরম সন্ধিক্ষণটি অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময় তিনি এমন প্রচন্ড গরম অনুভব করেন, যার ফলে বার যার তিনি তাঁর হাত ঠান্ডা পানিতে ডুবিয়েছেন ও ভিজা হাতে চেহারা মুবারক মুছেছেন। এ কঠিন অবস্থাতেও তিনি তাঁর পবিত্র মুখে আল্লাহর মাগফিরাত ও রহমত কামনা করেছেন। মহান বন্ধুর সাথে মিলনের ঐকান্তিক আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন।

---

[৯৬] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩১০

[৯৭] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩১০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম নির্দেশিত জীবন পদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞানের নব নব আবিস্কার বর্তমান পৃথিবীকে বর্ণিল করে তুলেছে। পৃথিবীবাসী প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিস্কারের সাথে পরিচিত হচ্ছে। স্বল্প ও অস্থায়ী জ্ঞানের অধিকারী মহল এতে পুলকিত হয়ে মনে করছে এটা একমাত্র বিজ্ঞানীদেরই অবদান। সফলতার শত ভাগ শুধু বিজ্ঞানীদেরই। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণরূপে তার ব্যতিক্রম। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্, পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন তিনি। এর মধ্যকার সবকিছু তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি যমীনের সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুত তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সব বিষয়ে অবহিত।"[৯৮]

আজকের জড়বাদী গোষ্ঠী দুনিয়া নিয়েই ডুবে থাকার পেছনে অন্যতম কারণ আল্লাহ আছেন, পরকাল আছে এই কথাটি তারা বুঝতে চাইছে না। আল্লাহ অবশ্যই আছেন। কুরআনের বাণী চিরসত্য। রাসূলের সত্য এই কথাগুলো জড়বাদীরা উপলব্ধি করতে পারছেনা।

বর্তমান বিজ্ঞানের বিস্ময়কর যত আবিস্কার তার মূল উৎস যে আল-কুরআন এ বিষয়টি স্পষ্ট হলে হয়তবা এই সকল দাম্ভিকরা এক আল্লাহ্কে বিশ্বাস করার সৌভাগ্য লাভ করবে। বিজ্ঞানের আজকের আবিস্কারের সর্বশেষ যে ফলাফল তা আল-কুরআনের বক্তব্যের সাথে কোন প্রকার সাংঘর্ষিক নয় বরং সম্পৃক্ত। এই কথাটি জোরালো ভাবে তুলে ধরা প্রত্যেকটি মুসলিম গবেষকের একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে যে সব জ্ঞান-বিজ্ঞান রেখেছেন, বিজ্ঞান এই পর্যন্ত তার অল্প অংশই গবেষণা করতে পেরেছে। আর যতটুকু অংশ গবেষণা করেছে তা সম্পূর্ণ বাস্তব এমন প্রমাণ তারা পেয়েছে ও তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বাকী বৃহৎ অংশ এখনো তারা গবেষণা করে বের করতে পারেনি। আল-কুরআনের বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা এ জন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। অতীতের যেসব তাফসীরগুলো রয়েছে তা সময়ের চাহিদার আলোকে সাধারণভাবে রচিত হয়েছিল। যেমন তাফসীরে কাবীর যুক্তি ও তর্কের জবাবের নিরিখে লেখা। কারণ আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) তা এমন এক সময় রচনা করেছেন যখন তর্কশাস্ত্রের ছড়াছড়ি ছিল এবং তিনি এর মাধ্যমে সমসাময়িক সব যুক্তি তর্কের সমুচিত জবাবও দিয়েছিলেন। আজকের পৃথিবীতে যেহেতু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছড়াছড়ি সেহেতু বিজ্ঞানের নিরিখে তাফসীর রচনা যুগের চাহিদার আলোকে আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এজন্য যত তাড়াতাড়ি এই ঘাটতি পূরণ হবে তত তাড়াতাড়িই পৃথিবীর অস্থায়ী জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল লোকদের জন্য একটা সতর্কবার্তাসহ বর্তমান মুসলিম উম্মাহর জাগরণের এক বিশাল পাথেয় হবে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এক মহা বিস্ময়কর গ্রন্থ। পৃথিবী তার শুরু থেকে অদ্যবধি এমন বিস্ময়কর গ্রন্থের সন্ধান পায়নি। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত এ মহাগ্রন্থের বিস্ময়কারিতার কোন সমাপ্তি ঘটবে না

---

[৯৮] هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (আল-কুরআন ২ : ২৯)

Dhaka University Institutional Repository

এবং এর মত কোন গ্রন্থ রচনাও সম্ভব হবে না। প্রায় দেড় হাজার বছরের এই প্রাচীন গ্রন্থকে আধুনিক বিজ্ঞানের মুখোমুখি করা হয়েছে। মজার এবং আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কুরআনের দাবী হচ্ছে বিশ্বাস আর বিজ্ঞানের দাবী হচ্ছে প্রমাণ। অথচ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ দু'টো একে অন্যের চোখের গভীরে নিজেকেই স্বচ্ছভাবে দেখতে পাচ্ছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কোন বিজ্ঞানের গ্রন্থ না হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতিটি শব্দ, বাক্য এবং সূরা বিজ্ঞানভিত্তিক। যাতে বাস্তবতা ব্যতীত কোন অবাস্তবতা নেই। আর থাকার প্রশ্নই আসে না কারণ তা যে সুমহান বিজ্ঞানী আল্লাহর কালাম (কথা)। বিজ্ঞান বলছে মানব সন্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। পুরুষের বির্যে লক্ষ্য কোটি শুক্রাণু[৯৯] হতে মাত্র একটি[১০০] সুস্থ-সবল শুক্রাণু স্ত্রীলোকের ডিম্বানুর সাথে ফ্যালোপিয়ান টিউবে মিলিত হয়ে তৈরী হয় 'জাইগোট'। পরে তা থেকে কোষ বিভাজন হয়ে এক কোষ থেকে দুই কোষ, দুই কোষ থেকে চার কোষ, চার কোষ থেকে আট কোষ, আট কোষ থেকে ষোল কোষে রূপান্তরিত হয়। এর কিছুদিন পর তা 'ব্লাস্টোসিস্ট' আকারে জরায়ুতে অবস্থান করে এবং নিরাপদ আবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। জরায়ুতেই 'ব্লাস্টোসিস্ট' দিন-দিন বড় হতে থাকে। প্রথমে তৈরী হয় 'এক্টোডার্ম', 'এন্ডোডার্ম'; ও 'মেসোডার্ম' এই তিন স্তর বিশিষ্ট এমব্রায়োনিক ডিস্ক।[১০১] এই পর্যায়ে প্রতিনিয়ত আকৃতি পরিবর্তন হতে থাকে। প্রথম প্রথম এটি দেখতে চেপ্টা ও প্রায় গোলাকার। ধীরে-ধীরে এটি লম্বা হতে থাকে। মাথার দিকটা মোটা হয় এবং নিচের দিকটা সরু হয়। দেখতে অনেকটা জোঁকের মতো। এই পর্যায়ে ভ্রূণের মধ্যে জীবন সঞ্চিত হয়, হৃৎস্পন্দন শুরু হয়। ধীরে-ধীরে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরী হতে থাকে। ভ্রূণ বড় হতে থাকে আর এর বিভিন্ন স্থানে গুটি-গুটি ভাজ হতে থাকে। এ সময় ভ্রূণটি দেখতে চর্বিত মাংস খন্ডের মতো দেখায়। এরপর তাতে মস্তিষ্ক, হাড়, মাংস, চোখ, কান ইত্যাদি তৈরী হয়। ক্ষণে-ক্ষণে ভ্রূণটি জরায়ুর মধ্যে বড় হতে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পর ফুটফুটে সুন্দর মানব সন্তান প্রসব হয়।

বিজ্ঞানময় কুরআনে মহান রাব্বুল আল-আমীন প্রায় ১৫০০ (দেড় হাজার) বছর পূর্বে মানব জাতির জন্মতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে কোরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে মানব-প্রজননের কলাকৌশল বা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে। এ ছাড়াও আল-কুরআনে রয়েছে মানব-প্রজননের বিভিন্ন পর্যায়ের বেশ কিছু বিবরণ।[১০২]

"আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাকা থেকে, তারপর পূর্ণ ও অপূর্ণাকৃতির গোশতো পিন্ড থেকে; তোমাদের কাছে আমার কুদরত ব্যক্ত করার জন্য, আমার ইচ্ছামত জরায়ুতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখি' এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়, যাতে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ

---

[৯৯] অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম ও স্বাস্থ্য*, ঐতিহ্য, ঢাকা: ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১২

[১০০] ড.মরিস বুকাইলি, অনুবাদ আখ্তার-উল্-আলম, *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা: সপ্তম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ২৭৪

[১০১] অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম ও স্বাস্থ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[১০২] ড.মরিস বুকাইলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্ব প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।"[১০৩] আল্লাহ তা'আলা এখানে মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন যে, প্রথমে তিনি সরাসরি মাটি থেকে হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন। এটা আল্লাহর কাছে খুবই সহজ কাজ। তারপর হাওয়া (আঃ) কে সৃষ্টি করে আদম (আঃ) এর জোড়া তৈরী করে দিলেন। এটাও আল্লাহ্‌র জন্য সহজ কাজ। এরপর মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ যে জোড়ার কথা বলেছেন এই জোড়া স্ত্রী পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় মানুষের শুক্র কীটের মধ্যেও রয়েছে জোড়া। ঐ জোড়া থেকেই কোনটা পুরুষ সন্তান হচ্ছে আর কোনটা হচ্ছে নারী সন্তান। এই জোড়া সম্পর্কে কুরআন নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল এইরূপ যে, পুরুষের শুক্রকীট থেকে পুরুষ ও কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। স্ত্রীদের রেহেম হচ্ছে তার বাহক মাত্র। কিন্তু আল-কুরআনে যখন আল্লাহ তা'আলা বললেন,
পুরুষ ও নারীর মিলিত শুক্রকীট থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়।[১০৪]
তখন থেকে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টে গেল এবং তার উপরও গবেষণা শুরু হল। মানুষের শুক্রকীট আল্লাহ জোড়ায় জোড়ায় মাতৃগর্ভে মিলিয়ে দেন। এই জোড়া মিলানোর ব্যাপারেও কোন এলোমেলো ব্যবস্থা নেই। ব্যবস্থা আছে সুপরিকল্পিতভাবে জোড়া লাগানোর।

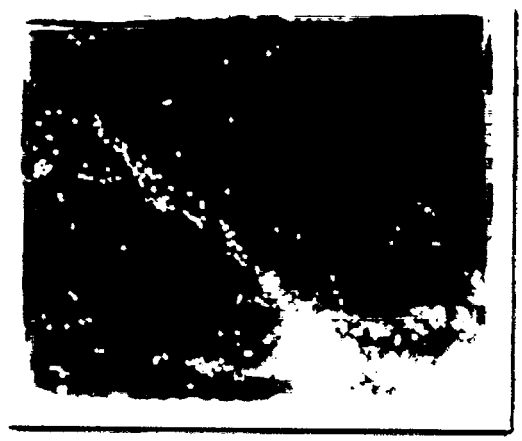

চিত্রঃ স্ত্রী জনন অঙ্গ থেকে নিঃসৃত ডিম্বাণু

চিন্তা গবেষণা আমাদের দ্বারা সম্ভব না হলেও অন্যান্য জাতির বিজ্ঞানীগণ তা ঠিকই করেছেন। তাদের গবেষণামূলক পরীক্ষায় ধরা পড়েছে যে, শুক্রকীট পুরুষদের থেকেও যেমন আসে তেমনি নারীদের কাছ থেকেও আসে। পুরুষের যে শুক্রকীট থাকে তাতে প্রায় দুই কোটি সন্তান জন্ম নিতে পারে। কিন্তু তার থেকে মাত্র ১টি কিংবা দু'টি সন্তানই সাধারণত জন্ম নেয়। এই শুক্রকীট যার থেকে একটা সন্তান

---

[১০৩] يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (আল-কুরআন ২২ : ৫)

[১০৪] إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (আল-কুরআন ৭৬ : ২)

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম নেয় তার মধ্যে পুরুষের বীর্যে থাকে ২৩ জোড়া এবং স্ত্রীর বীর্যে ২৩ জোড়া ক্রোমোজম। এর মধ্যে পুরুষের বীর্যে ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোজম এবং নারীর বীর্যে ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোজম থাকে। এরা সন্তান উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। অবশিষ্ট ২২ জোড়া কে বলা হয় অটজোম। বিজ্ঞান পুরুষের সেক্স ক্রোমোজম দু'টির নাম দিয়েছে x ও y, এবং নারীর সেক্স ক্রোমোজম দু'টির নাম দিয়েছে xx . এই ক্রোমোজমের মধ্যেও আল্লাহর বিধানানুযায়ী জোড়া রয়েছে। এটা এরূপ যে, মায়ের কাছ থেকে মাথা তৈরীর যে ক্রোমোজম সেটাকে আকর্ষণ করে পুরুষের কাছ থেকে আসা মাথা তৈরীর ক্রোমোজম। এভাবে প্রত্যেক স্বজাতীয় ক্রোমোজম একটি অপরটিকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। ফলে একই গুণ বিশিষ্ট ২২ জোড়া ক্রোমোজম (অটজোম) এক সঙ্গে জোড়া লেগে হয় ৪৪ জোড়া। অবশিষ্ট ২ জোড়া (পুরুষের ১ জোড়া এবং নারীর ১ জোড়া) বাকী থাকে তারাও একে অপরকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করতে থাকে। এরপর পুরুষের কাছ থেকে যদি xy এর x এবং স্ত্রীর কাছ থেকে x x এর যে কোন একটি x এর সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে পুরুষের কাছ থেকে আসা y এবং স্ত্রীর কাছ থেকে আসা অপর x নামক ক্রোমোজমটি নষ্ট হয়ে যায়। পূর্বের ৪৪ জোড়ায় কোন লিঙ্গ তৈরী হয় না বরং লিঙ্গ তৈরী হয় ২৩ নং জোড়ায়। ঐ জোড়ার মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রীর দু'টো x ক্রোমোজমের মাধ্যমে একটি ডিম্বকোষ তৈরী হয়। যার ফলে সন্তান হয় একটি কন্যা সন্তান। আর পুরুষের x ও y এর মধ্যে y এবং স্ত্রীর x x এর একটি যদি মিলিত হয় তবে এতে তৈরী হয় অন্ডকোষ। সন্তান হয় পুরুষ সন্তান। মানুষের দেহগঠনের এটাই শেষ ব্যবস্থা নয়, এর সঙ্গে রয়েছে আরো অনেক সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর ব্যবস্থা। তা হচ্ছে এই ২৩ জোড়া ক্রোমোজমের বহু ছোট ছোট সেল রয়েছে মৌমাছির মৌচাকে তার বাচ্চা ও মধু রাখার যে রূপ একেকটা খোপ থাকে ঠিক তেমনি প্রত্যেক জোড়া ক্রোমোজমের থাকে বহু বহু সেল।[১০৫]

ক্রোমোজমের মধ্যে থাকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের উপাদান। যেগুলোর নাম দেয়া হয়েছে 'জীন'। সে জীন শব্দ থেকেই ইংরেজী 'জেনারেশন' শব্দের উৎপত্তি। ঐ জীনের মধ্যে থাকে সন্তানের দেহের রং তৈরীর উপাদান। চোখের মনির রঙ, চুলের রঙ, কানের পাতলা পর্দা তৈরীর উপাদান। এভাবে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরীর উপাদান। যদি কারো শুক্রকীটের মধ্যে চোখ তৈরীর জীন না থাকে তবে অন্ধ হয়ে তার জন্ম হবে। কারো জীন যদি কানের পাতলা পর্দার উপাদান শূন্য হয় অর্থাৎ কানের যে পর্দায় আওয়াজ ধরা পড়ে ঐ বিস্ময়কর পর্দা তৈরীর উপাদান না থাকে তবে তার কানের ঐ পর্দা ছাড়াই তার জন্ম হবে। সে হবে বধির। আর বধির হওয়ার কারণে সে কানে শুনবেনা। আর কথা না শুনতে পারলে কথা শিখতেও পারবে না বলতেও পারবে না। ফলে বধির হওয়ার কারণে বোবাও হবে। এভাবে হাজারো লাখো ব্যবস্থাপনা রয়েছে মানবদেহ সৃষ্টির ব্যাপারে। আল্লাহ তা'আলা মানবদেহের মধ্যে ফুসফুসকে তৈরী করেছেন এমনভাবে যে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি তা ধরে রাখার মত ক্ষমতা তিনিই দিয়েছেন। আর হৃদপিন্ড বা হার্টকে আল্লাহ তা'আলা এমন কায়দায় সৃষ্টি করেছেন যে, শিরা প্রতিনিয়ত রক্ত শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে মিনিটে ৭২ থেকে ৮০ বার[১০৬] করে বয়ে নিয়ে আসে হার্টের মধ্যে যেখানে রক্ত ছাকাই হয়ে দুষিত অংশটুকু

---

[১০৫] অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ, *সুস্বাস্থ্যের জন্য*, ঐতিহ্য, ঢাকা: ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রি. পৃ. ৭৯-৮০

[১০৬] ডাঃ এস. এন. পান্ডে, *ফিজিওলজী শিক্ষা*, আদিত্য প্রকাশালয়, কলিকাতা: পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

রেখে দিয়ে বিশুদ্ধ রক্ত পাঠিয়ে দেয় ফুসফুসের মধ্যে। সেখান থেকে ফুসফুসে ধরে রাখা অক্সিজেন রক্ত নিয়ে নেয়। এরপরে ঐ অক্সিজেন নিয়ে রক্ত আবার চলে যায় দেহের সর্বত্র। আল্লাহ যে কত বড় বিজ্ঞানী আর কুরআন যে কত বৈজ্ঞানিক সন্ধান দিয়েছে তা কি মানুষের ভেবে দেখা উচিৎ নয়? যারা এসব ভেবে দেখে না সেই সব হতভাগ্যদের ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, সে আমার জন্য উদাহরণ পেশ করে এবং তার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে ভুলে যায়।[১০৭] মানুষ যদি তার নিজের দেহের সৃষ্টি বিজ্ঞানটুকুই বুঝতে চেষ্টা করত! যা বোঝার জন্য আল্লাহ বারবার তাকিদ দিয়েছেন, তবে হয়তবা একটা মানুষও আল্লাহকে ভুলে থাকতে পারতনা এবং আল্লাহর আইনেরও বিরোধিতায় লিপ্ত হতো না। সে স্বাস্থ্যকর সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জীবন-যাপন পরিচালনা করতে পারতো। মহান আল্লাহ বলেন, তিনি পুরুষ ও নারীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন, স্খলিত শুক্রবিন্দু থেকে।[১০৮] তিনি বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।[১০৯] কোথা থেকে তাকে সৃষ্টি করলেন? বীর্য থেকে সৃষ্টি করে পরিমিত করলেন।[১১০]

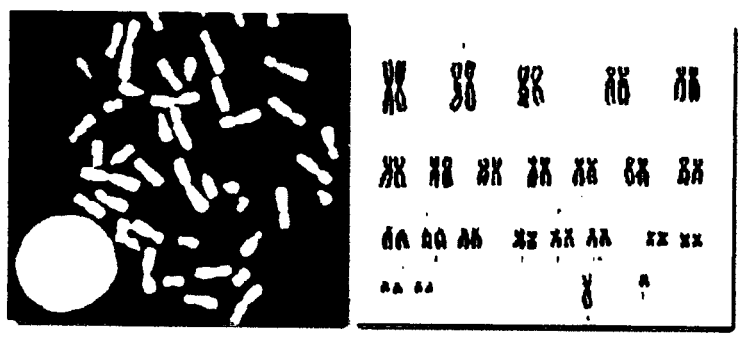

চিত্রঃ ডিম্বাণু

মানুষকে মিলিত বির্য থেকে সৃষ্টি করেছি।[১১১]
সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? পরে সে জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত হয়েছিল, তিনি তাকে মানব আকৃতি দান করেছেন।[১১২]

অতএব মানুষের লক্ষ্য করা উচিত, কি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে! তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি থেকে, যা বের হয়ে আসে (মানুষের) পিঠের (মেরুদন্ডের) ও বুকের (পাঁজরের) মাঝখান দিয়ে।[১১৩]

---

১০৭ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (আল-কুরআন ৩৬ : ৭৮)
১০৮ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى - مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (আল-কুরআন ৫৩ : ৪৫-৪৬)
১০৯ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (আল-কুরআন ১৬ : ৪)
১১০ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ- مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (আল-কুরআন ৮০ : ১৮-১৯)
১১১ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً (আল-কুরআন ৭৬ : ২)
১১২ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى - ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (আল-কুরআন ৭৫ : ৩৭-৩৮)
১১৩ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ- خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ- يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (আল-কুরআন ৮৬ : ৫-৭)

Dhaka University Institutional Repository

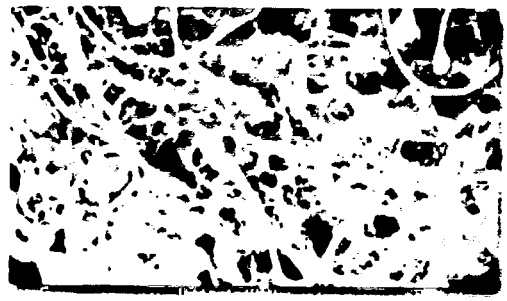

চিত্র: শুক্রবিন্দু

পরে শুক্রবিন্দুকে জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত করি, তারপর ওই জমাট বাঁধা রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করি, ওই মাংসপিন্ডকে অস্থিতে, পরে অস্থিকে গোস্ত দিয়ে ঢেকে দিয়েছি, অতপর তাকে গড়ে তুলি স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আল্লাহ তা'আলা কতইনা সুনিপুণ সৃষ্টি কর্তা।[১১৪]

চিত্র: জাইগোট

মানুষকে আলাকা হতে সৃষ্টি করেছেন।[১১৫] (আলাকা শব্দের অর্থ ঝুলন্ত, রক্ত পিন্ড ইত্যাদি। আলাকা অর্থ এমনকিছু যা লেগে থাকে)।

অতঃপর আমি নিরাপদ স্থানে রেখেছি, এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।[১১৬]

তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাতৃগর্ভে ও ত্রিবিধ অন্ধোকারে।[১১৭]

তিনি তাকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।[১১৮]

---

১১৪ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (আল-কুরআন ৪০ : ১৪)

১১৫ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (আল-কুরআন ৯৬ : ২)

১১৬ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ- إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ (আল-কুরআন ৭৭ : ২১-২২)

১১৭ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ (আল-কুরআন ৩৯ : ৬)

১১৮ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (আল-কুরআন ৭১ : ১৪)

Dhaka University Institutional Repository

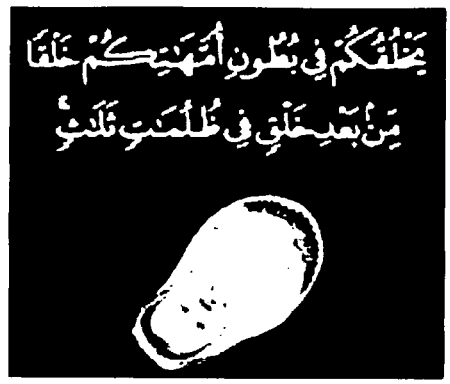

চিত্রঃ মানব ভ্রূণ

তাকে সুঠাম করলেন, তাতে নিজের পক্ষ থেকে রুহ প্রদান করলেন, কর্ণ, চক্ষু ও মন প্রদান করলেন।[১১৯]

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বহু পূর্বেই মানব শিশুর জন্মের বিবরণ পবিত্র কুরআনে কত সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এসব ভাবলে বিস্ময়ে সত্যিই মাথা নত হয়ে আসে; কত জ্ঞানগর্ভই না মহাগ্রন্থ আল-কুরআন!

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন, তিনি পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[১২০] মহান আল্লাহ্ যেখানে পৃথিবীর সমস্ত কিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সেখানে মানুষ সেগুলো থেকে উপকারের সন্ধান না করে সময় ব্যয় করছে মরণাস্ত্র তৈরীর পিছনে। সত্যিই ভাবনার বিষয়! আমাদের বিবেক বুদ্ধি ঠিক আছেতো?

বিবেক বুদ্ধি

পবিত্র কুরআনে বিবেক বুদ্ধি কে 'আকল' বলা হয়েছে। 'আকল' শব্দটি পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন ভাবে মোট ৪৯ বার ব্যবহার হয়েছে। শব্দটি কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে, 'হয় বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে বোঝার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, আর না হয় ঐ কাজে বিবেক বুদ্ধি না খাটানোর কারণে তিরস্কার করার জন্য'। বিবেক বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করেনা, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।[১২১]

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।[১২২]

---

[১১৯] وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (আল-কুরআন ৩২ : ৯)

[১২০] هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (আল-কুরআন ২ : ২৯)

[১২১] وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (আল-কুরআন ১০ : ১০০)

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা গবেষণা করাকে আল্লাহ কি অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা নতুন তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিস্কার হয়ে ধরা দিবে। মহান আল্লাহ্ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না বলে কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাঁটিয়ে বোঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) ইসলামের প্রতিটি কথাই বিবেক-বুদ্ধি সম্মত। বিবেক-বুদ্ধির বাইরে ইসলামের কোন বক্তব্য নেই। বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কুরআন অথবা হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। অতএব মানুষের জ্ঞান একটা বিশেষ স্তরে না পৌছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে নাও আসতে পারে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্য। এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে।[১২৩]

মহান আল্লাহর দেয়া অতি প্রয়োজনীয় নিয়ামতকে জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা ব্যবহার ও কার্যকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা জ্ঞান বুদ্ধিরই পরিচায়ক।

খাদ্য, পুষ্টি ও মানবদেহ

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষার এবং জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। স্বাস্থ্য রক্ষার মূল উপাদান সুষম খাদ্য। খাদ্য দ্রব্য শরীরের উপর অনেক প্রভাব বিস্তার করে। শরীর ভাল থাকলে মনও ভাল থাকে। তাতে নৈতিক চরিত্র উন্নত হয় এবং মন ভাল থাকলে আত্মাও ভাল থাকে। আবার খাদ্য দ্রব্যে হালাল হারামের ব্যবস্থা রয়েছে। হালাল খাদ্য বলতে ঐ খাদ্য কে বুঝায় যেগুলো খেতে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেগুলো গ্রহণ করেছেন অথবা গ্রহণ করতে অনুমতি দিয়েছেন। কোন খাদ্য শরীরের জন্য ভাল এবং কোন খাদ্য শরীরের জন্য মন্দ এ ব্যাপারে শরীর নির্মাতা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবচেয়ে ভাল জানেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালালাম আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোন কিছু বলতেন না বা করতেন না। অতএব নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালালমের গ্রহণকৃত খাদ্য দ্রব্য শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজন্য খাদ্য দ্রব্যের সীমা নির্ণয় করে দিয়েছেন অর্থাৎ কতক হালাল ও কতক হারাম নির্ণয় করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র' কুরআনের কয়েকটি আয়াত ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হাদীসের উদৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

---

১২২ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (আল-কুরআন ৮ : ২২)

১২৩ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ- فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ- وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (আল-কুরআন ৫৫ : ১০-১৩)

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তোমাদের জন্য মৃত দেহ, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম ঘোষনা করা হয়েছে সে সব প্রাণী হারাম করে দিয়েছেন, তবে কোন লোক যদি বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে সে তা বিদ্রহী হিসাবে অথবা সীমালঙ্ঘন কারী হিসাবে না করে, তবে তাতে কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহ কারী।[১২৪]

তোমাদের জন্য মৃত প্রণীর মাংস, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবেহকৃত প্রাণীর মাংস, শ্বাসরোধ করে হত্যা করা প্রাণীর মাংস, কঠিন আঘাতে নিহত প্রাণীর মাংস, উচ্চ স্থান থেকে পতিত হয়ে আঘাত প্রাপ্ত প্রাণীর মাংস, শিঙ্গের আঘাতে (পশু লড়াই) নিহত প্রাণীর মাংস, যে প্রাণীর কিছু অংশ কোন হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলেছে অবশ্য যদি তাকে যবেহ করার সুযোগ পাওয়া না যায় বা কোন বেদীর উপর বলি দেওয়া হয়েছে এবং যে মাংস তীর ছুড়ে (পাশা খেলার ন্যায়) ভাগ্য নির্ণয় করা হয়েছে, এসবই হারাম, এসবই ফাসেকি কাজ।[১২৫]

হে রাসূল,লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে কোন্ কোন্ খাদ্য তাদের জন্য হালাল। বলুন, তোমাদের জন্য সকল পবিত্র জিনিষই হালাল এবং যদি তোমরা তেমাদের শিকারী প্রাণীকে আল্লাহর শিখানো পদ্ধতিতে শিকার ধরা শিক্ষা দাও তবে তারা যে সব প্রাণী তোমাদের জন্য ধরে আনে তা খাও। তবে তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারন করে নিও। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হিসাব খুব তাড়াতাড়ি নেবেন।[১২৬]

---

[১২৪] إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন ২ : ১৭৩)

[১২৫] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন ৫ : ৩)

[১২৬] يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (আল-কুরআন ৫ : ৪)

Dhaka University Institutional Repository

মৃত প্রাণী হারাম

চিত্রঃ মৃত প্রাণী

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুযায়ী কোন মৃত প্রাণীর মাংস খাদ্য হিসেবে সর্বদা বর্জনীয় যা কুরআন অবিশ্বাসীরাও অনেকাংশে মেনে চলে। এর কারণ হল, কি কারণে প্রাণীটির মৃত্যু হয়েছে তা জানার অবকাশ নেই। তাছাড়া এমন ও হতে পারে যে মারাত্মক কোন সংক্রামক ব্যাধি যথা যক্ষা, এনথ্রাক্স ইত্যাদি রোগে অথবা কোন বিষাক্ত জিনিষের বিষ দ্বারা মৃত্যু ঘটেছে যার প্রভাব সেই মাংস গ্রহণকারী মানুষের উপরই বিস্তার করতে পারে। অতএব দেখা যায়, দেড় হাজার বছরের পূর্বে নাযিলকৃত কুরআনে উল্লেখিত আয়াত নিশ্চয়ই বিজ্ঞানময় ও স্বাস্থ্য সম্মত।

রক্ত হারাম

পবিত্র কুরআনে রক্ত বলতে প্রবাহমান রক্তকেই বুঝায় যা যবাই করার সময় দেহ থেকে সবেগে বের হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই রক্তকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে না। প্রবাহমান রক্তে নানারূপ বিষাক্ত দ্রব্য ও রোগ জীবানু থাকতে পারে যা বের হয়ে গেলে মাংস অধিক সময় ভাল থাকে।

শূকরের গোশত ও অন্যান্য খাদ্য হারাম

চিত্র : শূকরের মাংস

Dhaka University Institutional Repository

শূকরের গোশত হারাম হবার স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। তিনটি প্রধান আহলে কিতাবধারিদের মধ্যে একমাত্র খ্রিষ্টানরাই শূকর ভক্ত। মহান আল্লাহ শূকরকে হারাম করেছেন। এছাড়াও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, শূকরের গোশত খেলে 'ট্রিচিনিয়াসিস' নামক এক প্রকার কৃমি রোগ হয় যা অনেক সময় মৃত্যুর কারণও হয়ে থাকে। 'ট্রিচিনিয়া ইস্‌পাইর‍্যালিস' নামক এক প্রকার সুতার মত কৃমির মূককীট শূকরের গোশতে অবস্থান করে। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করার পরও আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ, চীন, রাশিয়া, জাপান, কোরিয়া, থাইল্যান্ড প্রভীতি প্রগতিশীল দেশে আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী 'ট্রিচিনিয়াসিস্' রোগ দেখা যায়। ওয়াশিংটন পোষ্ট ১৯৫২ সালের ৩১ মে সংখ্যার এক নিবন্ধে ডাঃ প্লেন শোফার্ড শূকরের গোশত ভক্ষণের বিপদ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন, আমেরিকা ও কানাডায় প্রতি ষষ্ঠ ব্যাক্তির একজনের মাংস পেশীতে 'ট্রিচিনিয়াসিস্' নামক ব্যাধির জীবাণু বিদ্যমান রয়েছে। টাইমস পত্রিকায় ১৯৪৬ সালের ৩রা ডিসেম্বরের সংখ্যার ৭৭ পৃষ্ঠায় ডাঃ এস পোল্ড বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে শতকরা ২৫ থেকে ৩৫ জন পর্যন্ত লোক তাদের দেহে 'ট্রিচিনিয়া' জীবাণু নিয়ে বাস করছে। শূকরের গোশতের মাধ্যমে 'টিনিয়া সলিয়াম' নামক অন্য এক প্রকার কৃমিও বিস্তার লাভ করে। কয়েক ফুট লম্বা এই ফিতা কৃমি শূকরের গোশত ভক্ষণের মাধ্যমে মানুষের পেটে যায়। এই কৃমির শুককীট শূকরের গোশতে বিদ্যমান থাকে।[১২৭]

বিশ্ববিখ্যাত চীনা মুসলিম চিন্তাবিদ অধ্যাপক ইব্রাহীম টি ওয়াই মা তদ্বীয় রচিত 'Why Muslims Abstain From Pork' নামক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, শূকরের গোশত পুরাতন ব্যাধিসমূহ জীবন্ত করে তোলে। বাত রোগ ও হাঁপানি রোগ পরিপুষ্ঠ করে তোলে। শূকরের গোশত ভক্ষণ করলে স্মরণশক্তি দূর্বল হয় এবং এর ফলে মাথার চুলও পড়ে যায়। সকল প্রকার প্রাণীর মাংসের মধ্যে শূকরের গোশতই হচ্ছে সর্বপ্রকার অনিষ্টকর জীবাণুর বৃহত্তম আধার। শূকরের গোশত মনুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষময় ও বিষাক্ত। শূকরের গোশতের প্রভাব মানুষের চরিত্রে ও ব্যবহারে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। শূকর স্বভাবতই অলস এবং ইহা অশ্লীল রুচির অধিকারী।

পবিত্র কুরআনে একবার নয় দু'বার নয় চার বার শূকরের গোশত ভক্ষণের নিষেধাজ্ঞা বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারার ১৭৩ নং আয়াত ও সূরা আল মায়িদার ৩ নং আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, হে রাসূল, আপনি বলে দিন, আমার নিকট যেসব ওহী এসেছে তাতে এমন কোন জিনিস পাইনি যা খাওয়া কারো পক্ষে হারাম হতে পারে। তবে তা যদি মৃত, প্রবাহিত রক্ত কিংবা শূকরের গোশত হয় তবে অন্য কথা। কেননা ইহা নাপাক জিনিষ, যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে তা যবেহ করা হয়ে থাকে। তারপর কোন ব্যক্তি যদি একান্ত ঠেকায় পড়ে যায়, কোনরূপ নাফরমানীর ইচ্ছে না রাখে এবং প্রয়োজনের সীমা লংঘন না করে তবে নিশ্চিতই তোমার প্রভূ ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী ও করুণাময়।[১২৮]

আল্লাহ যা কিছু তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন তা হচ্ছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত, আর সেই সব জন্তু যার উপর আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নাম নেওয়া হয়েছে। অবশ্য ক্ষুধায় কাতর ও বাধ্য হয়ে

---

[১২৭] ড.দেওয়ান আব্দুর রহীম, *স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে ইসলাম*, এশিয়া পাবলিকেশনস, ঢাকা: ২০০৬ খ্রি. পৃ. ৩৩

[১২৮] قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন ৬ : ১৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

কেউ যদি এই সব জিনিস খায় আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করার ইচ্ছে না করে কিংবা প্রয়োজন পূরণের সীমা লংঘন কারী না হয়ে, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, ও দয়ালু।[১২৯]

সাপ্তাহিক 'আরাফাত' পত্রিকার সাবেক সম্পাদক মরহুম মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান 'ইসলামের দৃষ্টিতে শূকরের গোশত ' নামক স্বীয় রচিত নিবন্ধে লিখেছেন, ইমাম ইবনে জারীর তাবারী তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'জামেউল বয়ানে' লিখেছেন, 'শূকরের গোশত সম্পর্কে বক্তব্য এই যে তার বহিরাংশও যেমন অপবিত্র ভিতরটাও তেমনি কলুষিত তাই তার সমস্ত হারাম, কোন অংশেই ব্যতিক্রম নেই।[১৩০]

খাদ্য বস্তু পরিপাক হবার পর ইহা শরীর ও দেহের সার বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। মানুষ যে সব বস্তু আহার করে তার দ্রব্যগুণ তার চরিত্র এবং গুণাবলীকে প্রভাবিত করে থাকে। আর লোভ লোলুপতা ও কামুকতা শূকরের মজ্জাগত দোষ। শূকরের গোশত এজন্যই হারাম করা হয়েছে যে এর জঘন্য স্বভাব প্রকৃতি দ্বারা যেন মানুষ প্রভাবিত না হয়। শূকরের গোশত উহার ভক্ষণকারীকে নাপাকী এবং অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও অনাচারের দিকে পরিচালিত করে। উহার মাংস আহারের ফলে ভক্ষণকারীর দেহে এক প্রকার ক্রিমির সৃষ্টি হয়। ইহা ভক্ষণের ফলে ভক্ষণকারী ব্যক্তির জীবনে আত্মসম্মান ও শালীনতা বোধে অত্যন্ত অপপ্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। এছাড়াও শুকর নিষিদ্ধ হওয়ার বহু কারণ থাকতে পারে যা শুধু মহান আল্লাহই ভাল জানেন। তবে আল্লাহ শূকরের গোশত হারাম করেছেন বলে কোন যুক্তি তর্ক ছাড়াই তা অবশ্যই পালনীয়।

আল্লাহর নাম ছাড়া যবেহ করা প্রাণীর গোশত হারাম

আল্লাহ যা কিছু তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন তা হচ্ছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত, আর সেই সব জন্তু যার উপর আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নাম নেওয়া হয়েছে। অবশ্য ক্ষুধায় কাতর ও বাধ্য হয়ে কেউ যদি এই সব জিনিস খায় আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করার ইচ্ছে না করে কিংবা প্রয়োজন পূরণের সীমা লংঘনকারী না হয়ে, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, ও দয়ালু।[১৩১] হালাল প্রাণীর গোশত আমাদের জন্য খাদ্য কিন্তু তাই বলে তাকে অনর্থক কষ্ট দিয়ে কিংবা হত্যার বিকৃত আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে হত্যা করা চলবে না। হালাল জীব যবেহ করতে হলে আল্লাহর নাম স্মরণ করে যবেহ করতে হবে। যাতে একথা মনে পড়ে যে, আল্লাহ এই প্রাণীকে আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন এবং এর গোশত আমাদের শরীরে পুষ্টির প্রয়োজন মেটায় বিধায় আল্লাহরই শিখানো পদ্ধতিতে যবেহ করা হচ্ছে। আর যবেই করার সময় "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, হে প্রাণী আমি আল্লাহর হুকুমে তোমার জীবন শেষ করছি কারণ মানুষের প্রয়োজনেই তোমার সৃষ্টি। তবে একথাও মনে আছে যে আল্লাহ সবার উচ্চে ও সর্বশক্তিশালী। নিজের মনে যেন কোন বড়ত্ব বা আত্ম-অহংকার ভাব না সৃষ্টি হয়।

---

[১২৯] إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন ১৬ : ১১৫)

[১৩০] ড.দেওয়ান আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

[১৩১] إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন ২: ১৭৩)

Dhaka University Institutional Repository

শ্বাসরোধ করে যবেহ করা প্রাণীর গোশত হারাম

তোমাদের জন্য মৃত প্রণীর গোশত, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহকৃত প্রাণীর গোশত, শ্বাসরোধ করে হত্যা করা প্রাণীর গোশত, কঠিন আঘাতে নিহত প্রাণীর গোশত, উচ্চ স্থান থেকে পতিত হয়ে আঘাত প্রাপ্ত প্রাণীর গোশত, শিঙ্গের আঘাতে (পশু লড়াই) নিহত প্রাণীর গোশত, যে প্রাণীর কিছু অংশ কোন হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলেছে অবশ্য যদি তাকে যবেহ করার সুযোগ পাওয়া না যায় বা কোন বেদীর উপর বলি দেওয়া হয়েছে এবং যে গোশত তীর ছুড়ে (পাশা খেলার ন্যায়) ভাগ্য নির্ণয় করা হয়েছে, এ সবই হারাম, এ সবই ফাসেকি কাজ।[১৩২] শ্বাসরোধ করা হিংস্রতার নমুনা। ইসলাম এটাকে আদৌ অনুমোদন করে না। কেননা এই নিয়মে হত্যা করলে প্রাণীকে অনর্থক বেশী কষ্ট দেয়া হয়। ফলে মৃত প্রাণীর শরীরে অত্যধিক দুষিত রক্ত ও অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড জমা হয় যা গোশতের ক্ষতি সাধন করে। যবেহ করলে উক্ত ক্ষতি সাধন হয় না। রক্ত ক্ষরণের মাধ্যমে দুষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়।

কঠিন আঘাতে নিহত জন্তুর গোশত হারাম

কঠিন আঘাতে নিহত জন্তুর গোশতে অতিরিক্ত ল্যাকটিক অ্যাসিড জমা হয় যা গোশতের ক্ষতি সাধন করে। ইহা বর্বরতা ও হিংস্রতার নমুনা বটে। হিন্দুদের বলি দেওয়া আর পাশ্চাত্য দেশের বুলেটে নিহত করা বা যন্ত্রে কাটা ইত্যাদি কঠিন আঘাত ব্যতিত আর কিছুই নয়। হিন্দুরা প্রাণীকে বলি দেয় ঘাড়ের পিছন থেকে কঠিন আঘাত করে, তাতে হাড়কে বিনা কারণে দ্বিখন্ডিত করা হয়। মেরুদন্ডের মধ্যস্থ স্পাইনাল কর্ডকে হঠাৎ দ্বিখন্ডিত করার ফলে অনেক প্রয়োজনীয় রস মাংসপেশী থেকে বের হয়ে যায়। তাছাড়া বলি দিয়ে হিন্দুরা প্রাণীর গলা চেপে ধরে প্রবাহিত রক্ত বের হতেও বাধা দেয়। এর তুলনায় যবেহ অনেক কম আঘাতে হয় এবং গোশত নষ্টও হয়না। শুধু রক্তপাত হয়ে মৃত্যু ঘটে।

উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে আঘাত প্রাপ্ত প্রাণীর গোশত হারাম

কোন উচ্চ স্থান থেকে নিচে পতিত হয়ে আঘাত প্রাপ্ত প্রাণীর গোশতে ল্যাকটিক অ্যাসিড বেশী থাকে। শক এর জন্য মৃত্যুর ফলে মাংস সমূহ কুচকিয়ে যায়। ফলে গোশতের গুণগত মান কমে যায় এবং দূষিত হয়ে যায়।

পশুর লড়াইতে নিহত প্রাণীর গোশত হারাম

প্রাণীতে প্রাণীতে লড়াই লাগিয়ে শিংয়ের আঘাতে নিহত হালাল প্রাণীর গোশত হারাম। ইহা একটি অসভ্য ও বর্বরোচিত প্রথা। স্পেনে 'বুল ফাইট' নামক এক প্রকার বর্বর খেলা প্রচলিত আছে। এতে

---

[১৩২] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন ৫ : ৩)

Dhaka University Institutional Repository

ষাড়কে বার বার আঘাত করে হত্যা করা হয়। ইসলাম এগুলো হারাম করে দিয়ে মানবতার পরিচয় দিয়েছে।

হিংস্র জন্তুর কামড়ে নিহত প্রাণীর গোশত হারাম

হিংস্র জন্তুর কামড়ে নিহত হালাল প্রাণীর শরীরে কোন বিষাক্ত জিনিষ প্রবেশ করতে পারে। তাই হালাল হওয়া সত্ত্বেও উহা ভক্ষণ করা হারাম। যদি জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং হিংস্র জন্তুর আঘাত খুব অল্প সময় পূর্বে ঘটেছে বলে প্রতিয়মান হয় তাছাড়া আঘাত অতি সামান্য হওয়ার কারণে গোশত দূষিত হবার সম্ভাবনা কম। হিংস্র জন্তু কোন হালাল প্রাণীর অংশ বিশেষ খেয়ে ফেললে এবং প্রাণীটিকে জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে তাকে যবেহ করে খাওয়া হালাল, নয়ত হারাম।

দেবীর উপর বলি দেয়া প্রাণীর গোশত হারাম

কোন দেবীর উপর হত্যা করার মানে কোন দেব-দেবীর নামে বলি দেওয়াকে বুঝায় এবং তা শির্‌ক এবং খাওয়া হারাম। অনুরূপ ভাবে কোন কবর কিংবা মাজার অথবা রওজাতে পীরের নামে যবেহ করা পশুর গোশত হারাম হবে।

তীর ছুড়ে ভাগ করা গোশত হারাম

লটারীর উদ্দেশ্য হলো জুয়া খেলা এবং লোক ঠকানো। ইহা ইসলামে হারাম। অতএব তীর মেরে গোশত ভাগ করা ইসলামে হারাম করা হয়েছে।

শিকারী প্রাণী দ্বারা ধৃত প্রাণী যবেহ না করলে গোশত হারাম

হে রাসূল, লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে কোন্ কোন্ খাদ্য তাদের জন্য হালাল। বলুন, তোমাদের জন্য সকল পবিত্র জিনিষই হালাল এবং যদি তোমরা তেমাদের শিকারী প্রাণীকে আল্লাহর শিখানো পদ্ধতিতে শিকার ধরা শিক্ষা দাও তবে তারা যে সব প্রাণী তোমাদের জন্য ধরে আনে তা খাও। তবে তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নিও। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হিসাব খুব তাড়াতাড়ি নেবেন।[১৩৩] শিকারী প্রাণী দ্বারা ধৃত হালাল প্রাণীকেও জীবিত অবস্থায় আল্লাহর নামে যবেহ করে নিতে হবে। সাধারণত কুকুরকে শিকারী প্রাণী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কুকুর হিংস্র বিধায় হারাম এমনকি তার কামড়ে নিহত প্রাণীও হারাম যদি জীবিত অবস্থায় তাকে আল্লাহর নামে যবেহ করা সম্ভব না হয়। তার পূর্বে শিকারী কুকুরকে জলাতঙ্ক রোগ মুক্ত হতে হবে কিংবা উক্ত রোগের প্রতিষেধক হিসেবে টিকা দিয়ে নিতে হবে।

খাদ্যই হচ্ছে শরীরের শক্তির মূল উৎস। খাদ্য গ্রহণের ফলে বিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদানগুলো রক্তের ভেতরে চলে আসে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণকৃত অক্সিজেনের সাহায্যে সেগুলোর দহন ঘটে। ফলে দেহে তাপ শক্তি তৈরী হয়। প্রতিনিয়ত মানব দেহে ক্ষয় ঘটছে। মানবদেহের এই ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধনের কাজটিও পালন করে খাদ্য। খাদ্য একদিকে যেমন

---

[১৩৩] يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (আল-কুরআন ৫ : ৪)

Dhaka University Institutional Repository

ক্যালোরী তেরী করে অন্যদিকে শরীরকে রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য এন্টিবডি তৈরী করে। প্রকৃতির হাজার রকম ফল-মূল, শাক-সব্জি হতে পারে আমাদের খাদ্যের উৎস। আর এই খাদ্য বিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শরীরের উপযোগী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শরীর যন্ত্র কখনও সম্পূর্ণ বিশ্রাম অবস্থায় থাকেনা। জাগ্রত অবস্থায়তো কাজ করেই, ঘুমের মধ্যেও আমাদের শরীর কিছু কিছু কাজ করতে থাকে। ফুসফুস, হৃৎপিন্ড, কিডনী সহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনবরত কাজ করতে থাকে। সেই সঙ্গে দেহের প্রতিটি কোষের সূক্ষতর অংশের মধ্যে চলতে থাকে বিপাক প্রক্রিয়া। শরীরকে সচল রাখার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গে এই যে সব প্রক্রিয়া চলতে থাকে এটাই বিপাক প্রক্রিয়া। আর শরীরকে সচল রাখার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গে ন্যূনতম যে সব প্রক্রিয়া চলতে থাকে, তাকে বলা হয় ন্যূনতম বিপাক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় যে শক্তি বা ক্যালোরি ব্যয় হয় তার নাম ন্যূনতম ক্যালোরি। কোন কাজ না করলেও বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতিদিন প্রায় ১৪০০-১৮০০ কিলোক্যালোরি শক্তি ব্যায় করতে হয়।[১৩৪]

প্রতিটি লোককে প্রতিদিনই ন্যূনতম কিছু কাজ করতে হয়। যেমন গোসল করা, কাপড় পরা ও খোলা, বসা, ঘরের মধ্যে হাঁটা-চলা করা, খাওয়া-দাওয়া করা ইত্যাদি। এছাড়াও অধিকাংশ লোকের নিজেস্ব পেশাভিত্তিক কিছু কাজ কর্ম আছে, তাদের বিভিন্ন কাজে কি পরিমাণ শক্তি খরচ হয় নিম্নে তা ছক আকারে উল্লেখ করা হলো।[১৩৫]

কাজ	প্রতি ঘন্টায় শক্তি খরচ (কিলো ক্যালোরি)
দাঁড়িয়ে থাকা	১৮ - ২২
কথা বলা	৭০ - ৮০
বসে বসে কাজ করা	৮০ - ১০০
ঘরে পায়চারি করা	৮০ - ১২০
ঘর মোছা	১০০ - ১৫০
হাঁটা (ধীরে)	১৫০ - ২০০
সাইকেল চালানো	১৬০ - ১৮০
গোসল করা	১৭৫ - ২২৫
বাগানের কাজ করা	২৭০ - ৩৩০
কাঠ মিস্ত্রির কাজ করা	৩০০ - ৩৫০
রাজ মিস্ত্রির কাজ করা	৩০০ - ৩৫০
সিঁড়ি বেয়ে উঠা	৩৫০ - ৩৭৫
সাঁতার কাটা	৪০০ - ৪৫০
ভার বহন করা	৪৫০ - ৫০০
দৌড়ানো	৫০০ - ৬০০
ফুটবল খেলা	৫৫০ - ৭০০

[১৩৪] ড. মোঃ মামুনুর রশীদ, *মৌলিক পুষ্টি পরিচিতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ফেব্রুয়ারী ২০০৩ খ্রি. পৃ. ৫৭
[১৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক বিপাক ও দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যয়কৃত কর্মশক্তির সামগ্রিক যোগফলকেই পুষ্টিবিজ্ঞানীরা শক্তির চাহিদা হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, ব্যক্তি বিশেষের শক্তির চাহিদা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির দেহের ওজন, স্বাস্থ্যের অবস্থা ও ব্যক্তি যে অঞ্চলে বসবাস করছে সেই অঞ্চলের জলবায়ুর উপর।

গড় হিসাবে মহিলাদের চেয়ে পুরুষের ক্যালোরি বেশি প্রয়োজন হয়। তবে গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মহিলাদের বেশি ক্যালোরির প্রয়োজন। আবার স্তন্যদায়ী মহিলাদের গর্ভবতী মহিলাদের থেকে বেশি ক্যালোরির প্রয়োজন।[১৩৬] জ্বরের সময় বেশি শক্তি ব্যয় হয় বলে বেশি ক্যালোরি যুক্ত খাবারের প্রয়োজন।

ক্যালোরি বা কর্মশক্তির চাহিদা নির্ণয়ের সময় ব্যক্তির পেশা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশে যারা শারিরীক পরিশ্রম করেন যেমন রিক্সা চালানো, হাল চাষ, মাটি কাটা, ভার বহন করা ইত্যাদি তাদের কর্মশক্তির চাহিদা বেশি। নিম্নে ছকের মাধ্যমে বয়স ভিত্তিক গড় শক্তির প্রয়োজনীয় চাহিদা উল্লেখ করা হলো।[১৩৭]

বয়স (বছর)	শক্তির চাহিদা (কিলোক্যালোরি/প্রতিদিন)
০ - ১	৮২০
২ - ৩	১৩৬০
৪ - ৬	১৮২০
৭ - ৯	২১৯০
১০ - ১২	২৬০০ ২৩৫০
১৩ - ১৯	২৭৫০ ২১৯০
২০ - ৪৯	২৬৯০ ২০০০
৫০ - ৫৯	২৪৮০ ১৮০০
৬০ - ৬৯	২২১০ ১৬০০
৭০ - ৭৯	১৯৩০ ১৪০০

নোট : উপরের সংখ্যা পূরুষ এবং নীচের সংখ্যা মহিলাদের গড় চাহিদা দেখানো হয়েছে।

[১৩৬] সম্পাদনা পরিষদ *খাদ্য, পুষ্টি রোগব্যাধি,* বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, ঢাকা: সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ৩
[১৩৭] ড. মোঃ মামুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

শ্বেতসার ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য কর্মশক্তির প্রধান উৎস। এ দুটি উৎস থেকে প্রাপ্ত শক্তির গুণাগুণ একই। তবে, কর্মশক্তির মোট চাহিদার কমপক্ষে ৬০% শ্বেতসার থেকে গ্রহণ করা উচিৎ। স্নেহ থেকে গ্রহণ করা শক্তি মোট চাহিদার কমপক্ষে ২০% হওয়া বাঞ্চনীয়[১৩৮]। বাকিটা আসবে আমিষ থেকে। আমিষের চাহিদা নির্ণয় করার সময় বিভিন্ন উৎসের আমিষের জৈবিক মান বিবেচনা করতে হবে। খাদ্য থেকে গৃহীত আমিষের অন্তত এক তৃতীয়াংশ প্রাণিজ খাদ্য থেকে নেওয়া উচিৎ।

স্নেহ ও শ্বেতসার উভয়ই যেহেতু শক্তির উৎস সেহেতু খাদ্য নির্বাচনের সময় কোন্ উৎস হতে কতটুকু ক্যালোরি গ্রহণ করতে হবে তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় ক্যালোরির ১৫% থেকে ৩০% স্নেহ থেকে নেওয়া উচিৎ। এর বেশী বা কম নিলে অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। হৃদরোগ, মেদ বহুল, ব্লাড কোলোস্টেরল ইত্যাদি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত স্নেহ পরিহার করা উচিৎ। দেহের ওজন অনুযায়ী বিভিন্ন বয়সের লোকের ক্যালোরির দৈনিক চাহিদা নিম্নে ছক আকারে দেওয়া হলো।[১৩৯]

দেহের ওজন (কিলোগ্রাম)	বয়স (বছর)		
	২০	৪০	৬০
৪০	১৭০০ ১৪০০	১৫৫০ ১৩০০	১৪০০ ১২০০
৪৫	১৯০০ ১৫৫০	১৭২৫ ১৪৫০	১৫৭৫ ১৩৫০
৫০	২১০০ ১৭০০	১৮৫০ ১৬০০	১৭৫০ ১৪৭৫
৫৫	২৩০০ ১৮০০	২০৫০ ১৭৭৫	১৯২৫ ১৬০০
৬০	২৫০০ ২০২৫	২২৫০ ১৯২৫	২১০০ ১৭৫০
৭০	২৭০০ ২২৫০	২৫০০ ২১০০	২৩০০ ১৯০০

নোট : উপরের সংখ্যা পূরুষ এবং নীচের সংখ্যা মহিলাদের গড় চাহিদা দেখানো হয়েছে।

পুষ্টির উপাদানসমূহ, বৈশিষ্ট্য এবং দেহে তাদের ভূমিকা

গ্রহণকৃত খাদ্য পরিপাকতন্ত্রে হজম হওয়ার পর প্রয়োজনীয় অংশটুকু আত্তীকরণ করে নেয় এবং বাকি অংশ মল-মূত্র ও ঘাম আকারে শরীর থেকে বের করে দেয়। আত্তীকৃত অংশে যে সব মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ থাকে, সেগুলোকেই পুষ্টি উপাদান বলা হয়। পুষ্টি উপাদানের প্রকৃত সংখ্যা কত, তা

[১৩৮] সম্পাদনা পরিষদ *খাদ্য, পুষ্টি রোগব্যাধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[১৩৯] ড. মোঃ মামুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতোভেদ আছে। কিছু বিজ্ঞানী পুষ্টির সংখ্যা চল্লিশ বলে উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকেই এই সংখ্যা কম বা বেশি বলে মত প্রকাশ করেছেন।

প্রতিটি পুষ্টি উপাদানেরই মানবদেহে সুনির্দিষ্ট দেহতাত্ত্বিক ভূমিকা রয়েছে। সাধারণত একটি অপরটির বিকল্প হয়না। ক্ষেত্রবিশেষ একাধিক উপাদান দিয়ে সুনির্দিষ্ট একটি কাজ সমাধা হয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন উপাদান একাধিক ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রহণকৃত খাবারের মধ্যে কোন পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থাকলে মানবদেহে স্বাভাবিক পুষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। ঘাটতির মাত্রা বেশি ও দীর্ঘস্থায়ী হলে দেহে সুনির্দিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ রোগ সৃষ্টি হয়। হজম ও আত্তীকরণের সময় পুষ্টি উপাদান সমূহের মধ্যে অনেক রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। প্রয়োজনীয় পুষ্টি জ্ঞানের জন্য নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

১. সুষম খাবারের পরিকল্পনা কিভাবে করতে হয়।
২. বিভিন্ন খাদ্যে পুষ্টি উপাদানসমূহ কি পরিমানে থাকে।
৩. কোন শ্রেণীর মানুষের জন্য পুষ্টির কোন উপাদান কতটুকু প্রয়োজন।
৪. পুষ্টির উপাদানসমূহ কি কি এবং এদের দেহতাত্ত্বিক ভূমিকা কি?
৫. খাদ্যের মধ্যে পুষ্টির উপাদানসমূহের ঘাটতি বা আধিক্য থাকলে কোন ধরনের অসুবিধা হয়।
৬. পুষ্টির উপাদান কম নষ্ট করে কিভাবে খাবার প্রস্তুত করা যায়।

পুষ্টিতে বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকার সাদৃশ্য অনুযায়ী পুষ্টিবিজ্ঞানীরা ৬ ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা- আমিষ, শ্বেতসার, স্নেহ, ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণ, অজৈব পদার্থ এবং পানি।[১৪০] প্রতিটি ভাগের উপাদানের পুষ্টিগত ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

পুষ্টিতে আমিষের ভূমিকা

আমিষ দেহ তৈরীর প্রধান কাঁচামাল। শরীরের মাংসল অংশের মোট ওজনের ৪ ভাগের এক ভাগ এবং হাড়ের ওজনের ৫ ভাগের এক ভাগই আমিষ জাতীয় পদার্থ দিয়ে গঠিত। অর্থাৎ শরীরের প্রতিটি কোষের প্রধান কাঠামোই আমিষ দিয়ে গঠিত। বাড়ন্ত ছেলে মেয়ে এবং গর্ভবতী মহিলাদের শরীরে আমিষের প্রয়োজন বেশী। আর ২০ থেকে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত শরীর বৃদ্ধি পেতে থাকে বলে এই সময়েও আমিষের প্রয়োজন বেশী। এছাড়া দেহ গঠন শেষ হলেই আমিষের প্রয়োজন শেষ হয়না। শরীরের কোষ কলা অনবরত ভাঙ্গা-গড়ার কাজ করে যাচ্ছে এবং শরীর গড়ার ক্ষেত্রে আমিষ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে চলেছে। দেহের কয়েকটি হরমোন ও অন্তত একটি খাদ্যপ্রাণ, এনজাইম ও এন্টিবডি আমিষ থেকে অথবা আমিষ জাতীয় খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়। আমিষ থেকে সৃষ্ট অ্যামিনো এসিড হতে DNA ও RNA তৈরী হয়। প্রয়োজনের সময় আমিষ ক্যালোরীরও যোগান দিয়ে থাকে।

খাদ্যে দীর্ঘদিন ধরে আমিষের অভাব থাকলে গা ফোলা রোগ হয়। শিশুরাই এ রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। প্রথমত এ রোগে ওজন হ্রাস পেতে থাকে এবং শারিরীক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। রক্তে আমিষের পরিমাণ কম হলে শরীরে পানি জমে যে কারণে শরীর শীর্ণ হলেও সহজে বোঝা যায় না।

---

[১৪০] সম্পাদনা পরিষদ *খাদ্য, পুষ্টি রোগব্যাধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

হাত পায়ের গিট সহ সম্পূর্ণ শরীর ফুলে যেতে পারে। চেহারা ফ্যাকাসে হতে পারে, মুখমন্ডল গোলাকৃতি হতে পারে, রক্তে হিমগ্লোবিন কমে যেতে পারে। খাদ্য হজমের জন্য পাচক রস ঠিকমত নিঃসৃত হয় না। খাদ্য ঠিকমত হজম হয়না। পাতলা পায়খানা বা অজির্ণ মল বের হতে পারে। ফলে ক্ষুধামন্দা, চুল বিবর্ণ ও দূর্বল, শরীরের উপর বাদামী কাল বর্ণের দাগ বা ক্ষত এবং যকৃতের স্ফীতি হতে পারে। গর্ভবতী মহিলাদের বমি এবং পায়ের পাতা ফোলা রোগ হতে পারে। এ পর্যায়ে রোগীর চেহারা বিষর্ণ, আচরণে বিরক্তি প্রকাশ পায় এবং শিশুদের মস্তিস্ক ঠিকমত বিকাশ লাভ করে না। অ্যামিনো অ্যাসিড নামক যৌগিকের অসংখ্য অণূ যুক্ত হয়ে আমিষে রূপান্তরিত হয়। আমিষের এক একটি অনুতে অসংখ্য অ্যামিনো অ্যাসিডের অণূ থাকে। এর মধে ৯টি অতিপ্রয়োজনীয়, এগুলো হচ্ছে আইসোলিউসিন, লিউসিন, লাইসিন, মিথিওনিন, ফিনাইলঅ্যালানিন, থ্রিওনিন, ট্রিপটোফেন, ভ্যানিল ও হিস্টিডিন। হিস্টিডিন শুধুমাত্র শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয়। মানব শরীর এসব এমিনো এসিড তৈরী করতে পারে না। খাদ্যের মাধ্যমেই এগুলোর প্রয়োজন মেটাতে হয়।

আমিষের অণুতে কোন ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিড কি পরিমাণে আছে তার উপর পুষ্টিমূল্য নির্ভর করে। অতি প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের অনুপাত মানব দেহের যত কাছাকাছি তার পুষ্টিমূল্য তত বেশি। আমিষের জৈবিক মান দিয়ে পুষ্টিমূল্য প্রকাশ করা হয়। একটি আমিষ থেকে বিশোষিত নাইট্রোজেনের শতকরা যত ভাগ দেহ কাজে লাগাতে পারে তাই এর জৈবিক মান। যে আমিষের জৈবিক মান ১০০ তাকে আদর্শ আমিষ বলে। প্রকৃতিগতভাবে প্রাণীজ আমিষের জৈবিক মান উদ্ভিজ আমিষের তুলনায় অনেক বেশি। যে আমিষের জৈবিক মান যত সেই আমিষের ততভাগ দেহ কাজে লাগাতে পারে। বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত আমিষ একত্রে খেলে তাদের গড় জৈবিক মান বৃদ্ধি পায়। কয়েকটি খাদ্যে আমিষের জৈবিক মান নিচের ছকে দেখানো হলো।[১৪১]

খাদ্যেও নাম	আমিষের জৈবিক মান
চাল	৬৮
গম	৬৩
মিঠা আলু	৬৭
আলু	৭৩
মানুষের দুধ	৯৬
গরুর দুধ	৮৯
মাছ	৯০
এাংস	৮১
ডিম	৯৫
ছোলা ডাল	৭৫
মশুর ডাল	৫৫
মুগ ডাল	৬০
সয়াবিন	৭৬

[১৪১] ড. মোঃ মামুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য

মানুষ জীবনে দৈনন্দিন যত রকম কাজ করে তার সব গুলোর জন্য শক্তির প্রয়োজন। ঘুমন্ত অবস্থায়ও মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে নানা রকম কাজের জন্য শক্তি ব্যয় হয়। দেহের শক্তির বৃহৎ অংশের যোগান দেওয়াই মূলত শ্বেতসারের প্রধান কাজ। এই শক্তির অভাবে বাড়ন্ত ছেলে-মেয়েদের দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, শরীর দূর্বল হয়ে যায়, মানসিক অবসাদ ঘটে। ঘাটতি দীর্ঘস্থায়ী হলে জীবনীশক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। মানব দেহে স্নেহের অক্সিডাইজেশন এর জন্য শ্বেতসারের প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রধানত চাল, গম, ভূট্টা, বারলি, আলু , মিষ্টি আলু, কচু, গুড়, আখের চিনি, বিটের চিনি, মধু ইত্যাদি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য[১৪২] পাওয়া যায়। দেহে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য শ্বেতসার ছোট ছোট এককে ভাঙ্গার মাধ্যমে খাদ্য নালীতে শোষিত হয়ে রক্তে যেয়ে শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে।

স্নেহ জাতীয় খাদ্য

স্নেহের প্রধান কাজ শরীরে কর্মশক্তি বা ক্যালোরি সরবরাহ করা। ক্যালসিয়াম আত্তীকরণে স্নেহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও স্নেহ নিম্নোক্ত কাজগুলো করে থাকে।

১. কোন কোন স্নেহ ভিটামিন A ও E তৈরীর উৎস হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও স্নেহ জাতীয় পদার্থে দ্রবনীয় ৪টি খাদ্যপ্রাণ A, D, E ও K কে হজম ও আত্তীকরণে সহায়তা করে।

২. স্নেহ জাতীয় পদার্থ শরীরের অভ্যন্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে যেমন- হৃৎপিন্ড, যকৃত, ফুসফুস, কিডনী ইত্যাদিকে স্বস্থানে স্থিত থাকতে সাহায্য করে এবং কুসনের মত তৈরী করে আঘাত লাগার হাত থেকে রক্ষা করে।

৩. দেহে কয়েকটি হরমোন তৈরীতে স্নেহের ভূমিকা রয়েছে।

৪. ত্বকের নিচে স্নেহ জাতীয় পদার্থের একটি স্তর যা শরীর থেকে তাপ ক্ষয় সীমিত করে রাখে।

৫. স্নেহ খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি করে যা পরোক্ষভাবে পুষ্টির সহায়ক।

৬. স্নেহ জাতীয় পদার্থ অতিপ্রয়োজনীয় স্নেহের উৎস, যার অভাবে বাড়ন্ত শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

৭. স্নেহ দেহে চর্বি আকারে তাপ শক্তি সঞ্চিত রাখে।

আমাদের দেশে স্নেহের প্রধান প্রধান উৎস হচ্ছে-

ক) উদ্ভিজ : সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, সয়াবিন তেল ইত্যাদি।

খ) প্রাণীজ : মাছ (ইলিশ, পুটি, চিতল, বাছা, কাতল, বোয়াল) মাংস, ঘি, মাখন, দুধ, ডিমের কুসুম ইত্যাদি।

স্নেহ জাতীয় পদার্থ শুধুমাত্র ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে ছোট ছোট এককে ভেঙ্গে যায়। মুখ এবং পাকস্থলীতে এর কোন পরিবর্তন হয় না। এই একক গুলোই রক্তের সাথে মিশে যায় এবং চামড়ার নীচে ও আন্যান্য জায়গায় চর্বি হিসেবে জমা হয়। এই চর্বি ক্রমাগতভাবে ফ্যাটি এসিডে রূপান্তরিত হয়। আবার নতুন ফ্যাটি এসিড নতুন চর্বিতে রূপান্তর হয়। ফ্যাটি অ্যাসিড দুই ধরনের। সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত।

---

[১৪২] সম্পাদনা পরিষদ *খাদ্য, পুষ্টি রোগব্যাধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড

সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড রক্তে কোলেস্টেরল বৃদ্ধি করে। ফলে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ সহ বিভিন্ন রোগ হতে পারে। চর্বিযুক্ত মাংস, ঘি, মাখন, ডিম, দুধ ইত্যাদির মধ্যে এবং উদ্ভিদজাতের মধ্যে শুধুমাত্র নারিকেল তেল ফ্যাটি এসিডের উৎস। এগুলো খাওয়ার পূর্বে শরীর ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড

নারিকেল তেল ছাড়া অন্যান্য সমস্ত উদ্ভিদজাত তেল অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের উৎস। ইহা দেহের প্রয়োজন পূরণ করে কিন্তু রক্তের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল বৃদ্ধি ঘটায় না। চর্বি, শক্তির একটি ভাল উৎস। চর্বি ভিটামিন A, D, E ও K এগুলোকে ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে রক্তের মধ্যে নিয়ে আসে। ইহা শরীরকে গরম রাখতে সাহায্য করে। শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালোরির মধ্যে ২০% চর্বি থেকে আসা উত্তম।

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন জাতীয় খাদ্য

খাদ্যপ্রাণ হচ্ছে এমন কয়েকটি জৈব যৌগিক, যেগুলো দেহের পুষ্টির জন্য অপরিহার্য কিন্তু অল্প পরিমাণ প্রয়োজন। প্রতিটি খাদ্যপ্রাণেরই দেহের সার্বিক বিপাক প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা রয়েছে। খাদ্য দ্রব্যের হজম, পুষ্টি উপাদানের সদ্ব্যবহার ও আত্তীকরণ, দেহের বৃদ্ধি সাধন, রোগ থেকে দেহকে রক্ষা করা, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও গ্রন্থির নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনে সহায়তা দান ইত্যাদি কাজ বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণ করে থাকে। খাদ্যপ্রাণের ঘাটতির কারণে বিপাক প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয় এবং ঘাটতি দীর্ঘ দিনের হলে সুনির্দিষ্ট লক্ষণ বা রোগ সৃষ্টি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুও হতে পারে। খাদ্যপ্রাণের সঠিক সংখ্যা এখনও সঠিক ভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে দেহের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিসাধনের জন্য খাদ্যপ্রাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

খাদ্যপ্রাণ সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।[১৪৩] যথা-

ক) স্নেহে দ্রবণীয় খাদ্যপ্রাণ।

খ) পানিতে দ্রবণীয় খাদ্যপ্রাণ।

বিভিন্নি প্রকার খাদ্যপ্রাণের মধ্যে A, D, E ও K স্নেহে দ্রবীভূত হয় এবং খাদ্রপ্রাণ গুলো পানিতে দ্রবীভূত হয়।

ভিটামিন 'এ' জাতীয় খাদ্য

পুষ্টিতে ভিটামিন 'এ' এর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টি বজায় রাখা, দেহের উন্মুক্ত এবং আবরণী কোষকলাকে রক্ষা করা, পাকস্থলীতে হজমী রস নিঃসরণ বৃদ্ধি, হাড় শক্ত করা, দাঁত গঠনে সহায়তা করা, বিভিন্ন প্রকার টিস্যু গঠনে এবং দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। গর্ভাবস্থায় ভিটামিন 'এ'- এর ঘাটতি হলে গর্ভপাত হতে পারে। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ফলে সংক্রামক রোগে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

---

[১৪৩] ড. মোঃ মামুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ভিটামিন 'এ' কেবল প্রাণিজ খাদ্যে সরাসরি পাওয়া যায়। এছাড়া উদ্ভিজ খাদ্যে 'ক্যারোটিরয়েড' নামে কয়েকটি হলুদ রঞ্জক থাকে যেগুলো খাওয়ার পর পরিপাকতন্ত্রে ভিটামিন 'এ' তে রূপান্তরিত হয়। আমাদের দেশে প্রধানত মাছ, মাংস, দুধ, ডিম থেকে তৈরী খাবার সমূহে; সবুজ ও হলুদ শাক সবজি যেমন লালশাক, ডাটাশাক, পালংশাক, কচুশাক, মূলা, গাজর, মিষ্টিআলু, মিষ্টিকুমড়া, আম, কাঁঠাল, পাঁকাকলা, পেঁয়ারা, তরমুজ আনারস প্রভৃতিতে ভিটামিন এ পাওয়া যায়। যে ফল বা শাকের রং যত গাঢ় তাতে ভিটামিন 'এ' এর পরিমাণ তত বেশি।

ভিটামিন 'ডি' জাতীয় খাদ্য

ভিটামিন 'ডি' খাদ্যে থাকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের বিশেষণ এবং রক্ত ও হাড়ের ক্যালসিয়াম এর বিনিময় ঘটানো এর প্রধান কাজ।

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস হাড় ও দাঁত তৈরীর প্রধান কাঁচামাল। অতএব ভিটামিন 'ডি' হাড় ও দাঁত গঠনে বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। এর অভাবে শিশুদের হাড় সুগঠিত হয় না, নরম ও দূর্বল হয় এবং বড় হাড়গুলো বেঁকে যায়। বিভিন্ন হাড়ের সংযোগস্থল ফোলে। হাড়ের আকৃতি অস্বাভাবিক হয়, শিশুদের রিকেট রোগ হয়। কেবল প্রাণীজ খাদ্যের মধ্যে যেগুলোতে ভিটামিন 'এ' আছে সেগুলোতে ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়। যেমন- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ[১৪৪] ইত্যাদি থেকে তৈরী খাবার । এছাড়া সূর্যের আলো থেকে শরীর নিজেই ভিটামিন 'ডি' তৈরী করতে পারে।

ভিটামিন 'ই' জাতীয় খাদ্য

ভিটামিন 'ই' কেবলমাত্র কৃত্রিম উপায়ে তৈরী হয়। এর অভাবে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে ধারণা করা হয়। ভিটামিন 'ই' বার্ধক্য লাভের প্রক্রিয়া বিলম্বিত করে, হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা ঠিক রাখে, ত্বক কে সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করে, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিকা রাখে। সুষম খাবারে এর কোন অভাব হয় না। রোগ ছাড়াও মাঝে মাঝে এটি গ্রহণ করলে উপকার হয়।

ভিটামিন 'কে' জাতীয় খাদ্য

বিভিন্ন খাদ্যে খাদ্যপ্রাণ 'কে' থাকে। ফলে সাধারণত এর ঘাটতি হয় না। রক্ত জমাট বাঁধার জন্য যকৃত ভিটামিন 'কে' এর মাধ্যমে 'প্রোথ্রম্বিন' নামক পদার্থ তৈরী করে। দেহে এর অভাব হলে কাঁটা স্থান থেকে রক্তপাত বন্ধ হয়না। অস্ত্র পাচারের প্রাক্কালে কোন কোন রোগীকে ভিটামিন 'কে' ইনজেকশন অথবা খাওয়ানোর মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো হয়। রক্ত দ্রুত জমাট বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার জন্য এই ভিটামিনের প্রয়োজন খুবই বেশী।

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন জাতীয় খাদ্য

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন এর সংখ্যা ১৩টিরও উপরে। এর মধ্যে 'সি' গ্রুপের একটি এবং বাকিগুলো 'বি' গ্রুপের ভিটামিন। যাকে একত্রে ভিটামিন 'বি কমপ্লেক্স' বলা হয়। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো খাদ্যে সাধারণত একত্রে থাকে। এরা একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে বিভিন্ন পুষ্টিগত ভূমিকা পালন

[১৪৪] সম্পাদনা পরিষদ *খাদ্য, পুষ্টি রোগব্যাধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

করে। যথা- আমিষ, শ্বেতসার ও স্নেহের বিপাক; স্নায়ুতন্ত্র সচল রাখা; চুল, ত্বক, চোখ, মুখ ও যকৃত ইত্যাদি সুস্থ রাখার কাজ করে থাকে। মানসিক চাপ ও রোগের সময় এদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। রক্তস্বল্পতা, নিদ্রাহীনতা, মানসিক অবসাদ, ক্ষুধামন্দা, সহজে উত্তেজিত হওয়া ইত্যাদি বি গ্রুপের খাদ্যপ্রাণ ঘাটতির কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ। বি গ্রুপের অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন সমূহ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

রাইবোফ্লাভিন জাতীয় খাদ্য

ইহা শরীরের বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। এর অভাবে ঠোঁটের কোণে ঘা ও ফাটল, ঠোঁট ও জিহ্বা ফুলে যাওয়া, চক্ষু লাল হওয়া, জিহ্বা তিক্ততা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হয়। রাইবোফ্লাভিন এর উৎস সাধারণত বিভিন্ন প্রাণীর কলিজা, দুধ, ডিমের কুসুম, ডাল, সিম, চা পাতা ইত্যাদি। সাধারণত রান্নার সময় ইহা নষ্ট হয় না।

থায়ামিন জাতীয় খাদ্য

শরীরে থায়ামিনের প্রধান কাজ শ্বেতসারের বিপাক, বিশেষ ভাবে গ্লুকোজ থেকে শক্তি উৎপাদন করা। অন্যান্য কাজের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্র ও হৃদযন্ত্রকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখা। শরীরে থায়ামিনের ঘাটতি হলে স্মৃতি শক্তি হ্রাস, সহজে উত্তেজিত হওয়া, খেয়ালিপনা সহ বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুবিক অসুবিধা দেখা দেয়। থায়ামিনের অভাব দীর্ঘ দিনের হলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়ে হৃদপিন্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে রোগী মারা যেতে পারে। মায়ের দেহে থায়ামিনের অভাব হলে স্তন্য পানরত শিশুও আক্রান্ত হতে পারে। এর অভাবে বেরি বেরি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ক্ষুধামন্দা ও তার সাথে বমি ভাব, শরীরে পানি জমে ফুলে উঠা, হাত পা বিশেষভাবে পায়ের পাতা অবশ হওয়া, পায়ে ব্যাথা, রক্ত চলাচল ঠিকমত না হওয়া, ক্লান্তিবোধ মানসিক অবষন্নতা ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। থায়ামিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে শস্য জাতীয় খাদ্য যেমন, চাল, গম, ভুট্টা ইত্যাদি। এছাড়া কিছু কিছু ডাল জাতীয় খাবার (যেমন - বাদাম) ও সিদ্ধ আলুতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। শস্য জাতীয় খাবারের খোসার নিচের পাতলা আবরণ এই ভিটামিনের প্রাপ্তি স্থান। ঢেঁকি ছাটা চালে এই ভিটামিন থাকে, কলে ছাটা চালে এই ভিটামিন থাকে না। আমাদের দেশে প্রচলিত ধান ছাটায়ের পূর্বে ধান ভাপানোর কারণে এই ভিটামিন চালের সাথে লেগে থাকতে সাহায্য করে। এই ভিটামিন পানিতে গুলিয়ে যায়। তাই ভাত রান্নার সময় ভাতের মাড়ের সাথে এই ভিটামিন গুলিয়ে যায়। ভাতের মাড় ফেলে দিলে এই ভিটামিন বের হয়ে যায়।

নায়াসিন জাতীয় খাদ্য

খাদ্য থেকে ক্যালোরি উৎপাদনের জন্য নায়াসিনের প্রয়োজন। শরীর ট্রিপটোফ্যান নামক অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে নায়াসিন তৈরী করতে পারে। এছাড়া ঢেঁকি ছাটা চাল, ভুট্টা, মটরসুটি, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যও নায়াসিনের ভালো উৎস। নায়াসিনের অভাবে 'পেলেগ্রা' বা 'ত্বক ক্ষত' রোগ হয়। প্রথম অবস্থায় জিহ্বা লাল হয়ে ফুলে উঠে এবং চামাড়ার উন্মুক্ত অংশে লাল ফুসকুড়ি বের হয়। ক্রমেই এগুলো খসখসে ও কালচে দাগে পরিণত হয়। সেখানে চুলকানি ও জ্বালাপোড়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সাথে ডায়রিয়া ও ক্ষুধামন্দা থাকে। নায়াসিনের অভাব বেশি হলে স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। মাথা ঘোরায়, নিদ্রাহীনতা, ভয়, বিস্মৃতি, বিষাদগ্রস্থতা, রাগ-প্রবণতা ইত্যাদি আকারে দেখা দিতে পারে।

বায়োটিন জাতীয় খাদ্য

বায়োটিন ভিটামিন 'বি'-গ্রুপের একটি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন। এটি সাধারণত প্রাণীর যকৃত এবং ডিমের কুসুমে পাওয়া যায়।

ফলিক অ্যাসিড জাতীয় খাদ্য

ফলিক অ্যাসিড 'বি'-গ্রুপের অন্যান্য ভিটামিনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি রক্তের কোষ সমূহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিভাজন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন।[১৪৫] এর অভাবে রক্ত স্বল্পতা সৃষ্টি হয় এবং রক্তের লোহিত কণিকা আকারে অস্বাভাবিক বড় হয়ে যায়। গর্ভাবস্থায় এর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কোষের বিভাজন ও প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথেও ফলিক অ্যাসিডের যোগ সূত্র রয়েছে।

ভিটামিন 'বি'$_{১২}$ জাতীয় খাদ্য

এটি রক্ত কণিকার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিভাজন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে। কোন কোন ব্যক্তির শরীর খাদ্য থেকে এটি গ্রহণ করতে পারে না। এটি কেবল প্রাণীজ খাদ্যে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর কলিজা, মাছ, গোশতো, ডিম, দুধ, পনীর[১৪৬] ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। ভিটামিন **'বি'$_{১২}$** ফলিক অ্যাসিডের বিশেষণে সহায়তা করে। নিরামিষ-ভোজীদের খাদ্যে এর ঘাটতি থাকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

প্যান্টোথনিক অ্যাসিড জাতীয় খাদ্য

'বি'-গ্রুপের আরেকটি প্রয়োজনীয় ভিটামিনের নাম প্যান্টোথনিক অ্যাসিড। ইহা কোন কোন সময় পুষ্টি সমস্যার সৃষ্টি করে। এর অভাবে মাথাধরা, অনিদ্রা, হাত-পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরা, বমিভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। এটি শ্বেতসার ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যের বিপাকের সাথে জড়িত।[১৪৭] এর দৈনিক চহিদা ৫-১০ মিলিগ্রাম।

পাইরোডক্সিন 'বি'$_{৬}$ জাতীয় খাদ্য

পাইরোডক্সিন 'বি'$_{৬}$ অ্যামিনো অ্যাসিডের বিপাকের সাথে জড়িত। এই ভিটামিনের ঘাটতি বেশি হলে শিশুদের খিঁচুনি রোগ হতে পারে।

---

[১৪৫] ড. মোঃ মামুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[১৪৬] সম্পাদনা পরিষদ *খাদ্য, পুষ্টি রোগব্যাধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

[১৪৭] ড. মোঃ মামুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

ভিটামিন 'সি' জাতীয় খাদ্য

মানবদেহে ভিটামিন 'সি' এর একাধিক পুষ্টিগত ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন টিস্যুর কোষসমূহকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে রাখার জন্য 'কোলাজেন' নামক যে আঠাঁলো বস্তুর প্রয়োজন হয় তা উৎপাদিত হতে ভিটামিন 'সি' অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন 'সি' এর অভাবে ক্ষুদ্র রক্তনালীর দেওয়াল আলগা হয়ে পড়ে এবং এতে সৃষ্ট ফাঁক দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়। ভিটামিন 'সি' এর অভাবে 'স্কার্ভি' রোগ হয়। দাঁতের মাড়ি ফোলা, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, নীলাভ বর্ণ ধারণ করা এবং সেখান থেকে রক্ত পড়া এর প্রধান লক্ষণ। চামড়ার নীচে রক্তক্ষরণ হয়ে কালো দাগের মতো দেখা যায়। ঘাটতি বেশী এবং দীর্ঘ স্থায়ী হলে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে রোগী মারা যায়। ক্যালসিয়াম ও লৌহ শরীরে গ্রহণের জন্য ভিটামিন 'সি' বিশেষ সহায়তা প্রদান করে থাকে। ভিটামিন 'সি' এর অভাবে শরীরে অবসাদ ও ধড়ফড়ানী অনুভূত হয়, রক্ত-স্বল্পতা দেখা দেয় এবং দাঁত সুদৃঢ় হয় না। ঘাটতির মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে হাত পায়ের গিঁট ফুলে যায় ও ব্যাথা হয়। শিশুদের পা অবশ হয়ে যেতে পারে। শোয়া অবস্থায় শিশুদের হাত-পা স্পর্শ করলে কেঁদে উঠে, পা পেটের উপর গুটিয়ে রেখে কুন্ডলী পাঁকিয়ে শুয়ে থাকে। ভিটামিন 'সি' সর্দি ও সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ভিটামিন 'সি' এর অভাবে দেহের ক্ষত স্থান সহজে শুকায় না।

সাধারণত আমাদের দেশে আমলকি, পেয়ারা, জলপাই, লেবু, টমেটো, কাঁচামরিচ, কালোজাম, পেঁপে, আম, লিচু, আমড়া, বাঁধাকপি, পুঁদিনা পাতা, ধনে পাতা ইত্যাদি পাওয়া যায়। এ ছাড়া সবুজ-পাতাবহুল শাক-সব্জিতে ভিটামিন 'সি' আছে।

অজৈব পুষ্টি উপাদান

আমাদের শরীরে অনেক ধরণের অজৈব পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন। এসব পুষ্টি উপাদানের কিছু কিছু বিভিন্ন টিস্যু তৈরীর কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাকিগুলো একাকি বা অন্য মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের সাথে মিলিত ভাবে শরীর গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। সাধারণত দেহে যেগুলোর অভাব ঘটে এবং যেগুলোকে খাদ্যের মাধ্যমে সরবরাহ করা উচিত।

সাধারণ খাবারে অজৈব পুষ্টি উপাদান সমূহের অধিকাংশই প্রয়োজনীয় পরিমাণে থাকে। তবে তিনটি উপাদান, যথা- লৌহ, আয়োডিন ও ক্যালসিয়ামের ঘাটতিতে আমাদের দেশে প্রায়ই পুষ্টি সমস্যার সৃষ্টি হয়। এগুলো সর্ম্পকে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

লৌহ জাতীয় খাদ্য

রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরীতে লৌহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমিষ ও লৌহের সমন্বয়ে হিমোগ্লোবিন তৈরী হয়। হিমোগ্লোবিন রক্তের অতি প্রয়োজনীয় একটি অংশ। ফুসফুস থেকে অক্সিজেন নিয়ে দেহের প্রতিটি কোষে পৌছে দেওয়া এবং প্রত্যেক কোষ থেকে কার্বনডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য বিপাকজাত দ্রব্য ফুসফুসে নিয়ে আসা হিমোগ্লোবিনের প্রধান কাজ। বয়সের সাথে শরীরের রক্তের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি লৌহের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। দেহে লৌহের অভাব ঘটলে হিমোগ্লোবিন ও লাল রক্তকণিকা উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে চেহারা ও নখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, মানসিক অবসাদ, ঔদাসিন্যতা, সহজে ক্লান্ত হওয়া, সার্বক্ষণিক শারীরিক দূর্বলতা, অল্প পরিশ্রমে

Dhaka University Institutional Repository

শ্বাস ভারী হওয়া বুক ধড়ফড়ানি বৃদ্ধি পায়। শিশুদের স্বভাব সুলভ চঞ্চলতা কমে যায়, ক্ষুধা কমে যায় এবং সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। ঘাটতি বেশী ও দীর্ঘস্থায়ী হলে দৈহিক ও মানসিক দক্ষতা কমে যায়। লৌহের ঘাটতির কারণে খাদ্য থেকে ভিটামিন 'এ' এর সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত হয়। লৌহের ঘাটতি সকল উন্নয়নশীল দেশে একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা।

আমাদের দেশে সাধারণত বিভিন্ন প্রাণীর কলিজা, মাংশ, ডাল, সীমের বিচি, মটরসুঁটি, গম, সবুজ শাক, লাল শাক, টিউবওয়েলের পানি ইত্যাদি লৌহের ভাল উৎস।[১৪৮] খাদ্যে লৌহ প্রচুর পরিমাণে থাকলেও শরীর তা সর্বাবস্থায় গ্রহণ করতে পারেনা। খাদ্যে লৌহের সর্বাধিক ১৫% বিশোষিত হয়। খাদ্যে ভিটামিন 'সি' থাকলে বিশোষণ ভাল হয়। মহিলাদের ঋতুস্রাবের সময় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লৌহ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, ফলে এই সময় অতিরিক্ত লৌহ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করতে হবে।

ক্যালসিয়াম জাতীয় খাদ্য

একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহে প্রায় ১২০০ গ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। এর মধ্যে ৯৯ ভাগই হাড় এবং দাঁতে।[১৪৯] বাকি এক ভাগ রক্ত ও কোষের তরল অংশে পাওয়া যায়। ক্যালসিয়াম হাড় ও দাঁত তৈরীর প্রধান উপকরণ। সাধারণত দুধ ও দুধজাত দ্রব্য (যেমন ছানা, মাখন) ডিম, ছোট মাছ, হাড়, সবুজ শাক, গুড়, সীমের বিচি, সজিনা, আমড়া প্রভৃতি ক্যালসিয়ামের ভাল উৎস। ক্যালসিয়াম শোষিত হতে ভিটামিন 'ডি' এর বিশেষ প্রয়োজন। খাদ্যের আমিষ ও ক্যালসিয়াম শোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পুষ্টিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের ভূমিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ক্যালসিয়ামের অভাবে যেমন হাড়, দাঁত, রক্ত ইত্যাদি গঠনে সমস্যার সৃষ্টি হয় তেমনি রক্তে ক্যালসিয়ামের আধিক্যের ফলে কিডনী, হৃৎপিন্ড ও মহাধমনী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্যালসিয়াম ক্ষুদ্র ধমনীর গায়ে জমা হয়ে রক্ত চলাচল বিঘ্নিত করে, কিডনীতে পাথর সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা উভয়ই প্রয়োজন।

আয়োডিন জাতীয় খাদ্য

মানুষের গলায় থাইরয়েড নামে একটি হরমোন গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থি থেকে থাইরোক্সিন ও ট্রাই-আয়োড থাইরোনিন নামে দুটি হরমোন উৎপাদিত হয়। আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থির মাধ্যমে থাইরোক্সিন ও ট্রাই আয়োড থাইরোনিন নামের এই দুটি হরমোন তৈরী করে।[১৫০] খাদ্যে আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড রোগ হয়। আয়োডিনের অভাবে অন্যান্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন- মগজ গঠন, হাড় ও চুলের বৃদ্ধি, গর্ভস্থ সন্তানের স্বাভাবিক বিকাশে আয়োডিনের প্রভাব রয়েছে। গর্ভবতী মহিলাদের আয়োডিনের অভাবে গর্ভপাত, মৃতসন্তান প্রসব, সন্তানের জন্মগত বিভিন্ন ত্রুটি, (যেমন- বিকলাঙ্গতা, হাবা, বামন, বাকশক্তিহীন, মানসিক ভারসাম্যহীনতা) সন্তান প্রসবোত্তর মৃত্যু ঝুঁকি ইত্যাদি হতে পারে। শিশুদেরও আয়োডিনের অভাবে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে যেমন- থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা হ্রাস, গলগন্ড, অসম্পূর্ণ মানসিক বিকাশ, দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস, ইত্যাদি সমস্যা হতে

---

[১৪৮] সম্পাদনা পরিষদ *খাদ্য, পুষ্টি রোগব্যাধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[১৪৯] ড. মোঃ মামুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

[১৫০] সম্পাদনা পরিষদ *খাদ্য, পুষ্টি রোগব্যাধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

পারে।[১৫১] অয়োডিনের অভাব দূর করার জন্য বর্তমানে খাবার লবণের সঙ্গে অয়োডিন মিশিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া পানি এবং সমুদ্রের বিভিন্ন মাছ আয়োডিনের ভাল উৎস।

দানাশস্য জাতীয় খাদ্য

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য হিসাবে দানাশস্য ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর কোটি কোটি লোক দানাশস্যের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। দানাশস্যের মধ্যে প্রধান হচ্ছে চাউল, গম, ভুট্টা, জব, যই, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি শস্য এবং এই সব দিয়ে তৈরী রুটি, মুড়ি, চিড়া, পিঠা, পাওরুটিও এজাতীয় খাদ্যের অর্ন্তগত। এই সবের খাদ্যগুণ মোটামুটি প্রায় একই রকম। বাংলাদেশে চাউল ও গম প্রধান খাদ্য। চাউল উচ্চ শ্বেতসার যুক্ত খাদ্য। এতে রয়েছে ৭৫-৮০% শ্বেতসার, ৫-১৫% আমিষ ও যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন 'বি', সামান্য চর্বি, লৌহ ও ক্যালসিয়াম আছে। আতপ-চাউলের চেয়ে সিদ্ধ-চাউলে 'বি' ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, লৌহ, আমিষ ও চর্বির পরিমাণ কিছু বেশি। রান্নার পর ভাতের মাড় ফেলে দিলে প্রায় ৩০% থায়ামিন সহ খাদ্যের অন্যান্য উপাদানও কিছু কিছু নষ্ট হয়ে যায়। দানাশস্যের শ্বেতসার ৯৫ ভাগই সহজ পাচ্য স্টার্চ। এজন্য এগুলো বেশি পরিমাণে খেলেও তেমন কোন অসুবিধা হয় না। প্রতি ১০০ গ্রাম দানা শস্য থেকে ৩০০ - ৩৫০ কিলোক্যালোরি কর্ম শক্তি পাওয়া যায়। গমেও শ্বেতসারের পরিমাণ চাউলের প্রায় সমান, তবে চাউলের চেয়ে গমে প্রটিনের পরিমাণ বেশী। এছাড়াও এতে সামান্য ফ্যাট এবং প্রচুর লৌহ ও ফসফরাস আছে। কিন্তু ক্যালসিয়ামের পরিমাণ খুবই অল্প। ১০০ গ্রাম গমে প্রায় ৩০০-৩৫০ কিলোক্যালোরি কর্ম শক্তি পাওয়া যায়।[১৫২]

কন্দাল জাতীয় খাদ্য

কিছু সংখ্যক ফসল উদ্ভিদের কান্ড ও মূলে স্টার্চ জমা হওয়ার কারণে স্ফীত হয় এ গুলোকে কন্দাল ফসল বা স্ফীত অংশকে 'কন্দ' বলে। গোল আলু, মিষ্টি আলু, মেটে আলু, শিমুল আলু, কচুমুখি প্রধান কয়েকটি কন্দাল ফসল। বিভিন্ন ধরণের আলু যদিও এক জাতীয় সব্জি নয় তবুও সাধারণভাবে এগুলোর প্রত্যেকটি আঁশবিহীন, শর্করা বহুল, অথচ তুলনামূলক ভাবে সস্তা ও অতি উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত খাদ্য। বিভিন্ন ধরণ অনুযায়ী কন্দে ১৫-৪০% শ্বেতসার, ১-২% আমিষ এবং প্রতি ১০০ গ্রামে ৮০-১২৫ কিলোক্যালোরি খাদ্য শক্তি পাওয়া যায়।[১৫৩] এসব সব্জিতে পটাসিয়াম বেশি লৌহ ও থায়ামিনের পরিমানও উল্লেখ যোগ্য, কিন্তু অন্যান্য খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন 'বি' খুবই কম। অন্যান্য সব্জির তুলনায় এসব সব্জি বেশি ক্যালোরি যুক্ত হওয়ায় চাহিদার প্রধান অংশ এই সব খাদ্য থেকে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

---

[১৫১] ড. মোঃ মামুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

[১৫২] সম্পাদনা পরিষদ *খাদ্য, পুষ্টি রোগব্যাধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[১৫৩] ড. মোঃ মামুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানুষের খাদ্যদ্রব্য : একটি পর্যালোচনা

মানুষের সুন্দর জীবন-যাপনের সব দিক-নির্দেশনা দেওয়া আছে ইসলামে। মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা অধিক জীবনোপকরণ দান করেন এবং তিনিই তা সংকুচিত করে দেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত।[১৫৪] মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। ইবাদত করতে হলে শরীর সুস্থ রাখা প্রয়োজন। তাই শরীর সুস্থ রাখার জন্য খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্যটা হওয়া চাই হালাল এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ। আর খাবার খেতে হবে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায়। খাবার হওয়া চায় সুষম। শরীরের ক্ষয় পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, শক্তির জোগান ইত্যাদি চাহিদা মেটাতে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় যেসব খাবারে সব খাদ্য উপাদান প্রয়োজনীয় পরিমাণ থাকে তাকে সুষম খাবার বলে। এরূপ খাবারে থাকবে আমিষ, শর্করা, ভিটামিন, তেল, খনিজ লবণ ও পানি। এই খাদ্য থেকে আমরা পাব ইবাদত করার শক্তি ও কাজ করার শক্তি। খাদ্য গ্রহণের ফলে শরীর হবে সুগঠিত। থাকবে সুরক্ষিত, সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান। আমরা শর্করার চাহিদা মেটাই ভাত, রুটি, ইত্যাদি খেয়ে । আমিষের যোগান পাই গোশতো, মাছ, ডিম, ডাল, দুধ ইত্যাদি থেকে। ফলমূল, শাক-সব্জি থেকে পাই ভিটামিন ও খনিজ লবণের জোগান। শর্করা, তেল ও চর্বি থেকে আসে শক্তি। অমিষের কাজ আমাদের শরীর সুগঠিত করা, সুন্দর ও সুরক্ষিত রাখা। ভিটামিন ও খনিজ লবণ শরীর সুরক্ষিত রাখতে ও রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে সহায়তা করে। আর পানি ছাড়াতো চলেই না। শরীরের সব কাজেই পানির প্রয়োজন। মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কিসে আমাদের ভাল আর কিসে আমাদের মন্দ, তার শ্রেষ্ঠ নির্ধারক তিনিই। তিনিই আমাদের মন্দটা পরিহার করতে আর ভালটা আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। কী খেলে আমাদের ভাল হবে, কী খেলে আমাদের মন্দ হবে, কী খাওয়া উচিত হবে, কী খাওয়া উচিত হবে না, মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তা উল্লেখ করেছেন।

কুরআনের বর্ণনায় সুষম খাবার

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আমাদের জন্য এক উত্তম গাইড বুক। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে দেওয়া আছে সুষম খাবারের ইঙ্গিত।

মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার প্রতি লক্ষ্য রেখে খাওয়া-দাওয়ার দ্রব্যাদিকে হালাল ও হারাম এই দুই ভাগে বিভক্ত করে বিশ্ব মানবতার প্রতি মহান আল্লাহ এক বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চই হালাল ও পবিত্র খাবার আমাদের জন্য উত্তম। কোন্ খাবার হালাল, আর কোন্টা হারাম এবং এর বিধি-বিধান সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন, তোমরা দুনিয়ায় হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও

---

[১৫৪] إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (আল-কুরআন ১৭ : ৩০)

Dhaka University Institutional Repository

(হালাল এবং হারামের ব্যাপারে) শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।[১৫৫]

হে মুমিনরা! আমার দেওয়া পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর।[১৫৬]

আর তিনি পশুপাল সৃষ্টি করেছেন। তাতে রয়েছে শীত নিবারক, উপকার ও কিছু আহার্য।[১৫৭]

অতপর খাও আল্লাহর নামে জবাইকৃত বস্তু।[১৫৮]

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যপায় হয়ে পড়ে এবং না-ফরমানী এবং সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।[১৫৯]

তোমাদের জন্য মৃত প্রণীর মাংস, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে নিহত প্রাণীর মাংস, শ্বাসরোধ করে হত্যা করা প্রাণীর মাংস, কঠিন আঘাতে নিহত প্রাণীর মাংস, উচ্চ স্থান থেকে পতিত হয়ে আঘাত প্রাপ্ত প্রাণীর মাংস, শিঙ্গের আঘাতে (পশু লড়াই) নিহত প্রাণীর মাংস, যে প্রাণীর কিছু অংশ কোন হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলেছে অবশ্য যদি তাকে যবেহ করার সুযোগ পাওয়া না যায় বা কোন বেদীর উপর বলি দেওয়া হয়েছে এবং যে মাংস তীর ছুড়ে (পাশা খেলার ন্যায়) ভাগ্য নির্ণয় করা হয়েছে, এসবই হারাম, এ সবই ফাসেকি কাজ।[১৬০]

মানুষের সুষম খাবারের বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, দু'টি সমুদ্র সমান হয় না- একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশত (মৎস্য) আহার কর এবং পরিধানের ব্যবহার্য অলঙ্কারাদি আহরণ কর। তুমি তাতে তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[১৬১]

তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা গোশতো (মৎস্য) খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। তুমি তাতে জলযান সমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার কর।[১৬২]

হযরত অয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিষ্টি ও মধু খেতে ভাল বাসতেন।[১৬৩]

---

[১৫৫] يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (আল-কুরআন ২ : ১৬৮)

[১৫৬] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (আল-কুরআন ২ : ১৭২)

[১৫৭] وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . (আল-কুরআন ১৬ : ৫)

[১৫৮] وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (আল-কুরআন ৬ : ১১৮)

[১৫৯] إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন ২ : ১৭৩)

[১৬০] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আল-কুরআন ৫ : ৩)

[১৬১] وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (আল-কুরআন ৩৫ : ১২)

[১৬২] وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (আল- কুরআন ১৬ : ১৪)

Dhaka University Institutional Repository

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সল্লাম কখনও কোন খাদ্যের নিন্দা করতেন না। তাঁর যা ভাল লাগতো তা তিনি খেতেন এবং যা ভাল লাগতো না তা তিনি খেতেন না।[১৬৪]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সল্লাম বলেছেন, দু'জনের খাদ্য তিন জনের জন্য যথেষ্ট; আবার তিন জনের খাদ্য চার জনের জন্য যথেষ্ট।[১৬৫]

মিকদাম ইবনে মা'দি কারাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে পেট ভরে, ততটুকু খাদ্য কোন ব্যক্তির তোলা দূষনীয় নয়। যতটুকু আহার করলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা যায়, ততটুকু খাদ্যই কোন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। এরপরও যদি কোন ব্যক্তির উপর তার নফস (প্রবৃত্তি) জয়যুক্ত হয় তবে সে তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।[১৬৬]

ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঢেকুর দিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের ঢেকুর প্রতিরোধ কর; কারণ যারা পার্থিব জীবনে ভুরিভোজ করবে, তারাই কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত হবে।[১৬৭]

হযরত সায়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সল্লাম বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রাতে সাতটি আজওয়াহ খেজুর খায় সেদিন কোন বিষ বা যাদু টোনা তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।[১৬৮]

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক দরজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সল্লামকে ভোজে দওয়াত করলে আমি তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম। আটার রুটি, গোসত ও লাউ মিশ্রিত রান্না করা সালুন (তরকারি) আনা হলো। আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাত্রের চতুর্দিকে লাউ তালাশ করতে দেখলাম। এরপর থেকে আমি লাউকে পছন্দ করতাম।[১৬৯]

আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (শশা জাতীয়) এর সাথে টাটকা খেজুর মিশিয়ে খেতে দেখেছি।[১৭০]

সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, ব্যাঙের ছাতা মান্না এর শ্রেণীভূক্ত যা আল্লাহ তা'আলা নবী মুসা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। এর রস চোখের জন্য শিফা।[১৭১]

---

[১৬৩] ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (র), প্রাগুক্ত, আহার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ মিষ্টি দ্রব্য সম্পর্কে, হাদীস নং ৩৩২৩

[১৬৪] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, আহার সংক্রান্ত অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ২১২৫, হাদীস নং ৫০১৫

[১৬৫] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২১১৫, হাদীস নং ৫০০০

[১৬৬] ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ কম খাওয়া এবং পেট ভরে না খাওয়া, হাদীস নং ৩৩৪৯

[১৬৭] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৩৫০

[১৬৮] ইমাম মুসলিম (র), প্রাগুক্ত, খন্ড ৭ম, ৩৭তম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২৫, হাদীস নং ৫১৭৮

[১৬৯] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ১৯, হাদীস নং ৫১৬৪

[১৭০] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ২১, হাদীস নং ৫১৬৯

[১৭১] ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম, হাদীস নং ৩৪৫৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পান করার সময় তিনবার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেন। এবং তিনি বলতেন এটা অত্যান্ত তৃষ্ণা নিবারক, স্বাস্থ্যসম্মত ও উপকারী। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তিন নিশ্বাসেই পানি পান করে থাকি।[১৭২]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একটি বালতিতে করে জমজমের পানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আনলে তিনি দাঁড়িয়ে তা পান করলেন।[১৭৩]

হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন রাত্রে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে বা সন্ধ্যা হয়, তোমাদের সন্তনদেরকে গৃহে আবদ্ধ করে রেখ। কেননা তখন শয়তান চতুর্দিকে বিচরণ করে। যখন রাত্রের এক ঘন্টা অতীত হয়ে যায়, তাদেরকে ছেড়ে দাও, দরজা বন্ধ করে রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো, কেননা শয়তান বন্ধ দ্বার খুলেনা। তোমাদের পানীয় পাত্র ঢেকে রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো। তোমাদের আলোসমূহ নিভিয়ে রাখ।[১৭৪]

হযরত যাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি আবূ উবায়দার অধীনে খাবাত সৈন্য দলের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। তখন আনবার নামক একটি মৃত মাছ সমুদ্রে ভেসে উঠল। এর মত বৃহদাকার মাছ আমি আর দেখিনি। আমরা অর্ধ মাস পর্যন্ত এটা খেলাম। আবূ উবায়দা একখন্ড এতবড় হাড় নিল যে এর তলদেশ দিয়ে একজন আরোহী যেতে পারে।[১৭৫]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, মাররে জাহরানে (মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানের নাম) আমি একটি খরগোশের পাছে পাছে ছুটে একে ধরে আবূ তালহা (রাঃ) এর নিকট আনলাম। তিনি একে জবেহ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এর পিছনের মাংস ও রানের মাংস পাঠালে তিনি তা গ্রহণ করলেন।[১৭৬]

আবূ সায়লাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালিত গাধার মাংশ হারাম করেছেন।[১৭৭]

আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মুরগীর মাংস খেতে দেখেছি।[১৭৮]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অত্যধিক খাদ্য খেত। সে ইসলাম গ্রহণ করার পর কম খেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উল্লেখ করা হলে, তিনি বললেন, মুমিন এক নাড়ীতে খায়, আর কাফের সাত নাড়ীতে খায়।[১৭৯]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা বলেন, আমরা (আনাসকে) জিজ্ঞাসা করলাম দাঁড়িয়ে কিছু খাওয়াটা কেমন? তিনি বললেন, সেটাতো আরো অধিক মন্দ, অধিক বিভৎস।[১৮০]

---

[১৭২] ইমাম মুসলিম (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ১৪, হাদীস নং ৫১২৬

[১৭৩] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ১৩, হাদীস নং ৫১২০

[১৭৪] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ১১, হাদীস নং ৫০৯০

[১৭৫] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, যবাহ করা, শিকার করা এবং শিকারের সময় বিসমিল্লাহ বলা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ২১৭৮, হাদীস নং ৫০৯৭

[১৭৬] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২১৯৮, হাদীস নং ৫১৩৭

[১৭৭] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২১৯৪, হাদীস নং ৫১২৯

[১৭৮] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২১৯২, হাদীস নং ৫১২১

[১৭৯] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২১১৬, হাদীস নং ৫০০৫

Dhaka University Institutional Repository

হযরত যাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, কি তরকারী আছে? তাঁরা বললেন যে আমাদের নিকট সিরকা ব্যতীত অন্য কিছু নেই। তিনি তা আনতে বললেন। তিনি তদ্বারা খেতে লাগলেন এবং বললেন, 'সিরকা উত্তম তরকারী' 'সিরকা উত্তম তরকারী'।[১৮১]

মুনজির বিনতে কায়েস আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) কে সাথে করে আমার নিকট আসলেন। আমাদের পাঁকা খেজুর তখন লটকানো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁর সাথে খাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) কে বললেন, হে আলী থাম, তুমি সদ্য আরোগ্য লাভ করেছ। উম্মূল মুনজের (রাঃ) বললেন, তারপর আমি বীট ও বার্লি তাঁদের জন্য আনলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আলী ইহা খাও। কেননা এটা তোমার জন্য উত্তম।[১৮২]

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আলিয়ার (মদিনায় মসজিদ কুবার নিকটে একটি জায়গা) খেজুর রোগ নিরাময়কারী ও প্রাতঃকালীন প্রতিষেধক।[১৮৩]

মায়মূনা (রাঃ) হতে বর্ণিত। একটি ইঁদুর ঘি এর মধ্যে পড়ে মরে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ইঁদুরটি এবং এর আশ-পাশের অংশ ফেলে দাও। এর পর তা খাও। সুফিয়ান (র) এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মা'মার এই হাদীসটি যুহুরী, সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, আবূ হুরায়রা (রাঃ) এর সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, আমি যুহুরী (র) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মায়মূনা (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, আমি যুহুরী থেকে উক্ত সনদে এই হাদীসটি একাধিকবার শুনেছি।[১৮৪]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাবার ছিল রুটির ছারিদ (এক প্রকার সুপ) এবং হাইছের ছারিদ (সুষ্ক আঙ্গুর ও ময়দা দ্বারা তৈরী খাদ্য) ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেছেন হাদীসটি দূর্বল।[১৮৫]

উম্মে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা (রাঃ) নিকট আসেন আমি তখন তাঁর নিকট ছিলাম। তিনি বললেন, সকালের নাস্তা কিছু আছে কি? তিনি বললেন আমাদের কাছে রুটি, খেজুর ও সির্‌কা আছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন সির্‌কা উত্তম তরকারি। হে আল্লাহ্! সির্‌কায় বরকত দাও। কারণ তা

---

[১৮০] ইমাম মুসলিম (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ১৩, হাদীস নং ৫১১৪

[১৮১] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ২৮, হাদীস নং ৫১৯১

[১৮২] ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ : বেছে-গুছে চলা, হাদীস নং ৩৪৪২

[১৮৩] ইমাম মুসলিম (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ২৫, হাদীস নং ৫১৮০

[১৮৪] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২০০, হাদীস নং ৫১৪০

[১৮৫] ইমাম আবূ দাউদ (র), প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, খাদ্যদ্রব্য অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪৭৪, ছারিদ খাওয়া সম্পর্কে, হাদীস নং ৩৭৪১

Dhaka University Institutional Repository

আমার পূর্বেকার নবীগণের তরকারী ছিল। যে গৃহে সির্‌কা আছে, তার কখনও তরকারীর অভাব হয়নি।[১৮৬]

উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যয়তুনের তেল দিয়ে রুটি খাও এবং তা দেহে মাখ, কারণ তা কল্যাণকর বৃক্ষ হতে উৎপন্ন।[১৮৭]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যয়তুনের তেল খাও এবং তা দেহে মাখ, কারণ তা বরকতপূর্ণ।[১৮৮]

ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে তিনি এক টুকরা যবের রুটি নিয়ে তার উপর খেজুর রেখে বলেন, এটি হল এর (রুটির) তরকারী।[১৮৯]

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম টাটকা খেজুর দিয়ে তরমুজ খেতেন এবং বলতেন আমি এর গরমকে ওর ঠান্ডা দ্বারা এবং ওর ঠান্ড কে এর গরম দ্বারা বিদূরিত করি।[১৯০]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন পানীয় দ্রব্য পান করে তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে শ্বাস না ফেলে। শ্বাস নেয়ার প্রয়োজন হলে মুখ থেকে পাত্রটি সরিয়ে নেবে, অতপর আরো পান করতে চাইলে পাত্র থেকে পান করবে।[১৯১]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানির পাত্রের ভিতর নিঃশ্বাস ফেলতে বা তাতে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।[১৯২]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তিন শ্বাসে পানি পান করতেন। আনাস (রাঃ) এও ধারণা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন শ্বাসে পানি পান করতেন।[১৯৩]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি পান করলেন এবং পানের সময় দুইবার শ্বাস নিলেন।[১৯৪]

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রাতের আহার পরিত্যাগ করবে না, যদিও তা এক মুঠ খেজুরও হয়, (সামান্য আহারই হোক না কেন)। কারণ রাতের আহার পরিত্যাগ মানুষকে বৃদ্ধ করে দেয়।[১৯৫]

আবূ সাঈদ ও জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কাম'আত হল মান্না (বনূ ইসরাঈলের জন্য প্রেরিত আসমানি খাবার) এর শ্রেণীভূক্ত এবং

---

[১৮৬] ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ সির্‌কা দিয়ে রুটি খওয়া, হাদীস নং ৩৩১৮

[১৮৭] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ যায়তুন তেল সম্পর্কে, হাদীস নং ৩৩১৯

[১৮৮] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৩২০

[১৮৯] ইমাম আবূ দাউদ (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৪৯২ খেজুর সম্পর্কে, হাদীস নং ৩৭৮৭

[১৯০] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৪৯৫ দু'ধরনের খাদ্য একত্রে মিশিয়ে খাওয়া সম্পর্কে, হাদীস নং ৩৭৯৩

[১৯১] ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (র), প্রাগুক্ত, পানিয় ও পানপাত্র অধ্যায়, অনুচ্ছেদ পানির পাত্রে শ্বাস ফেলা নিষেধ, হাদীস নং ৩৪২৭

[১৯২] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ পানিয় দ্রব্যে ফুঁ দেয়া নিষেধ, হাদীস নং ৩৪২৯

[১৯৩] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ তিন শ্বাসে পানিয় দ্রব্য পান করা, হাদীস নং ৩৪১৬

[১৯৪] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৪১৭

[১৯৫] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ রাতের আহার পরিত্যাগ, হাদীস নং ৩৩৫৫

Dhaka University Institutional Repository

এর রস চোখের জন্য শিফা। আর আজওয়া খেজুর হল জান্নাতের সাথে সম্পর্কিত। তাহলো উম্মাদ রোগের ঔষধ।[১৯৬]

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের তরকারির সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান হলো লবণ।[১৯৭]

আমরা যে সব খাদ্যদ্রব্য আহার করি বা চিকিসকগণ যে সব প্রতিষেধক ও ঔষধপত্র হিসেবে ব্যবহার করেন, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সেই সব ঔষধ, বনজ লতা-পাতা, গাছ-গাছড়া, ফলমূল, খনিজ ও প্রণীজ সম্মন্ধে নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হলো।

আনার : মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামত সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা আর-রাহ্মানে বলেছেন, তথায় আছে ফলমূল, খর্জুর বৃক্ষ ও আনার।[১৯৮]

ত্বীন : পবিত্র কুরআনের ত্রিশতম পারার একটি সূরার নামই সূরা ত্বীন। এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা 'ত্বীন' এর কসম করেছেন। অর্থাৎ একটা প্রমাণ ও দলীল হিসেবে এর উল্লেখ করেছেন।
মহান আল্লাহ বলেছেন, শপথ 'ত্বীন' ও যায়তুনের।[১৯৯]

আঙ্গুর : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আবাসায় কতিপয় নিয়ামত পূর্ণ ফলমূল ও শস্য-এর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,
অতঃপর আমি তাতে উৎপন্ন করেছি শস্যদানা, আঙ্গুরের থোকা ও বিভিন্ন রকমের শাকসব্জি, যায়তুন ও খেজুর সহ বিভিন্ন ধরনের ফলমূল, শ্যামল ঘন বাগান, রয়েছে ফলমূল ও ঘাস, তোমাদের এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে।[২০০]
আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা নাহল এ বলেন, এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন ফসল, যায়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।[২০১]
আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলে বলেন, তারা বলে অথবা আপনার জন্যে খেজুরের অথবা আঙ্গুরের একটি বাগান হবে, অতপর আপনি তার মধ্যে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন।[২০২]
উপরোক্ত আলোচনা ছাড়াও পবিত্র কুরআনের অন্যান্য সূরাতেও আঙ্গুরের আলোচনা করা হয়েছে।

---

[১৯৬] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ কাম'আত ও আজওয়া খেজুর, হাদীস নং ৩৪৫৩
[১৯৭] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ লবণ সম্পর্কে, হাদীস নং ৩৩১৫
[১৯৮] فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ আল-কুরআন, ৫৫ : ৬৮
[১৯৯] وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (আল-কুরআন ৯৫ : ১)
[২০০] فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا- وَعِنَبًا وَقَضْبًا- وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا- وَحَدَائِقَ غُلْبًا- وَفَاكِهَةً وَأَبًّا- مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (আল-কুরআন ৮০ : ২৭-৩২)
[২০১] يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (আল-কুরআন ১৬ : ১১)
[২০২] أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا (আল-কুরআন ১৭ : ৯১)

Dhaka University Institutional Repository

যানজাবিল (শুকনা আদা) : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা দাহরে বলেন, তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'যানজাবিল' মিশ্রিত পানপাত্র।[২০৩]

সালসাবীল : এ হচ্ছে জান্নাতের এক অমীয় ঝর্ণা যার নাম 'সালসাবীল'।[২০৪]

যাইতুন : পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'যাইতুনের' তেলের কথা উল্লেখ রয়েছে। সূরা ত্বীনে আল্লাহ তা'আলা 'ত্বীন' ও 'যাইতুনের' কসম করে বলেছেন, কসম 'ত্বীন' ও 'যাইতুনের'।[২০৫]
আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেছেন, মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমি তাদের জন্য উৎপন্ন করেছি যায়তুন ও খর্জুর।[২০৬]

উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যয়তুনের তেল দিয়ে রুটি খাও এবং তা দেহে মাখ, কারণ তা কল্যাণকর বৃক্ষ হতে উৎপন্ন।[২০৭]
আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যয়তুনের তেল খাও এবং তা দেহে মাখ, কারণ তা বরকতপূর্ণ।[২০৮]
যাইতুনের তেল নাশপতি ও খাঁটি ঘি অপেক্ষা উত্তম।[২০৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পছন্দনীয় খাদ্য দ্রব্য

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাউকে আহার করান, তখন সে যেন বলে, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি অয়ার যুকনা খায়রাম মিনহু। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ খাদ্যে বরকত এবং এর চেয়েও উত্তম রিযিক দান করুন। আল্লাহ্ যাকে দুধ পান করান সে যেন বলে, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু। হে আল্লাহ! এই দুধে আমাদের বরকত দান করুন এবং এর চেয়েও বাড়িয়ে দিন। কারণ আমি জানি না যে এমন কোন জিনিস আছে কিনা যা যুগপৎভাবে আহার ও পানীয় উভয়ের জন্য যথেষ্ট।[২১০]
নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে এমন কোন রোগ-ব্যাধি পাঠান নি যার ঔষধ প্রেরণ করেন নি। আর গাভীর দুধের মধ্যে প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক রয়েছে।[২১১]

---

[২০৩] وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا (আল-কুরআন ৭৬ : ১৭)
[২০৪] عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (আল-কুরআন ৭৬ : ১৮)
[২০৫] وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (আল-কুরআন ৯৫ : ১)
[২০৬] وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (আল-কুরআন ৮০ : ২৯)
[২০৭] ইমাম ইব্ন মাজাহ (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ যায়তুন তেল সম্পর্কে, হাদীস নং ৩৩১৯
[২০৮] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৩২০
[২০৯] প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুয্ যমান, *তিব্বে নববী (স)*, হক লাইব্রেরী, বাইতুল মুকাররম, ঢাকা: মার্চ ২০০২ খ্রি. পৃ.১৯৩
[২১০] ইমাম ইব্ন মাজাহ (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ দুধ, হাদীস নং ৩৩২২
[২১১] প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাজা খেজুর এবং শশা একত্রে খেতে দেখেছি।[২১২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাওয়ার এই পদ্ধতি কতই না স্বাস্থ্য সম্মত। কাঁচা হোক বা শুকনা হোক খেজুর তার নিজস্ব সর্ব প্রকার উপকারের সঙ্গে সঙ্গে গরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টাটকা খেজুর দিয়ে তরমুজ খেতেন এবং বলতেন আমি এর গরমকে ওর ঠান্ডা দ্বারা এবং ওর ঠান্ডাকে এর গরম দ্বারা বিদূরিত করি।[২১৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবূ তালীব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাজা খেজুর কাঁকুড়ের সাথে মিশিয়ে খেতে দেখেছি।[২১৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পছন্দনীয় খাদ্যের মধ্যে গোশত সর্বদা তালিকার শীর্ষস্থান লাভ করেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোশত খুবই পছন্দ করতেন এবং খুবই প্রশংসা করতেন।

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, দুনিয়া এবং জান্নাতবাসীদের প্রধান খাদ্য গোশত।[২১৫]

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখনই গোশত খাওয়ার জন্য আহবান করা হয়েছে তখনই তিনি তাতে সাড়া দিয়েছেন আর যখনই গোশত হাদিয়া দেয়া হয়েছে তিনি তা কবুল করেছেন।[২১৬]

উপরোক্ত হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগতভাবে খাদ্য হিসেবে গোশত পছন্দ করতেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পছন্দনীয় খাদ্যের উপকারীতা ছিল সুস্পষ্ট। চিকিৎসক, হেকিম এবং পুষ্টিবিজ্ঞনীগণ একমত যে গোশতের মধ্যে প্রচুর পরিমানে জীবনী শক্তি রয়েছে। অন্য কোন বস্তুর মধ্যে সম্ভবত গোশতের মত এত শক্তিবর্ধক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মজবুতকারী শক্তি নাই।

আমর ইবনে উমাইয়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (পাকানো) বকরীর কাঁধের গোশত নিজ হাতে খেতে দেখেছেন। সালাতের জন্য তাঁকে আহবান করা হলে তিনি তা এবং যে চাকু দিয়ে কাঁটছিলেন সেটিও রেখে দেন। এরপর উঠে গিয়ে সালাত আদায় করেন। অথচ তিনি নতুন করে অজু করেন নি।[২১৭]

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে কিছু গোশত নিয়ে আসা হল। তাঁকে রানের গোশত দেয়া হল এবং এটাই তিনি পছন্দ করতেন। তিনি তা চুষে খেলেন।[২১৮]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গোশত খুবই প্রিয় ছিল। তিনি সামনের উরুর

---

[২১২] ইমাম মুসলিম (র), প্রাগুক্ত, খন্ড ৭ম, ৩৭তম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২১, হাদীস নং ৫০৬৯

[২১৩] ইমাম আবূ দাউদ (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৪৯৫ দু'ধরনের খাদ্য একত্রে মিশিয়ে খাওয়া সম্পর্কে, হাদীস নং ৩৭৯৩

[২১৪] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২১৪৩, হাদীস নং ৫০৪৬

[২১৫] ইমাম ইব্ন মাজাহ্, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ গোশত সম্পর্কে, হাদীস নং ৩৩০৫

[২১৬] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৩০৬

[২১৭] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২১২৪, হাদীস নং ৫০১৪

[২১৮] ইমাম ইব্ন মাজাহ্, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ কোন অঙ্গের গোশত অপেক্ষাকৃত উত্তম, হাদীস নং ৩৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

গোশত, ঘাড়, রান, কাঁধ এবং পিঠের ভুনা গোশত পছন্দ করতেন। তবে সামনের উরুর গোশত এবং ঘাড়ের গোশত বেশী পছন্দ করতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের মধ্যে পাখির মাংস খুবই পছন্দ করতেন। সর্ব প্রকার চিকিৎসা মাধ্যমেই (ইউনানী, আয়ুরবেদী, এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক) পাখির মাংসকে উন্নত খাবার হিসাবে পরিগণিত করা হয়েছে। মানসিক রোগের ক্ষেত্রে মোরগ এবং পাখীর গোশত অন্য সকল প্রকার গোশতের চেয়ে বেশী উপকারী। প্যারালাইসিস গ্রস্ত রোগীকে জংলী কবুতরের গোশত ঔষধ হিসাবে খাওয়ালে খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। আর মহান আল্লাহ তা'আলা পাখির মাংসকে জান্নাতবাসীর খাবার হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে বলেন, আর তাদের পছন্দ মত ফলমূল নিয়ে এবং রুচিমত পাখির মাংস নিয়ে।[২১৯]

'সারীদ' নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লমের বিশেষ প্রিয় খাদ্য ছিল। আবূ মুসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছে। কিন্তু স্ত্রী লোকের মধ্যে ইমরান তনয়া মারইয়াম এবং ফিরাউন পত্নী আসিয়া ব্যতীত অন্য কেউ কামালিয়াত অর্জন করতে পারেনি। স্ত্রী লোকদের মধ্যে আয়িশার মর্যাদাও তেমন খাদ্যের মধ্যে সারীদের মর্যাদা যেমন।[২২০]

উপরের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, 'সারীদ' নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় খাদ্য ছিল। 'সারীদ' রুটি থেকে তৈরী হয় এবং 'হাইস' থেকেও তৈরী হয়। এই রেওয়াতে সারীদের দুইটি অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) রুটি থেকে সারীদ অর্থাৎ রুটির টুকরা তরকারীর ঝোল বা পাতলা ডালের মধ্যে এমন ভাবে ভিজিয়ে রাখা যেন রুটি খুব ভাল করে ভিজে যায় এবং তা চর্বনের প্রয়োজন না হয়। এই খানা নরম হয় এবং দ্রুত হজম হয়।

(২) হাইস থেকে সারীদ অর্থাৎ ছাতুর মধ্যে খেজুর, পনির ও ঘি মিশ্রিত করে সালিদার মত যা তৈরী করা হয়। এ প্রকার খাদ্য তৈরীর উদ্দেশ্য হল খানা নরম হওয়া এবং চিবানোর প্রয়োজন না হওয়া এবং দ্রুত হজম হয়।

এ ছাড়াও ছাতুর তৈরী এক প্রকার সারীদ ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় খাদ্য ছিল। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে ছাতু দ্রুত হজম হয় এবং রোগ নিরাময়ের কাজ করে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তাঁর এক দর্জি গোলামের বাড়িতে গেলাম। সে তাঁর সামনে সারীদের পেয়ালা উপস্থীত করলো এবং নিজের কাজে লিপ্ত হলো। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাউ বেছে নিতে শুরু করলে আমি লাউয়ের টুকরাগুলো বেছে বেছে তাঁর সামনে দিতে লাগলাম এবং এরপর থেকে আমি লাউ পছন্দ করতে শুরু করি।[২২১]

লাউ এক উত্তম তরকারী। খেতে খুবই সুস্বাদু, স্বাস্থ্য সম্মত এবং স্বভাব খুবই ঠান্ডা, দ্রুত হজমকারী রান্না করতেও সুবিধা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী হয়ে হযরত আনাস (রাঃ) যে ভক্তি ও ভালবাসা দেখিয়েছেন এ ধরনের নজির সত্যই বিরল। তাঁরা বিশ্বাস

---

[২১৯] وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ- وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (আল-কুরআন ৫৬ : ২০-২১)

[২২০] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২১২৯, হাদীস নং ৫০২৪

[২২১] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫০২৬

Dhaka University Institutional Repository

করতেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি কাজের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত রয়েছে। তাঁরা এর সুফলও পেতেন। তাঁরা সহজে অসুস্থ্য হতেন না।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রাতের আহার পরিত্যাগ করবে না, যদিও তা এক মুঠ খেজুর ও হয়, (সামান্য আহারই হোক না কেন)। কারণ রাতের আহার পরিত্যাগ মানুষকে বৃদ্ধ করে দেয়।[২২২]

বর্তমান যুগে অনেক লোকই অজ্ঞতার কারণে অভ্যাসগত ভাবে রাত্রে খাবার খায়না। তারা ধারণা করে এতে বদহজমী থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এটা তাদের ভুল ধারণা। তাদের এই অভ্যাস পরিবর্তন করা উচিত। ব্যক্তিগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা কোন সমস্যার কারণে করতে হলে তা ভিন্ন কথা। তা না হলে রাত্রের খাবার যৎসামান্য হলেও খাওয়া উচিত। অনুরূপ ভাবে রাত্রের খাবারের ব্যাপারে এ বিষয়ে ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রের খাবার খেয়েই তৎক্ষণাৎ শুয়েপড়া অথবা ঘুমিয়ে যাওয়াকে নিষেধ করেছেন। যে নবীর গুণাবলী বর্ণনা করে শেষ করা যায়না। সেই সর্বোত্তম মানুষটি হাঁড়ির তলায় লেগে থাকা অবশিষ্ট অংশ আগ্রহ সহকারে, খেতেন।

জবের রুটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈনন্দিন খাদ্য। জবের রুটির সঙ্গে খেজুরের দানা তরকারী হিসাবে ব্যবহার করতেন এবং বড় সন্তুষ্ট চিত্তে বলতেন, এটা হল সালুন, এটা হল সালুন। পক্ষান্তরে তাঁর উম্মতগণের অবস্থা হল, গোশত ছাড়া এক লোকমাও চলে না। ডালে গোশত, চাউলে গোশত, সব্জিতে গোশত, সকালে গোশত, রাত্রে গোশত। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন জীবন যাপন করেছেন যে, কোন এক দিনও দুই বেলা তৃপ্তি সহকারে গোশত রুটি আহার করেন নি।

আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদ্য সম্পর্কে হযরত সাহল ইবনে সা'আদ (রাঃ) থেকে একটা দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীসে তিনি একটা প্রশ্নের উত্তর ও দিয়েছেন। তাঁর নিকট কেউ প্রশ্ন করল, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তোমাদের নিকট চালুনি ছিল কি? তিনি জবাবে বললেন আমাদের নিকট চালুনি ছিল না। অতপর প্রশ্ন করা হল তোমরা জবের আটা কি করতে? তিনি জবাবে বললেন, আমরা তাতে ফুঁক দিতাম যা কিছু ভূসি ইত্যাদি উড়ার থাকত উড়ে যেত, অতঃপর আমরা তাতে পানি ছিটিয়ে গুলে নিতাম, এরপর তা খেতাম।[২২৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈনন্দিন খাদ্য সম্পর্কে আমাদের একটু ভেবে দেখা উচিত। যিনি উভয় জাহানের বাদশা, বিশ্বে শান্তির অগ্রদূত এবং সর্বশেষ নবী, তাঁর খাদ্য কি ধরনের ছিল? মোটা রুটি, সাধারণ তরকারী, জবের আটার রুটি, আর সাথে যদি দু'চারটা শুকনা খেজুর অথবা সামান্য কিছু সিরকা মিলত তবে খুবই আনন্দ চিত্তে খেয়ে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও 'খিওয়ান' (টেবিল জাতীয় উচু স্থানে) এর উপর খাবার রেখে আহার করেননি এবং ছোট ছোট বাটিতেও তিনি আহার করেন নি। আর তাঁর জন্য কখনও পাতলা রুটি তৈরী করা হয়নি।

---

[২২২] ইমাম ইব্ন মাজাহ্, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৩৫৫

[২২৩] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২১২৭, হাদীস নং ৫০১৯

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, আমি কাতাদাহকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে তাঁরা কিসের উপর আহার করতেন? তিনি বললেন, দস্তরখানের উপর।[২২৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারে একটানা দুই মাস ঘরে চুলা জ্বলে নাই। তাঁদের দিনগুলো শুধু এক ঢোক পানি এবং খেজুরের দানা অথবা কখনও প্রতিবেশী আনসারদের পাঠানো দুধে কেটেছে। আবার যখন খাদ্যের ব্যবস্থা হত তখন তিনি এবং তাঁর সাথীগণ না চালা জবের আটার রুটি খেতেন, পর পর একটানা দু'দিন জবের রুটিও মিলতো না এবং একদিন দু'বেলা গোশত ও জুটতো না। এবার চিন্তা করুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবারের মধ্যে কেমন ধৈর্য ছিল। তাঁরা এই যৎসামান্য খাবার খুবই আনন্দ চিত্তে খেয়ে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। এত কম খেয়ে তাঁরা অধৈর্যও হননি আবার অসুস্থও হননি। অপর দিকে বর্তমান যুগে সাধারণ মানুষের খাবারের না আছে অভাব আর না আছে কষ্ট। কিন্তু এর পরেও মানুষের রোগ-ব্যাধির শেষ নেই। কোন খাবার শরীরের জন্য উপকারী? কোন খাবার শরীরের জন্য ক্ষতিকর? কতটুকু পরিমাণ উপকারী? খাবার কোন্ সময়ে খেতে হয়? কিভাবে খেতে হয়? কিভাবে রান্না করলে খাবারের উপকারী গুণাগুণের সুফল বেশী পরিমনে পাওয়া যায়? এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আল-কুরআন ও আল-হাদীসের ভিত্তিক প্রয়োজনীয় জ্ঞান নাই, জ্ঞান অর্জনের কোন আগ্রহও নাই। আমরা শুধু খাই আর খাই। আর খেয়ে খেয়ে শরীরে নানা প্রকার রোগ-ব্যাধি জমাই।

মধু ও স্বাস্থ্য

মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে মৌমাছির নামে (সুরা আল নাহ্‌ল) একটি সূরা নাযিল করেছেন। উক্ত সূরায় মহান আল্লাহ বলেন, আপনার পালনকর্তা মৌমাছিকে আদেশ দিলেন; পাহাড়ে, বৃক্ষে ও উঁচু স্থানে গৃহ (মধুচক্র) নির্মাণ করো। এরপর সর্ব প্রকার ফল থেকে ভক্ষণ করো এবং আপন সৃষ্টিকর্তার উন্মুক্ত পথ সমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রং এর পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নির্দশন রয়েছে।[২২৫]

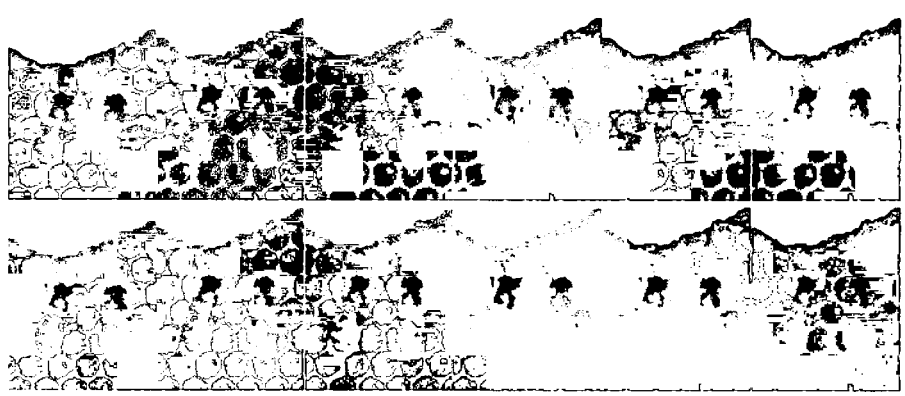

চিত্র : মৌমাছি

---

[২২৪] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫০২১

[২২৫] وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ- ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (আল-কুরআন ১৬ : ৬৮-৬৯)

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সুকৌশলের দিক দিয়ে মৌমাছি সমস্ত পতঙ্গের মধ্যে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। মৌমাছি বিভিন্ন প্রকার ফল ও ফুল থেকে রস চুষে পেটে মধুতে রূপান্তরিত করে। মধু মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের খাদ্য এবং এটি আমাদের জন্যেও সুস্বাদু খাদ্য। মধুকে আল্লাহ তা'আলা 'রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা পত্র' বলে ঘোষণা করেছেন। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রং ভিন্ন হয়। কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাব ও স্বাদ পরিলক্ষিত হয়। একটি ছোট বিষাক্ত প্রাণীর পেট থেকে কেমন সুস্বাদু ও উপাদেয় পানীয় বের হয় অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষাক্ত প্রাণীর দেহে এই রোগ প্রতিষেধক তরল খাদ্য বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির মহিমার নিদর্শন এবং চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তার খোরাক। মধু বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, আবার রোগ ব্যাধির জন্যও ফলপ্রদক ব্যবস্থাপত্র। কবিরাজ ও হেকিমগন সালসা তৈরি করতে এটি ব্যবহার করেন হোমিওপ্যাথিতে মৌমাছি থেকে এপিস মেলিফিকা (Apis Mellifica) নামক ঔষধ তৈরী করা হয়। মধু নিজেও নষ্ট হয় না এবং অন্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণে হেকিম ও কবিরাজগণ একে এলকোহল (Alcohol) এর স্থলে ব্যবহার করেন। মধু বিরোচক এবং মানুষের পেটের দুষিত পদার্থ অপসারক। অনেকেই বিষনাশক হিসেবে এর ব্যবহার করে থাকেন। মধুর নিরাময়শক্তি ব্যাপক ও স্বতন্ত্র। সাহাবীগণ (রাঃ) ফোঁড়া ও চোখের চিকিৎসা মধুর মাধ্যমে করতেন। তাঁরা শরীরে ফোঁড়া বের হলে তাতে মধুর প্রলেপ দিতেন। নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু খুব পছন্দ করতেন। প্রাচীনকাল থেকে আহত স্থান ড্রেসিং করার জন্য মধুর ব্যবহার হতো। গবেষকগণ বলেন যে, মধু ত্বকের ক্ষতের জন্য নিরাময়ী। গবেষকদের ধারণা মৌমাছিরা মধু তৈরি করছে আনুমানিক ১০-২০ মিলিয়ন বছর থেকে। সেই প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যদিও দেহের ক্ষত স্থান ড্রেসিং করার জন্য এবং আরো অন্যান্য অসুখে মধু ব্যবহার করত তবুও বিজ্ঞানীরা বলছেন মধুর নিরাময়ী ক্ষমতা এখনো সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়নি। অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা গত কয়েক বছরে পোড়া, ক্ষত ও আঘাতের চিকিৎসার জন্য বিশুদ্ধ মধু ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। এখন উন্নত দেশের বাজারে মধুজাত এবং মধু থেকে সংগ্রহীত দ্রব্য দেদারসে আসছে।[২২৬]

মধুর এন্টিবায়াটিক কার্যক্রম

আমাশয় রোগ জীবাণু মধুর মধ্যে রাখলে ত্রিশ মিনিটেই মরে যায় এটা ল্যাবরেটরিতে প্রমাণিত। মধুতে রয়েছে পোড়াক্ষত ও ত্বকের দাগ সারাবার নিরাময় ক্ষমতা যা বহু যুগ ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে। মধু এমন একটি এন্টিবায়োটিক যা টিস্যুর উপর কোন ক্ষতি করে না। তাই ব্রণের ক্ষত সারাতে, ত্বকের দাগ দূর করতে এবং ছত্রাক সংক্রামণ নির্মূল করতে মধুর ব্যবহার প্রমাণিত। মধুতে কখনও কোন রোগ জীবাণু জন্ম নিতে পারে না। গৃহস্থালীয় কাজে কিংবা রান্না-বান্নার সময় হাত কেটে বা পুড়ে গেলে সাথে সাথে ঘন মধুর প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। মধুর থেরাপিউটিক কায্যক্রমের জন্য ত্বককে পারিপার্শ্বিক দূষণ থেকে রক্ষা করে। নিউজিল্যান্ডের ওকেতো বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রাণ রসায়নবিদ ডঃ পিটার সি মোলার বলেন, সব মধুই বিভিন্ন মাত্রায় ব্যাকটেরিয়া রোধী তবে দ্রব্যগুণে শত গুণ পর্যন্ত এর তারতম্য ঘটতে পারে। তাজা ক্ষত বা চামড়া

[২২৬] ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

ছিলকে গেলে এবং সংক্রমণ না ঘটে থাকলে যেকোন রকমের মধুই প্রদাহ ও সংক্রমণ রোধে সক্ষম। তবে তিনি গবেষণা করে দেখেছেন লেপটোস্পারমাম গাছ থেকে আহরিত মধুর জীবাণুরোধী গুণাগুণ গুরুতর এবং পোড়া ক্ষত ও আঘাতে বিশেষ কার্যকর। লেপটোস্পারমাম স্পোপারিয়াম নিউজিল্যান্ডের একটি ছোট বুনো গাছ 'ম্যানুকা' বা 'জেলিবুশ' নামেও পরিচিত। ইহা অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলেও জন্মায়। 'ম্যানুকা' মধু স্টাফাইলোকক্কাস জীবাণুর বিরুদ্ধে উপযোগী এবং অনেক অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টান্ট জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে। ম্যানুকা-মধু হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি নামক জীবাণুর বিরুদ্ধেও কার্যকর। এই জীবাণু পাকস্থলীর পেপটিক আলসারের একটি ঘটক ও বটে। জীবাণুরোধী গুণাগুণ ছাড়াও মধু নিরাময় পরিবেশ সুচনা করে যে পরিবেশে ত্বকের ক্ষত দ্রুত শুকিয়ে যায়। এতে অঙ্গহানির এবং বিকৃতির ঝুঁকি কমে। তাছাড়া ত্বক গ্রাফটিংয়ের প্রয়োজনীয়তা কমায়, মৃত কোষ উঠে আসে এবং টিস্যুর পুনঃবাড়ন শুরু হয়। মধু প্রদাহ রোগীর জন্য ব্যাথা ও ফোলা কমায় এবং সংক্রামণ দ্রুত নিরাময় হয়।

মধু কিভাবে কাজ করে

মৌমাছি যখন ফুলের রসের মধুতে এনজাইম যোগ করে তখন তৈরি হয় হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। মধুর জীবাণুরোধী গুণাগুণ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের জন্য হয় বলে ধারণা করা হয়। পুষ্পজাত যৌগ যেমন ফ্ল্যাভোনোয়েডস ও এরোমেটিক এসিড থেকে আসে আরো জীবণুরোধী গুণ। ড. মোলান ম্যানুকা মধুতে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ছাড়াও জীবাণুরোধী আরেকটি উপাদান শনাক্ত করেছেন যার নাম তিনি দিয়েছেন ইউনিক ম্যানুকা ফ্যাকটার (ইউ এম এফ)। দগ্ধ পোড়া চিকিৎসায় মধুর প্রয়োজনীয়তা চিকিৎসাবীদদের আকৃষ্ট করেছে। পঁচিশ জন পোড়া রোগীর দুটো দলের ওপর একটি র‍্যানডমাইজড কন্ট্রোল ষ্টাডি চালিয়ে পোড়াক্ষতে প্রচলিত চিকিৎসা সিলবার সালফাডায়জিন ও মধু এ দুটোর উপযোগিতা তুলনা করা হয়েছে। দেখা গেছে, মধু প্রয়োগে ক্ষত সেরে গেছে দ্রুত, সংক্রামণ নিয়ন্ত্রণ হয়েছে ভালোভাবে, ব্যথাও কম হয়েছে এবং ক্ষতের দাগ থেকেছে কম। ক্ষত গভীর হলে এবং ফোসকা ও পুঁজ হলে মধু ভর্তি টিউব চিপে বের করে অথবা তুলো চামচ দিয়ে বেশ কিছু ক্ষতকে পরিপূর্ণ করে দিতে হয়। মধুজাত দ্রব্যটির ওপর দিয়ে ব্যান্ডেজ করতে হয়। পরিস্কার কিন্তু সংক্রামণ হয়নি এমন ক্ষতের জন্য যেকোনো মধু ব্যবহার করা যায় তবে গভীর দগ্ধ ক্ষতে ম্যানুকা মধু উপযোগী।[২২৭] মৌমাছি একটি পতঙ্গ যা মধু তৈরী করে। স্মরণাতীত কাল থেকে মধু মানুষের কাছে সুপরিচিত। মধু একটি পুষ্টিকর, মিষ্টি ও সুস্বাদু খাদ্য। মধু দু'ধরনের একটি হালকা ও স্বচ্ছ এবং অন্যটি গাঢ় রঙের। ইউনানী চিকিৎসকগণ মধুর রং, স্বাদ ও গন্ধ দেখে মধুর গুণাগুণ বিচার করেন। তারা হালকা রং ও স্বচ্ছ মধুকে ভাল বলে আভহিত করেন। গবেষণায় জানা যায়, অস্বচ্ছ গাঢ় রঙের মধু মানুষের জন্য অধিক উপকারী। কারণ এতে হালকা রঙের মধু চেয়ে বেশী পরিমাণ লোহা, তামা ও ম্যাঙ্গানিজ থাকে। মধুর গন্ধ ও স্বাদ নির্ভর করে মৌমাছির সংগৃহীত মধুর রসের উৎসের উপর। মৌমাছি যদি তামাক গাছ থেকে মধু সংগ্রহ করে তাহলে তার গন্ধ হবে তামাকের মতো। অনুরূপ ভাবে নীমগাছ হতে সংগৃহীত হলে তার গন্ধ ও স্বাদ অনুরূপ হবে। মৌমাছি যে গাছ হতে মধু সংগ্রহ করে তার নামানুসারে ঐ মধুর নামাকরণ করা হয়। রিটা, অ্যারান্ড, ধুতুরা মাদর উদ্ভিদ থেকে মৌমাছি

[২২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

যে মধু সংগ্রহ করে তা বিষাক্ত। এটি কালো অথবা সবুজ রঙের হয়। এজন্য ইউনানী চিকিৎসকগণ সকল কালো ও সবুজ রঙের মধুকে বিষাক্ত মধু হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন।

মধুর বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের রাসায়নিক পরীক্ষা

দু'ভাবে মধুর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা যায়। যথা :

১. গবেষকগণ দেখেছেন যে, ৫০ মি.লি. পানিতে ৩ গ্রাম পটাশিয়াম আয়োডাইড ও ১ গ্রাম আয়োডিনের মিশ্রণ হতে ২-৪ ফোঁটা দ্রবণ সমপরিমাণ পানি ও মধুর সাথে যোগ করে ঝাঁকালে যদি বেগুণী অথবা লাল রং ধারণ করে তবে ঐ মধুতে আখের চিনি আছে বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ মধুর ক্ষেত্রে এই রঙের কোন পরিবর্তন হবে না। উপরোক্ত দ্রবণের পরিবর্তে টিংচার আয়োডিন দ্রবণ ব্যবহার করা যাবে।

২. সম-আয়তন মিথাইলেটেড স্পিরিট ও মধু মিশ্রণ দু-তিন মিনিট ভালভাবে ঝাঁকানোর পর ৫-১০ মিনিট রেখে দিলে বিশুদ্ধ মধু বিকারের তলদেশে জমা হবে। কিন্তু মধু বিশুদ্ধ না হলে ঐ দ্রবণ দুধের মত হবে।

মধুর রাসায়নিক উপাদান

মধুতে আট প্রকার রাসানিক পাদার্থ আছে। মধুর প্রধান উপাদান হলো সুগার বা চিনি। যার ভিতরে লেভিউলোজ ৩৯%, ডেক্সট্রোজ ৩১%, মালটোজ ৯%, গ্লুকোজ ১% ও সুক্রোজ সামান্য পরিমাণে থাকে। এতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজাইম ২% এবং মানব দেহের কোষ, কলা ও অঙ্গ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপাদান থাকে। এই এনজাইমগুলো হলো ডায়াস্টেস, ইনভার্টেস, সেকারেস, ক্যাটালেস, পারঅক্সিডেস, লাইপেস। এনজাইমগুলো বিভিন্ন ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, সালফার, আয়োডিন লবনের সাথে যুক্ত থাকে। কিছু উপকরণে রেডিয়ামের ন্যায় উপাদানও থাকে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর নমুনা পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এতে এ্যালুমিনিয়াম, বোরণ, ক্রোমিয়াম, কপার, লেড, টিন, জিংক, জৈব এসিড, কতিপয় ভিটামিন, প্রোটিন, হরমোন, এসিটাইলকলিন, এন্টিবায়োটিকস, সাইটোষ্ট্যাটিকস ও পানি ছাড়াও অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান আছে। তাছাড়াও ভিটামিন বি-৫, বি-১২, নিয়াসিন, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ই, ভিটামিন-কে, ভিটামিন-এ, প্যান্টথেনিক এসিড ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে।[২২৮]

মধুর ঔষধি গুণাবলী

গ্রীক চিকিৎসাবিদ হিপোক্রীটিস (Hippocrates) বিভিন্ন প্রকার রোগ নিরাময়ে মধু ব্যবহার করতেন। তিনি মধুকে অতিরিক্ত খাদ্য হিসেবে ব্যবাহর করার পরামর্শ দিয়েছেন কারণ মধু খাদ্যমান বৃদ্ধি করে। বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনা, তাঁর রচিত 'আনতাকি ও ইবনে আল-বায়তুর' গ্রন্থে মধুর ঔষধি গুণাগুণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে মধু শরীরের বিভিন্ন প্রকার নিঃসরণ ও নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং উষ্ণতা হ্রাস করে। এটি ক্ষুধা ও স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করে

---

[২২৮] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

এবং শোষক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী গ্যালেন, মধুর ঔষধি গুণাগুণ বর্ণনা করেন এবং এর বিষ বিরোধী ধর্ম আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তার মতে মধু আন্ত্রিক রোগে উপকারী। বিশেষ করে দুর্বল শিশুদের মুখের ভিতর পচনশীল ঘা-এর জন্য এটি খুবই ফলপ্রদ। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আল-রাজী পাথরী নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য ওষুধের সাথে মধু ব্যবাহর করতেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানী আল সামার কান্দি এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে আল নাফিস বিভিন্ন প্রকার মূত্র রোগে মধু ব্যবাহর করতেন।[২২৯]

ইউনানী চিকিৎসাগণ বিভিন্ন রোগে মধু ব্যবহার করেন, যেমন অন্ত্রের রোগ ও পাকস্থলী, অম্লাধিক্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, চোখের রোগ, চোখের পাতায় প্রদাহ, কর্ণিয়ার ক্ষত কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা, মুখের প্রদাহ; পক্ষাঘাত, স্নায়ুরোগ, মুখের পক্ষাঘাত ও মৃগীরোগ; অ্যাথেরোস্কেলেরোসিস, কার্ডিওভাসকুলার রোগ, ত্বকের রোগ, সংক্রামণ জনিত ক্ষত, ত্বকের এলার্জি, উচ্চ রক্তচাপ, রক্ত প্রবাহের অবরুদ্ধতা জনিত হৃদরোগ ইত্যাদি। তাছাড়া মধু নিউমোনিয়া, আমাশয়, সর্দি কাশি, টাইফয়েড ও বিভিন্ন প্রকার জ্বরে উপকারী। আয়ুর্বেদি চিকিৎসা ব্যবস্থায় মধু মেদ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। তাদের দাবী এক বছরের পুরনো মধু দু'মাস ব্যবহার করলে মেদাধিক্যের জন্য খুবই উপকার পাওয়া যায়। ত্রিফলার (আমলকি, হরিতকি, বহেরা) সাথে মধু একত্রে মিশিয়ে চুলে ব্যবহার করলে চুল পড়া বন্ধ হয়। মধু ব্যবহারে মুখের ক্ষত দুর হয়, গলাফুলা আরোগ্য হয় এবং টনসিলের প্রদাহ নিরাময় হয়। মধু এক প্রকার ঔষধ যা পচন নিবারক, কোলেস্টেরল বিরোধী ও ব্যাকটেরিয়া রোধী। আধুনিক ফার্মাকোলজিক্যাল গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মধু হৃদপিন্ডের পেশীর কার্যক্রম বৃদ্ধি করে, শিরা প্রসারণের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে এবং পেশীর কার্যক্রম স্বাভাবিক করে, যা হৃদপিন্ডের রোগ প্রতিরোধ করে। ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ মধু স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের কলা সুদৃঢ় করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন সকালে মধু চেটে খায় তাকে বড় ধরনের কোন মুসিবত (রোগ) আক্রান্ত করবে না।[২৩০]

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা দুই আরোগ্য দানকারী মধু ও কুরআনকে অবশ্যই গ্রহণ করবে।[২৩১]

মধুর পুষ্টিমান ও প্রশান্তিদায়ক গুণ

মধুতে উচ্চ মাত্রার পুষ্টিমান রয়েছ। এক কেজি মধু ১.৬৫ কেজি গোশত অথবা ৭.৫০ কেজি পনির অথবা ৬.৫০ লিটার দুধ অথবা ৫০টি ডিম অথবা ৪০টি কমলালেবুর পুষ্টিমানের সমান। এক কেজি মধুতে ৩২৫০ ক্যালরি শক্তি আছে। মধুতে ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, আয়রণ, পটাসিয়াম, সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় মিনারেল আছে। মধুতে গ্লুকোস ও ফ্রুকটোস নামে দুটি সুগার আছে যা সরাসরি মেটাবলাইজ হয়, ফলে এনার্জি দেয় খুব তাড়াতাড়ি। গ্রীক খেলোয়ারগণ মধু মেশানো

---

[২২৯] প্রাগুক্ত

[২৩০] ইমাম ইব্ন মাজাহ্, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ মধু, হাদীস নং ৩৪৫০

[২৩১] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৪৫২

Dhaka University Institutional Repository

পানীয় পান করতেন। শরীর খারাপ লাগলে এক গ্লাস গরম পানির সাথে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে পান করলে খুব ভাল লাগবে। মিশরের মায়েরা তাদের বাচ্চাদেরকে পানির সাথে মধু মিশিয়ে খাওয়াতেন যাতে তারা সুন্দর ও সুস্থ হয়ে বড় হয়। প্রাচীনকালে গ্রীক সুন্দরীরা তাদের যৌবন ধরে রাখতে মধু খেতেন। যারা অনিদ্রায় ভুগেন তারা রাত্রে শুবার আগে এক চা চামচ মধু এক কাপ গরম দুধে মিশিয়ে খেলে ঘুম আসবে। নিয়মিত মধু খেলে মোটা হবার ভয় নেই। লেবু, মধু ও পানিকে এনারজাইসিং রিফ্রেশিং ড্রিস্ক বলা হয়। প্রচন্ড গরমে এক গ্লাস লেবু মিশ্রিত মধুসহ পানি পান করলে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে।

হজমের জন্য এবং ত্বক ও কেশ চর্চায় মধু

মধু কোষ্টকাঠিন্য দূর করে। মধুতে যে এনজাইম আছে তা হজম ক্ষমতা বাড়ায়। রাত্রে কলা ও মধু মিশিয়ে খেলে কোষ্ঠবধ্যতা ও রক্তহীনতা দূর হবে। চায়ের বদলে এক চা চামচ মধু এক কাপ গরম পানিতে মিশিয়ে দিনে যতবার ইচ্ছে পান করুন এতে পেটে গ্যাস এবং পেপটিক আলসার হবে না। মুখের দাগ দুর করতে মধুর বিকল্প নেই। মধু মুখের ব্রনের মহা ঔষধ। কনুই ও হাটুতে কাল দাগ দুর করার জন্য মধু ও কমলালেবুর খোসা-বাটা এক সাথে মিশিয়ে গোছলের পনেরো মিনিট পূর্বে মালিশ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। মাথার খুসকির জন্য কমলালেবুর রস ও মধু মিশিয়ে চুলে গোড়ায় লাগালে খুসকি চলে যাবে। ভারতের মহিলারা সৌন্দর্য চর্চায় মধু ব্যবহার করে থাকে। যাদের পায়ের পাতা ফাটে তারা রাতে শুবার পূর্বে ফাটা অংশে মধু লাগিয়ে মোজা পরে শুয়ে থাকলে উপকার পাবেন। মধু সারা মুখে লাগিয়ে উপর দিকে মেসাজ করে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললে মুখের লাবন্য ফিরে আসবে।[২৩২]

চিকিৎসা বিজ্ঞানে কালোজিরার গুণাবলী

আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালোজিরার ঔষধি গুণ সম্পর্কে যা বলে গেছেন, বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা ও বিভিন্ন গবেষণায় তা এখন সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে।[২৩৩] অনেক রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় কালোজিরা অত্যন্ত কার্যকর।

আবু হুরায়রাহ (রা:) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কালোজিরায় (সাম) মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে। ইবনে শিহাব বলেন 'সাম' অর্থ হল মৃত্যু। আর কালোজিরা 'শূনীয'-কে বলা হয়।[২৩৪]

বিস্ময়াভিভূত ইউনানী মতের অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণীর সত্যতার স্বাক্ষ্য এভাবে দিয়েছেন যে, কালোজিরা ঠান্ডা জাতীয় ব্যাধি-সর্দি, কফ, কাশি ইত্যাদির জন্য অত্যন্ত উপকারী। পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস) ও কম্পন রোগে কালোজিরার তেল মালিশ করলে আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায়। কালোজিরা যৌন ব্যাধি ও স্নায়ুবিক দুর্বলতায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্দি, কাশি, বুকের ব্যাথা, পাকস্থলীতে বায়ু সঞ্চয় (অম্লপিত্ত)

---

[২৩২] ড. দেওয়ান আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[২৩৩] অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম ও স্বাস্থ্য*, ঐতিহ্য, ঢাকা: ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রি. পৃ. ৬৬

[২৩৪] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৭৮, হাদীস নং ৫২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

শুলবেদনা ও প্রসূতী রোগে অত্যধিক উপকারী। ব্রনের জন্যও উত্তম ঔষধ। এতে শ্লেষ্মা, পুরাতন জ্বর, মূত্রথলির পাথর ও জন্ডিস আরোগ্য করে। তাছাড়া এটা অধিক ঋতু স্রাব, মাত্রাতিরিক্ত প্রস্রাব প্রতিরোধক ও কৃমিনাষক।[২৩৫]

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল কানুন' লিখে যিনি সারা বিশ্বে সুপরিচিত, সেই প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী ইবনে সিনা কালোজিরা সম্পর্কে বলেছেন যে এটি শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং ক্লান্তি দূর করে উদ্যম ফিরিয়ে আনে। কালোজিরায় শতাধিক পুষ্টিকর উপাদান রয়েছে। এতে প্রায় ২১% প্রটিন, ৩৮% শর্করা এবং ৩৫% তেল রয়েছে। এ ছাড়াও এতে রয়েছে ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, জিংক, ভিটামিন 'এ' ভিটামিন 'বি' ও ভিটামিন 'সি'। কালোজিরার তেলে আছে ওমেগা-৩, ওমেগা-৬, ওমেগা-৯, ফ্যটি অ্যাসিড। কালোজিরার তেলের অত্যন্ত উপকারী দুটি উপাদান হচ্ছে নাইজেলোন এবং থাইমোকুইনোন। নাইজেলোন শ্বাস নালির প্রদাহে কার্যকর। এটি শ্বাসনালিকে প্রশস্ত করে। এর আছে এন্টিহিস্টামিন জাতীয় কর্মক্ষমতা, যা এলার্জির লক্ষণ কমায়। থাইমোকুইনোনের আছে প্রদহ ও ব্যাথা কমানোর গুণ। এটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও বটে, যা শরীরে প্রতিনিয়ত উৎপন্ন হওয়া ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিকেল দূর করে। নাইজেলোন এবং থাইমোকুইনোন-এ দুই মিলে শ্বাসতন্ত্রের অনেক অসুখেই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সর্দি, কাশি, ব্রংকাইটিস, হাঁপানি ইত্যাদি অনেক রোগেই কালোজিরা উপকারী। কিছু কালোজিরা একটা পরিস্কার কাপড়ের পুটুলিতে বেধে শুঁকলে নাক বন্ধ ভাব দূর হয়, মাথা ব্যাথা কমে। কালেজিরা হজমে সহায়ক। কৃমিনাশকও বটে। ইহা স্তনে দুধের প্রবাহ ও দুগ্ধ নিঃসরণ বৃদ্ধি করে। বাতের ব্যাথায় কালোজিরা উপকারী। কালোজিরার তেল চর্মরোগের জন্য খুবই উপকারী। গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘদিন কালেজিরা ব্যবহারে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেডিকেল ও বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নালে প্রকাশিত অনেক গবেষণায় কালোজিরার আরো নানা উপকারের তথ্য প্রমাণিত হয়েছে।

হাঁপানির লক্ষণ উপশমে কালোজিরা উপকারী। হাঁপানির প্রতিরোধক হিসেবেও কালোজিরা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি নামের যে জীবাণু পাকস্থলির আলসার, এমনকি ক্যানসারের জন্যও দায়ী, তার বিরুদ্ধে কালেজিরা আধুনিক ট্রিপল থেরাপির প্রায় সমান কার্যকর।কালোজিরার থাইমোকুইনোন ক্যান্সার কোষের বিরুদ্ধে কার্যকর। কালোজিরা ক্যান্সার বিরোধী ঔষধের বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করে।

কালোজিরার থাইমোকুইনোন রক্তে অ্যান্টি অক্সিডেন্ড হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ কালোজিরা শরীরে প্রতিনিয়ত উৎপন্ন হওয়া ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিক্যাল দূর করে। কালোজিরা আছে রক্তচাপ কমানোর গুণ।

গবেষণায় জানা যায় কালোজিরা ইঁদুরের রক্তে ভালো কোলেস্টেরল এইচ ডি এল বৃদ্ধি করে এবং খারাপ কোলেস্টেরল এল ডি এল হ্রাস করে এবং ট্রাইগ্লিসারাইড ও টোটাল কলেস্টেরল কমায়। মানুষের শরীরের রক্তের চর্বির ক্ষেত্রেও কালোজিরার এমন প্রভাব থাকতে পারে।[২৩৬]

---

[২৩৫] প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

[২৩৬] দ্রষ্টব্য, অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম ও স্বাস্থ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের শরীরেও এভাবে খাদ্যনালি থেকে গ্লুকোজ শোষণ কমিয়ে ও শরীরে গ্লুকোজ সহ্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সেই সাথে রক্তের গ্লুকোজ কমিয়ে কালোজিরা ডায়াবেটিস চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণে উপকারী।

অতএব দেখা যাচ্ছে, কালোজিরা সর্দি, কাশি, ব্রংকাইটিস, হাঁপানি, বদহজম, বমি, কৃমি, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, বাতের ব্যাথা ইত্যাদি অনেক রোগেই কার্যকর। মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে। নিত্য নতুন গবেষণায় কালোজিরার আরও অনেক ঔষধি গুনের কথা নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে।

এইচ আইভি প্রতিরোধে গরুর দুধ

গরুর দুধ থেকে তৈরী মাখন মানুষের দেহে এইচ আইভি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে একদল বিজ্ঞানী ধারণা করছেন। মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলেছেন, গরুকে এইচ আইভি প্রোটিন টিকা দিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়। এতে দেখা গেছে, বাচ্চা প্রসবের পর গরুর প্রথম দুধে এন্টিবডির উপস্থিতি রয়েছে, যা সদ্যঃপ্রসুত বাচ্চার এইচ আইভি প্রতিরোধে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মানুষের উপর এর কার্যকারিতা পরিক্ষা করে দেখছেন। মাখন বা দুগ্ধজাত পদার্থে রূপান্তরের আগে এটি সঠিকভাবে কাজ করে কি না, তা-ও পরীক্ষা করেছেন বিজ্ঞানীরা।[২৩৭]

ঔষধ হিসাবে লবণের ব্যবহার

কোন তরকারী লবণ ব্যতীত খাওয়ার উপযুক্ত হয় না। সাধারণত আমরা লবনকে মসলা হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। লবণ খাদ্যের একটা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। লবণ হজম শক্তি ও রুচি বর্ধক, ক্ষুধা দূরকারী ও মন প্রফুল্লকারী। চুকা ঢেকুর এবং পেটের বায়ূ পরিশোধিত করা এর বৈশিষ্ট্য। হজম শক্তির দুর্বলতা, রক্ত দোষণ, যকৃৎ ও প্লীহার দূর্বলতা নিরাময়ে লবণ বিশেষ উপকারী।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের তরকারির সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান হলো লবণ।[২৩৮]

আমাদের প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচ্ছুর বিষক্রিয়া দূর করার জন্য লবণের ব্যবহার করেছেন। এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ঔষধের উপরও নির্ভর করেননি। অথবা শুধু ঝাড় ফুঁক ও দু'আ কালামই যথেষ্ট মনে করে ঔষধ ত্যাগ করেননি। বরং বিষয়ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য আক্রান্ত আঙ্গুলের উপর লবণ পানি ঢাললেন এবং সাথে সাথে আল্লাহর কালাম পাঠ করে আল্লাহর নিকট আশ্রয়ও প্রার্থনা করলেন। অতএব, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ ও দাওয়া দু'টিকেই সমান গুরুত্বের সাথে দেখতেন। কেননা, রোগ আরোগ্যের দু'টি অছিলাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রোগ আরোগ্যের দু'টি

---

[২৩৭] দৈনিক *প্রথম আলো*, ১৮ অক্টোবর ২০১২, পৃ.১৬

[২৩৮] ইমাম ইব্ন মাজাহ (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ লবণ সম্পর্কে, হাদীস নং ৩৩১৫

Dhaka University Institutional Repository

অছিলার একটা হলো বস্তুগত এবং অপরটি হলো রূহানী। সুতরাং কেউ যদি একচ্ছত্র শেফাদানকারী আল্লাহকে ভুলে যেয়ে শুধু মাত্র ঔষধের উপর ভরসা রাখে, তার মত বড় দুর্ভাগা আর কে হতে পারে? অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ রাখে বটে কিন্তু তাঁর সৃষ্ট নিয়ামতকে কাজে না লাগায় সেও ভুলের মধ্যে আছে। সর্দি, কাশি এবং গলার সমস্যায় লবণ পানি গড়গড়া খুবই উপকারী। শরীরের হাড্ডি ভেঙ্গে গেলে বা মচকে গেলে সামান্য উষ্ণ পানিতে লবণ মিশিয়ে আক্রান্ত স্থান ঐ লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখলে অথবা সেখানে পানি ঢাললে বর্ণনাতীত উপকার পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক, অ্যালোপ্যাথিক এবং বায়োকেমিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে লবণ দ্বারা অনেক ঔষধ তৈরী করা হয়। এর মধ্যে বায়োকেমিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যাবহৃত ১২টি ঔষধই মানব দেহের সাদৃশ্যপূর্ণ ১২টি লবণ দ্বারা তৈরী।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলাম ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

'স্বাস্থ্যই সম্পদ' এ প্রবাদটি সকলেই জানে। সর্ব শ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতিকে দেওয়া মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এবং আমানত হচ্ছে স্বাস্থ্য। শরীর-স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে আল্লাহর ইবাদত এবং অন্যান্য কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ঈমানের পরেই স্বাস্থ্যের স্থান। স্বাস্থ্যের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। স্বাস্থ্য ভাল রাখা উচিত। সুতরাং স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম যত্ন নেওয়া উচিত। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমাদের অবশ্যই যত্নবান হতে হবে। সুস্থ থাকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অসুস্থ হলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও নিতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য দিয়েছেন। আল্লাহর দেওয়া আমাদের এই দেহ ও স্বাস্থ্যের দেখভাল আমরা কেমন করেছি, এগুলোর ব্যাবহার আমরা কেমন করেছি, এর জন্য কাল কিয়ামতের দিন আমাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব আমাদের এই দেহ ও স্বাস্থ্যের সঠিক দেখভাল করতে হবে। স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপন ইসলামি জীবন-ধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ইসলামে এরূপ জীবন-ধারার সূচনা হয়েছে। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকর সবকিছুই বিদ্যমান ইসলামী জীবন বিধানে। আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য এবং শরীর-স্বাস্থ্যের সঠিক ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের বিস্তর দিক নির্দেশনা রয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ রাসূলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতে। বস্তুত ইসলামী জীবনাচারণের মধ্যেই নিহিত আছে সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি। অজু, গোসল, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতসহ ইসলামের প্রতিটি বিধানই স্বাস্থ্যকর। এছাড়া মুসলমানের খাওয়া-দাওয়া, সামাজিক আচরণ ইত্যাদি সব কিছুই সুস্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক। অজু, গোসল, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সুস্বাস্থ্যের পূর্বশর্ত। অজু, গোসল, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম। নামাজের পূর্বে অজু করতে হয়। নামাজ জান্নাতের চাবি, আর নামাজের চাবি হলো অজু।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নামাজের আগে অজু করার নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা যখন নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হবে, তখন তোমরা তোমাদের দু'হাত কনুই সহ ধৌত করবে, তারপর মাথা মাছেহ করবে, আর দুই পা গিরা পর্যন্ত ধুবে।[২৩৯]

অজুর ফরজ এগুলো। অজু করার সময় শরীরের এ সমস্ত অঙ্গ ধৌত করা ছাড়াও তিনবার করে হাত ধুতে হয়, কুলি করতে হয়, মুখমন্ডল ধুতে হয়, নাক পরিস্কার করতে হয়, এগুলো অজুর সুন্নাত। অজু যেমন আমাদেরকে আধ্যাত্মিক ভাবে পবিত্র করে, তেমনি এর প্রতিটি ধাপ আমাদের শরীরকে

---

[২৩৯] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (আল-কুরআন ৫ : ৬)

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান রাখতে সহয়তা করে, রোগ-ব্যাধি মুক্ত রাখতে সহয়তা করে। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসলেরও নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কুরআনে। স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের জন্য যে সব নিয়ম মেনে চলা জরুরী, যেগুলো মেনে চললে স্বাস্থ্য সুন্দর থাকে, রোগ ব্যাধি কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলোই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য চর্চা। এগুলোর মধ্যে শারিরীক পরিচ্ছন্নতা, কাপড়-চোপড়ের পরিচ্ছন্নতা, হাত, মুখ, দাঁত, নখ, পা, ইত্যাদির যত্ন, খাওয়া-দাওয়ার সময় সতর্কতা, হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় সতর্কতা, থুথু ফেলায় সাবধানতা, বিশ্রাম, ব্যায়াম, ইত্যাদি। পরিস্কার পচ্ছিন্নতা বা ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চার মাধ্যমে অনেক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। ইসলাম ধর্মে মুসলমানদের সর্বোচ্চ পরিচ্ছন্নতা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নামাজের পূর্বে অজু করতে হয়। অজু কিভাবে করতে হবে, শরীরের কোন কোন অঙ্গ ধুতে হবে। অজু করার সময় শরীরের এসব অঙ্গ ধৌত করা ছাড়াও তিনবার করে হাত ধুতে হয়। কুলি করে মুখ ধুতে হয়, নাক পরিষ্কার করতে হয়। অজু আমাদের শুধু আধ্যাত্মিকভাবেই পবিত্র করে না, এর নিয়মগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে এর প্রতিটি পর্ব আমাদের শরীরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান রাখতে এবং রোগ-ব্যধি মুক্ত রাখতে সহায়তা করে।

মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য তিনি বলেন, (হে রাসূল!) আপনি তাদের বলুন, বল তো দেখি, যদি আল্লাহ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে এনে দেবে? দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে।[২৪০]

যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেস্তাগণকে বললেন, আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সেজদায় নত হয়ে যেয়ো।[২৪১]

অতএব মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মধ্যেই রয়েছে সকল প্রকার অনুগত্যতা ও পবিত্রতা।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিকিৎসা ব্যবস্থা

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ এই গ্রন্থটি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্যই সমভাবে শেফাদানকারী বলে প্রমাণিত। যখনই যে জাতি এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে রক্ষাকবচ বানিয়ে নিয়েছে তখনই সে জাতি নতুন জীবন লাভ করেছে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় তথা মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম– এর দাওয়াত ও শিক্ষার গন্ডি থেকে বাইরে থেকে গেছে। কারণ এটা কি করে সম্ভব যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যথাতুর পৃথিবীবাসীর শারীরিক ও মানসিক রোগসমূহ থেকে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবেন। নবী

---

[২৪০] قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَـهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (আল-কুরআন ৬ : ৪৬)

[২৪১] إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ- فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (আল-কুরআন ৩৮ : ৭১-৭২)

Dhaka University Institutional Repository

করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূহানী রোগের সঙ্গে শারীরিক সমস্যারও সমাধান দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজের প্রচলিত কোন চিকিৎসক ছিলেন না। নবুওয়তের পদমর্যদার জন্য এটা জরুরীও নয়। তথাপিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসকদের জন্য একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনাও দিয়ে গেছেন।

আধুনিক যুগে মানুষের মস্তিষ্কে বস্তুবাদ এতই প্রভাব বিস্তার করেছে যে, কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের ঝাড়-ফুঁক ও দোয়া-কালামকে একেবারেই অনর্থক ও নিঃস্প্রয়োজন মনে করে থাকে। ঔষধ ব্যাতিত অন্য কিছুই তাদের জ্ঞানে আসে না। ঔষধ সুস্থতার মাধ্যম মাত্র, সুস্থতা দানকারী নয়। কারণ, সুস্থতা এক মাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের হাতে। যদি ঔষধ ব্যবহারের দ্বারাই সুস্থতা লাভ করা যেত তাহলে কোন অসুস্থ ব্যক্তি ঔষধ ব্যবহারের পর অসুস্থ থাকতো না। আমাদের কখনও এই ধ্রুব সত্যটি ভুলে গেলে চলবে না যে, শেফা দানের ক্ষমতা এক মাত্র আল্লাহর হাতে। অতএব সুস্থতা লাভের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের মুখাপেক্ষি হওয়া উচিত। ঔষধ শুধু মাত্র একটি কার্যকর ও উপকারী মাধ্যম মাত্র।

মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেন, আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি ঈমানদারদের জন্য (তাদের রোগের) শেফা ও রহমত স্বরূপ।[২৪২]

পবিত্র কুরআন এমন শেফা ও রোগ মুক্তির মহৌষধ যার মধ্যে আত্মিক ও দৈহিক সর্বপ্রকার অসুস্থতার শেফা রয়েছে। এমনকি এতে চারিত্রিক ত্রুটি ও সামাজিক বিপথগামীদের জন্যও শিক্ষা রয়েছে। যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যাক্তি আল্লাহর কালামের দিক নির্দেশনা গ্রহণ করে নিয়েছে, তারা সকল প্রকার রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত এবং চিকিৎসকের নিকট পরামর্শ গ্রহণেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামমের জামানায় মদীনা শরীফের ডাক্তারগণ হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকত। এমনকি এক ডাক্তার নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অভিযোগ নিয়ে এল যে, কোন রোগীই তার নিকট যায় না। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সম্ভবত এর কারণ এই যে, এ সকল লোকেরা সে পর্যন্ত খাবারের প্রতি হাত বাড়ায়না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তীব্র ক্ষুধা অনুভব না করে। আর পরিপূর্ণরূপে পেটভরার পূর্বেই খাবার খাওয়া ছেড়ে দেয়। তাই মনে করা যায় যে কম খাওয়ার কারণেই তাদের সুস্থতা বজায় আছে।[২৪৩] পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের জীবনাদর্শের মধ্যে মানুষের জীবন যাপনের উত্তম পদ্ধতি লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রয়োজন শুধু সঠিক মর্ম উপলব্ধী করে সে হিসাবে জীবন প্রণালী গড়ে তোলা। কুরআনকে পবিত্র আর উত্তম মনে করে শুধু মাত্র পাঠ করায় যথেষ্ট নয়।হাদীসকে অনুসরণ করে কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, তথা রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত মেনে চললেই কেবলমাত্র কুরআন-হাদীস উৎগত উপকারিতা লাভ করা সম্ভব।

---

[২৪২] وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا (আল-কুরআন ১৭ : ৮২)

[২৪৩] প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

মেস্ওয়াক বা দাঁত পরিস্কার

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় জাতি দাঁতের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানত না। প্রকৃত পক্ষে বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে এ সম্বন্ধে তাদের ধারণা জন্মে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে দাঁতের যত্ন ও সংযোজন বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়। বিলাতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ আছে যে ১৯৫৭ সালে এক কোটি পনের লাখ দাঁত উত্তোলন করেন সেখানকার ডেন্টাল সার্জনগণ। আরও বলা হয়েছে যে পঞ্চাশ লাখ দাঁত দন্ত চিকিৎসকণগ সংযোজন করে দেন এবং তেত্রিশ লক্ষ রোগীর মাড়ির চিকিৎসা প্রদান করেন। এ খাতে এ দেশের ব্যয় হয়েছিল আটান্ন কোটি পঞ্চাশ লাখ পাউন্ড।[২৪৪] সুতরাং দেখা যায় ইউরোপে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাঁতের যত্ন শুরু হয়। কিন্তু বহু পূর্বে প্রায় দেড় হাজার বছর আগেই গোটা বিশ্বের জন্য শান্তি ও বিজ্ঞানময় ধর্ম ইসলামের উৎস ভূমি আরবে দাঁতের যত্নের প্রতি চর্চা ও অনুশীলন শুরু করছিলেন বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ফলে বলতে হয় তখন থেকেই দন্ত বিজ্ঞানের উদ্ভব। দেড় হাজার বছর পূর্বে যখন ইউরোপীয় জাতি অনুন্নত ও অসভ্য ছিল তখন আরব মরুভূমিতে প্রেরীত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের মানব গোষ্ঠীর জন্য দাঁত পরিষ্কারের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেন। শুধু তাই নয় তিনি স্বয়ং এর উপর আমল করেছেন।

জাপানের টোকিওতে ১৯৬০ সালে ১৫০টি স্কুল ও ১৭টি কিন্ডারগার্টেনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দাঁতের যত্নের উপর এক সপ্তাহ ব্যাপি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এতে আলোচনা ও বক্তৃতা ছাড়াও দাঁত পরিষ্কার করার উত্তম পন্থা শিখানো হয় এবং ছাত্রদের মাঝে বিনামুল্যে দাঁতের ব্রাশ ও মাজন বিতরণ করা হয়।[২৪৫] বর্তমানে দাঁতের যত্ন ও চিকিৎসার জন্য বহু বইপুস্তক লেখা হয়েছে। এর জন্য ক্লিনিক্স, হাসপাতাল, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি খোলা হলেছে। ইদানিং স্কুলের ছাত্র থেকে শুরু করে প্রতিটি নাগরিকের নিয়মিত দাঁত পরীক্ষার প্রয়োজন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। খাদ্য দ্রব্য ভাল ভাবে হজম করতে দাঁত সাহায্য করে। দাঁত দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কারক। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের যত্নের মত দাঁতের ও প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়া উচিত। ইসলামে যেমন দাঁত পরস্কার রাখার উপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁত পরিস্কার সম্বন্ধে যা বলে গেছেন, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম প্রবর্তক, বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসক তদ্রুপ বলে যাননি। এ বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে যা অধ্যায়ন করা প্রতিটি স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য।

নবী মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভ্রমন কালেও মিসওয়াক সঙ্গে রাখতেন। নিম্নে কয়েকটি হাদীসের উদৃতি দেয়া হলো।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি মু'মিনদের জন্য এবং যুহাইরের বর্ণিত হাদীসে রয়েছে "আমার উম্মতের জন্য কষ্ট না হতো তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের পূর্বে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"[২৪৬]

হুযায়ফাহ (রাঃ) বলেছেন যে, রাত্রিতে যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সালাতের জন্য) উঠতেন তখন মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করতেন।[২৪৭]

---

[২৪৪] ড. দেওয়ান আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[২৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

[২৪৬] ইমাম মুসলিম (র), প্রাগুক্ত, খন্ড ২য়, ২য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১২, হাদীস নং ৪৯৬

Dhaka University Institutional Repository

ইবেন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিস্কার করছি। তখন দুই ব্যক্তি আমার নিকট এলো। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ। আমি কণিষ্ঠকে মিসওয়াকটি দিলাম। আমাকে বলা হলো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে তা দাও। তারপর বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমি মিসওয়াক দিলাম।[২৪৮] আবূ বুরদা (র) এর পিতা, আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে দেখি, তিনি তাঁর হাতের মেসওয়াক দিয়ে দাঁত ঘসছেন। তিনি মুখে মেসওয়াক রেখে এমন ভাবে উহ্ উহ্ শব্দ করছেন মনে হলো যেন তিনি বমি করবেন।[২৪৯]

শুরাই ইবনে হানীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, গৃহে প্রবেশ করে নবী মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম কি করতেন? তিনি বললেন যে, মিসওয়াক করতেন।[২৫০]

আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনায় আছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'দশটি স্বাভাবিক সিদ্ধ ধর্ম কর্ম আছে : গোঁফ খাট করা, দাঁড়ি দীর্ঘ করা, দন্ত পরিস্কার করা, অজুর সময় নাসিকা পরিস্কার করা, নখ কাঁটা, আঙ্গুলের গিরা সমূহধৌত করা, বগলের কেশ মুন্ডন করা, নাভির নিচের কেশ মুন্ডন করা এবং পায়খানা প্রশাবের পর পানি দ্বারা পরিষ্কার করা অর্থাৎ ইস্তেঞ্জা করা। রাবী বলেছেন দশম জিনিসটি আমি ভুলে গিয়েছি। হয়তবা কুলি করা হতে পারে। কুতাইবা একটু অধিক বলেছেন যে, ওয়াকী বলেছেন 'ইনতি কাসুল মা' অর্থাৎ ইস্তেঞ্জা করা।[২৫১]

হুযায়ফাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক দ্বারা ঘসে মুখ সাফ করতেন।[২৫২]

সালাতের পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত এবং বহু ফযীলত। প্রত্যেক সালাতের পূর্বে মিসওয়াক করলে ঐ সালাতের ফযীলত মিসওয়াক বিহীন সালাতের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বেও মিসওয়াক ব্যবহার করছিলেন। বিশ্বের সেরা মহামানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দন্ত পরিস্কার সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রেখে গেছেন ও নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজে পালন করে গেছেন তা আমরা কমই খেয়াল করে থাকি। অথচ মুসলমান হিসবে আমাদের উচিত সেদিকে লক্ষ্য রাখা। পাঁচ ওয়াক্ত সালতের পূর্বে মিসওয়াক করা সম্বন্ধে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক বক্তব্যই শুধু রাখেননি বরং নিজে এবং সাহাবীগণ তা মেনে চলেছেন।[২৫৩]

---

[২৪৭] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, খন্ড ১ম, উযু অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ১৭২, হাদীস নং ২৪৪

[২৪৮] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ১৭২

[২৪৯] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৪৩

[২৫০] ইমাম মুসলিম (র), প্রাগুক্ত, খন্ড ২য়, ২য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১২, হাদীস নং ৪৯৭

[২৫১] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ১৩, হাদীস নং ৫১১

[২৫২] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫০০

[২৫৩] ড. দেওয়ান আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান যুগে খুব অল্প সংখ্যক মুসলমান এই নিয়ম মেনে চলে। এর কারণ হচ্ছে :

* সালাতের প্রতি অমনোযোগ
* হাদীস চর্চার অভাব বা হাদীস শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ
* অলসতা
* স্বাস্থ্য সচেতনার অভাব।

তবে খুশীর কথা বর্তমানে মুসলমানগণ অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতন। স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় অনেক মূল্যবান গ্রন্থ বর্তমানে বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় পাওয়া যায়। অভাব শুধু এই সব মূল্যবান গ্রন্থ পড়া এবং তদনুযায়ী আমল ও প্রচার করা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীরা পাঠ্য বই ছাড়া বহু পুস্তক পড়ে থাকে কিন্তু তাদের খুব কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী কুরআনের বাংলা অর্থসহ ও বাংলায় অনুদিত স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় গ্রন্থসমূহ পড়ে থাকে।

মেস্ওয়াকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

প্রকৃতি কখনো মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ নয় বরং তা সর্বদাই মানব-স্বভাবের অনুকূলে। শুধু তাই নয়, মানুষ যখন দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে গিয়ে নানা ধরনের বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয় এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনরূপ উপায়ান্তর না দেখে পুনরায় প্রকৃতির দিকে ফিরে আসে, প্রকৃতি তখনও মানুষকে পূর্বের ন্যায় উপকার করতে থাকে। চিকিৎসকগণ বলে থাকেন সকালে ঘুম থেকে উঠে, প্রতিবার আহারের পর এবং রাত্রে শয়নের পূর্বে দাঁত পরিস্কার করতে হবে। যদি সম্ভব না হয় তবে অন্তত কমপক্ষে দু'বার অর্থাৎ সকালে নাস্তার পর এবং রাত্রে শয়নকালে অবশ্যই দাঁত পরিস্কার বা মিস্ওয়াক করতে হবে। আহারের পর দাঁত নিয়োমিত পরিস্কার না করলে শর্করা জাতীয় খাদ্য মুখের লালার সঙ্গে মিশে এক প্রকার ডেক্সট্রন তৈরী করে এবং পরে ভেঙ্গে বিষাক্ত এক প্রকার অ্যাসিড সৃষ্টি হয় যা দাঁতের এনামেলকে নষ্ট করে। খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে ব্যাকটেরিয়া নামক রোগ জীবানু দাঁতের মধ্য আবরণকেও ধ্বংস করে আর এভাবে ধ্বংস করতে করতে যদি দাঁতের ভিতরের আবরণ 'পালপ' পর্যন্ত পৌছে তবে মারাত্মক ব্যাথা হয়। কারণ স্নায়ুগুলো দাঁতের ভিতরের আবরণ 'পালপে' থাকে। এই দন্তক্ষয় রোগকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় Dental caries বা Carious tooth বলে। আমাদের সমাজে সাধারন লোকেরা যাকে 'দঁতের পোকা' বলে থাকে সেগুলো আসলে দাঁতের পোকা নয়। ল্যাকটিক অ্যাসিড অপরিস্কার দাঁতকে ক্ষয় করে। বিশেষ করে দাঁতের যে অংশ দ্বারা খাদ্য দ্রব্য চিবানো হয় সেই অংশের মাঝখানে কালো রঙের গর্ত হয়, অবশেষে দাঁতের আবরণ সমূহ নষ্ট হয়ে যায়। শিশুরাই আমাদের দেশে দন্তক্ষয় রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে অপরিস্কার মুখগহব্বর, অনিয়মিত ও ভুল পদ্ধতিতে দাঁত পরিস্কার করা এবং অতিরিক্ত চকলেট, চুইংগাম এবং মিষ্টি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ। ফলশ্রুতিতে মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, মাড়ি ফুলে যাওয়া, দাঁত থেকে মাড়ি পৃথক হয়ে যাওয়া, দাঁত নড়ে যাওয়া অবশেষে দাঁত পড়ে যায়। একে চিকিৎসা শাস্ত্র মতে 'পাইয়োরিয়া' ও 'জিনজিভাইটিস' রোগ বলে।[২৫৪]

নিয়োমিত ও সঠিকভাবে দাঁত পরিস্কার না করলে মুখ দুর্গন্ধময় হয়। অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় এই দুর্গন্ধ প্রকাশ পায়। নিয়োমিত মেসওয়াক না করলে দাঁত ও মাড়িতে রোগ দেখা দেয় তাতে সৌন্দর্য হ্রাস পায়। মুখের সৌন্দর্য ও দাঁতের লাবণ্য বৃদ্ধির জন্য নিয়োমিত মেসওয়াক ও মাড়িকে

---

[২৫৪] প্রাগুক্ত পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাসেজ করা একান্তই দরকার। ভালো ভাবে দাঁতের গোড়া পরিস্কার না করলে মাড়িকে দাঁতের গোড়া থেকে সরিয়ে দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের পূর্বে হাত ধৌত করতেন আর খাবার শেষে কুলি করতেন। কিন্তু বর্তমান যুগের মানুষেরা খাবার খেয়ে কুলি করে না, অথচ সে ব্যক্তি যদি মিষ্টি দ্রব্য খেয়ে থাকে, তাহলে তার প্রভাব মুখের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ অবশিষ্ট থাকে আর যদি সাথে সাথে কুলি করার অভ্যাস গড়ে তোলা যায় তাহলে মহা ক্ষতির হাত থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়। তাছাড়া দিনে অন্তত পাঁচবার অজু করতে হয়, আবার পৃথক ভাবে মুখ পরিস্কার করা হয়ে থাকে। এভাবে মানুষ বিশেষ পদ্ধতিতে প্রতিনিয়ত মুখ, হাত, পা ইত্যাদি পরিস্কার করে থাকে।

টনসিলের রোগীদেরকে মিস্ওয়াক ব্যবহার করিয়ে যথেষ্ট ফল পাওয়া গেছে। মিস্ওয়াক ব্যবহার করে এবং মিস্ওয়াক কেটে পানিতে ফুটিয়ে সেই পানি দ্বারা গড়গড়া করে 'থাইরয়েড গ্লান্ড' রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি খুব দ্রুত উপশম পেয়েছে।

গালের ঘা অনেক ক্ষেত্রে গরমের তিব্রতা এবং প্রখরতার কারণে হয়ে থাকে। তন্মধ্যে বিশেষ এক প্রকার ঘা রয়েছে যার বিষাক্ততা দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য তাজা মিস্ওয়াক দ্বারা দাঁত মাজতে হবে এবং তখনকার সৃষ্ট মুখের লালা গুলো মুখের মধ্যে মলতে হবে। এই পদ্ধতিতে অনেক রুগী আরোগ্য লাভ করেছে।

অনেকে দাঁত হলুদ বর্ণ হয়ে যাওয়া এবং দাঁতের শুভ্র আস্তর বেরিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করে থাকেন। মিস্ওয়াকের নতুন নতুন আঁশ দাঁতের হরিদ্রতার জন্য খুবই উপযোগী। মিস্ওয়াক হল দুর্গন্ধ প্রতিষেধক। মিস্ওয়াক মুখের ভিতরের রোগ জীবাণু ধ্বংস করে দেয়, ফলে নামাযী ব্যক্তি অসংখ্য রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পায়। আর অনেক রোগ জীবাণু তো মিস্ওয়াকের প্রতিরোধক পদার্থের ক্রিয়াতে ধ্বংস হয়ে যায়। "হযরত আলী (রাঃ) বলেন, মিস্ওয়াক দ্বারা মস্তিষ্ক সতেজ হয়।

প্রকৃত পক্ষে যে বৃক্ষে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জাতীয় পদার্থ যত বেশী, সেই গাছের মিস্ওয়াক তত বেশী উত্তম। কারণ দাঁত গঠনের মূল উপাদান ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধময় পুঁজযুক্ত দাঁত মস্তিষ্ক রোগের বড় কারণ হতে পারে। উম্মাদনা মস্তিষ্ক বিকৃতিসহ আরো অনেক রোগ-ব্যাধিও এর থেকে জন্ম নেয়। দীর্ঘ দিন যাবত পাইওরিয়া রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কের পর্দায় পুঁজ হতে দেখা গেছে। আবার এই একই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মাড়ীর দাঁতে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু-বরণ করার ঘটনাও বিরল নয়। যেসব রোগীদের কানে ফোলা, পুঁজ, রক্তিমতা, ইত্যাদি হয়েছে এবং ডাক্তারগণ তাদের চিকিৎসা করে ব্যার্থ হয়ে পড়েছেন! তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে মাড়ীতে পুঁজ জমেছে। সুতরাং মাড়ীর চিকিৎসা করার পর রোগী সুস্থ হয়ে পড়ে। দন্তরোগের সাথে রয়েছে চক্ষু-রোগের গভীর সম্পর্ক। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে যখন খাবারের ছোট ছোট কণা জমে থেকে মুখ দূর্গন্ধময় হয়ে পড়ে তখন চক্ষু রোগ, দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা এবং অন্ধরত্বের শিকার হতে পারে।

চক্ষু রোগের আরো যতো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তন্মধ্যে দাঁতের যত্নের প্রতি অমনোযোগই এর প্রধান কারণ বলে বিবেচিত হয়েছে।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের গবেষণায় একথায় প্রমানিত হয়েছে যে, দন্তরোগের কারণেই পাকস্থলীর ৮০% রোগ হয়। বর্তমান বিশ্বে পাকস্থলীর রোগ এক প্রকার চ্যালেঞ্জ হয়ে দঁড়িয়েছে। দাঁতের মাড়ীর

Dhaka University Institutional Repository

অথবা মুখের ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ খাদ্য-পানির সাথে মিলিত হয়ে অথবা লালার সংমিশ্রনে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে সমস্ত খাদ্যসমূহকে দূষিত ও দুর্গন্ধময় করে তোলে, ফলে এই পুঁজ রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে পাকস্থলী ও যকৃত রোগের চিকিৎসার পূর্বে দাঁত এবং মুখের চিকিৎসার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাহলে পাকস্থলী, যকৃতসহ পেটের অন্যান্য অসুখের দ্রুত ও স্থায়ী আরোগ্য সম্ভব। সমাজ-জীবনে একে অন্যের সাথে বাক্য বিনিময়ের সময় মুখের দূর্গন্ধের কারণে গোটা পরিবেশটাই বিষাদময় হয়ে পড়ে। এ ধরনের রোগের চিকিৎসার জন্য সর্বপ্রথম দাঁতের কথা স্মরণ রাখা উচিত। কারণ দূর্গন্ধের প্রধান কারণ হল দাঁত। অতএব সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য দাঁতের যত্ন নেয়া আবশ্যক। কারণ সুস্থতাই হলো সফল জীবনের চাবিকাঠি। সে জীবন কখনো সফলকাম হতে পারে না, যেখানে স্বাস্থ্য রক্ষার মূল নীতির প্রতি থাকে চরম উদাসীনতা।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, দাঁতের যত্ন নেওয়ার জন্য ব্রাশ বেশি প্রয়োজন না মিস্ওয়াক? ব্রাশ এবং মিস্ওয়াক উভয়ই কি এক? এ ব্যাপারে জীবাণু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ জ্ঞান লাভ করেছেন যে, একবার ব্যবহার করা ব্রাশ স্বাস্থ্যের জন্য তখনই ক্ষতিকর যখন উহা দ্বিতীয় বার ব্যবহার করা হয়। কেননা ব্যবহারের ফলে তার মধ্যে জীবাণুর ভিত্তি স্থাপিত হয়। পানি দ্বারা পরিস্কার করলেও জীবাণু ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ছাড়াও ব্রাশ দাঁতের উপরের উজ্জল স্তরকে দূরীভূত করে দেয়, ফলে দাঁত অমসৃন হয়ে যায়, দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি হয়, দাঁতগুলো ধীরে ধীরে মাড়ী থেকে বিচ্যুতি হতে থাকে এবং খাবারের ছোট ছোট কণাগুলো দাঁতের ফাঁকে জমে মাড়ী ও দাঁতের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

অপর দিকে এমন বৃক্ষের মিস্ওয়াক দাঁতের জন্য উপযোগী যার আঁশগুলো হয় কোমল, যা দাঁতের মধ্যে ফাঁকা বৃদ্ধি করে না এবং মাড়ীতে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে না। তিনটি গাছের ডাল মিস্ওয়াকের জন্য উপযোগী (১) নীম গাছের মিস্ওয়াক (২) বাবলার মিস্ওয়াক (৩) পীলু গাছের মিস্ওয়াক। প্রকৃত পক্ষে এই তিনটি গাছের ডালে দাঁত গঠনের মূল উপাদান ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বেশী পরিমাণে রয়েছে। মিস্ওয়াক হলো সর্দি-কাশির সর্বোচ্চ প্রতিরোধক। স্থায়ী সর্দি-কাশির রোগীর শ্লেষ্মা যদি জমাট বেঁধে থাকে সে ক্ষেত্রে মিস্ওয়াক ব্যবহার করলে শ্লেষ্মা ভিতর থেকে বের হয়ে মস্তিষ্ক হালকা হয়ে যায়। নিয়মিত মিস্ওয়াক ব্যবহার করলে নাক ও গলার অপারেশন করার মত পরিস্থিতি খুব কমই সৃষ্টি হয়।[২৫৫]

অজুর বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর দিক

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিম বান্দাহ অজুর সময় যখন মুখমন্ডল ধৌত করে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত গোনাহ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন) পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে দ'হাত ধোয় তখন তার দু'হাতের স্পর্শের মাধ্যমে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতপর যখন সে পা দু'টি ধৌত করে, তখন তার দু'পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত সব গুনাহ্ পানির সাথে অথবা

[২৫৫] ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, খন্ড ৩ - ৪, পৃ. ৪২ - ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। এভাবে সে যাবতীয় গোনাহ্ থেকে মুক্ত ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।[২৫৬]

হাত ধোয়া

আমরা যখন হাত দিয়ে নানা কাজ করি, এটা-সেটা ধরি, তখন অসংখ্য জীবাণু হাতে লেগে যায়। এক মিলিমিটার লোমকূপের গোড়ায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার জীবাণু থাকতে পারে। আর একটা আংটির নিচে কোটি কোটি জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে। আঙ্গুলের নখের নিচে লুকিয়ে থাকতে পারে শত-কোটি জীবাণু। এসব জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না। এর পর যখন আমরা সেই হাতে খাবার, মুখ, চোখ, নাক স্পর্শ করি, তখন আমরা সংক্রমিত হই। অন্যকে স্পর্শ করে তাকেও আমরা আক্রান্ত করতে পারি। নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুললে আমশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস, ডায়রিয়া, কৃমিসহ আরো অনেক জীবানু দ্বারা সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়। অজু করা শুরু করতে হয় হাত ধোয়ার মাধ্যমে। অজুর মাধ্যমে হাত ধোয়ার পর খুব কম জীবাণু হাতে লেগে থাকতে পারে। তাই নিজের ও অন্যের সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায় যথেষ্ট।

মুখ ধোয়া

আমাদের মুখে হাজারো জীবাণু বসবাস করে। এটা খুবই স্বাভাবিক। এসব জীবাণুর বেশির ভাগই থাকে খসখসে জিহব্বার পেছনের অংশের উপরি ভাগে এবং দাঁত ও মাড়ির ফাঁকে ফাঁকে। আমরা যে খাবার খাই, সে খাবারের ক্ষুদ্রাতি কণা জিহব্বার উপরি ভাগে আর দাঁত ও মাড়ির ফাঁকে ফাঁকে লেগে থাকে। মুখের ভেতরে জীবাণুরা বেঁচে থাকে এসব খাদ্য কণা খেয়ে। জীবাণুরা যখন এসব খাদ্য কণা খেতে থাকে, তখন এসব খাদ্য কণা ভেঙ্গে দুর্গন্ধ যুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়। কথা বলার সময় এ গ্যাস দুর্গন্ধরূপে বেরিয়ে আসে। দিনে পাঁচবার অজু করার সময় কুলি করে মুখ ধোয়ার মাধ্যমে এসব জীবাণুর সংখা যথেষ্ঠ কমে যায়। ফলে মুখের দুর্গন্ধ কমে যায়। মুখ ও দাঁতের যত্নে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন যথেষ্ঠ যত্নবান। সাহাবিদেরও তিনি মুখ ও দাঁতের যত্নের কথা বলেছেন। প্রতিবার অজুর আগে মিসওয়াক করা সুন্নাত। প্রতিদিন নামাজের পূর্বে পাঁচ বার মেসওয়াক করে অজু করার সময় কুলি করে মুখ ধোয়ার মাধ্যমে মুখের জীবাণু সংখ্যা অনেক কমানো যায়। দাঁত মাজা বা ব্রাশ করার ফলে দাঁত ও মাড়ির ফাঁকে-ফাঁকে লেগে থাকা ময়লা ও জীবাণু পরিস্কার হয়। দাঁত ও মাড়ি শক্ত হয়। দাঁতের ক্যারিস বা ক্ষয়রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে।

নাক ধোয়া

শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বাতাসের কিছু ধুলাবালি ও জীবণু নাকের লোমে আটকা পড়ে। অজু করার সময় মুখ ধোয়ার পরই নাক ধুয়ে পরিস্কার করতে হয়। দিনে পাঁচবার নাক ধুয়ে ফেলার ফলে নাকের ভেতর লেগে থাকা ধুলোবালি থেকে রোগব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

---

[২৫৬] ইমাম মুসলিম (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৯, হাদীস নং ৪৮৪

Dhaka University Institutional Repository

মুখোমন্ডল ধোয়া

অজুর পরবর্তী ধাপ মুখমন্ডল ধৌত করা। প্রতিবার অজুর সময় তিনবার করে মুখমন্ডল ধোয়ার ফলে মুখের ত্বকের ধুলাবালি, তেলতেলে ভাব ও জীবাণু দূর হয়। এতে মুখের ব্রণ হওয়ার সম্ভাবনা কমে। ত্বকে রক্ত সরবরাহ বাড়ে। ফলে ত্বক থাকে মসৃণ; ত্বকে বার্ধক্যজনিত ভাঁজ পড়ে দেরিতে।

বাহু ধোয়া

অজুর সময় প্রত্যেক বাহুর কনুই পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করতে হয়। এতে বাহুর ত্বকের ধুলাবালি, তেলতেলে ভাব ও জীবাণু দূর হয় এবং ত্বকে রক্ত সরবরাহ বাড়ে।

মাথা ও ঘাড় মাছেহ করা

এর দ্বারা মাথার চুল, ঘাড় ও কানের ভাজ থেকে ধুলাবালি, ময়লা, জীবাণু দূর হয়। কানের ছত্রাক জনিত অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা কমে। কমে ধুলাবালির এলার্জি জনিত ঘাড়ের চুলকানি।

পা ধোয়া

আমাদের পায়ের ত্বকে আছে অসংখ্য ঘর্ম গ্রন্থি। এগুলো থেকে নির্গত ঘামের সাথে বের হয় পানি, খনিজ লবণ, তেল বা চর্বি জাতীয় পদার্থ এবং শরীরের বিপাকীয় আরো অনেক পদার্থ। পায়ের ত্বকে স্বাভাবিকভাবেই হাজারো জীবাণু থাকে। এসব জীবাণু তাদের বেঁচে থাকা ও বংশ বৃদ্ধি করার জন্য ঘর্মাক্ত পায়ের স্যাঁতস্যেঁতে পরিবেশে ঘামের এসব জিনিস খেয়ে থাকে। ফলে তৈরী হতে থাকে নানা উচ্ছিষ্ট। আর এ জন্য পায়ে দুর্গন্ধ হয়। এ দুর্গন্ধ দূর করতে চিকিৎসা শাস্ত্র প্রতিদিন একাধিক বার পা ধুয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেয়। আর ইসলাম অজু করার নির্দেশ দিয়েছে নামাজের আগে। অজু করার সময় দৈনিক পাঁচবার পা ধোয়া নিঃসন্দেহে পা-গুলোকে দুর্গন্ধমুক্ত রাখতে সহায়তা করে। সেই সাথে কমে পায়ের নানা ইনফেকশনের সম্ভাবনাও। ইসলাম কত স্বাস্থ্যসম্মত ও বিজ্ঞানময় ধর্ম।

নামাযের স্বাস্থ্যোপকার

আল্লহ তা'আলা আমাদের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে নামায অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় অনেক আয়াতে নামাযের নির্দেশ ও গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের জন্য যে সমস্ত বিধান রেখেছেন তার প্রত্যেকটিতেই শরীর-স্বাস্থ্যের উপকারীতা রয়েছে। ফরজ ইবাদত নামায ও তেমনি, নামাযে শরীর স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না; বরং উপকার হয়। নামায একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম যা একজন মুসলমান দৈনিক পাঁচ বার করতে হয়। নামাযে শরীরের ব্যায়াম হয়। আমরা অবশ্য ব্যায়াম করার উদ্দেশ্যে নামায আদায় করিনা। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর ফরজ হুকুম মানার জন্যই আমরা নামায আদায় করি, নামায কায়েম করি। এতে অবশ্যই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় কল্যাণই নিহিত আছে।

নামায আদায়ের সময় নামাযের কিয়াম, রুকু, সিজদাহ, বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরের অনেক ব্যায়াম হয়। আর জামাতে নামায পড়ার সময় মসজিদে যাওয়া-আসার সময় হাঁটার মাধ্যমে যথেষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

ব্যায়াম হয়। এই ব্যায়াম শরীরের জন্য উপকারি। হাড়ের প্রতিটি জোড়া, চোখ, ঘাড়, রক্তনালি ও হৃৎপিন্ডের জন্য ভালো। নামাযের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ইত্যাদি অনেক স্বাস্থ্যপকার রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া স্বাস্থ্যের সংজ্ঞার তিন দিকেরই সুস্থতা অর্জিত হয় নামাযের মাধ্যমে। ব্যায়াম হিসাবে হাঁটার কথা আজকাল খুবই বলছে চিকিৎসা বিজ্ঞান। উৎকৃষ্ট ব্যায়াম হিসাবে হাঁটার কথা আমরা সবাই জানি। হাঁটার ফলে শরীরের অনেক উপকার হয়। রক্তের খারাপ কোলেস্টেরল 'এল ডি এল' কমে, আর ভালো কলেস্টেরল 'এইচ ডি এল' বাড়ে। রক্তনালির দেয়ালে তেল-চর্বি জমে না। ফলে উচ্চরক্তচাপ, স্ট্রোক এবং হৃদরোগের সম্ভাবনা কমে যায়। হ্রাস পায় ডায়াবেটিক্স হয়ার সম্ভাবনা। আর ইতিমধ্যেই যাদের ডায়াবেটিক্স রোগ হয়েছে, তাদের ডায়াবেটিক্স থাকে নিয়ন্ত্রণে এবং শরীরের ওজন থাকে সঠিক। শরীরের মাংশপেশি হয় সুঠাম ও জয়েন্ট বা হাড়ের জোড়াগুলো থাকে কর্মক্ষম। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমেও প্রায় একই ধরনের উপকার পাওয়া যায়। দৈনিক ৩০ (ত্রিশ) মিনিট করে হাঁটলে যেসব শারীরিক উপকার পাওয়া যাওয়ার কথা, তার প্রায় সবই অর্জিত হয় নামায পড়ার সময় শরীরের বিভীন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে নিয়মতান্ত্রিক নড়াচড়া হয়, তার মাধ্যমে। নামাযের সময় শরীরের বিভিন্ন মাংসপেশী ও জয়েন্টের নিয়মতান্ত্রিক নড়াচড়ার যে পুনরাবৃত্তি হয়, তাতে এসব অঙ্গে রক্ত সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। ফলে পেশির শক্তি বৃদ্ধি পায়। হাড়ের জোড়ার বা জয়েন্টে স্থিতিস্থাপকতা ও নমনিয়তা বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত ছন্দোবদ্ধ সংকোচন ও প্রসারণের ফলে মাংসপেশি সবল হয়, সুঠাম হয়। পেশিগুলো শুকিয়ে যায়না। অল্প বয়সে গিঁটেবাত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। রুকু ও সিজদায় ঘাড়, মাথা ও মস্তিষ্ক রক্ত সরবরাহ বাড়ে, ফলে ঘাড় ও মাথা ব্যাথার উপশম হয়। নামাযের মাধ্যমে হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের কর্ম-দক্ষতা বাড়ে। শ্বাসতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিরাত পাঠের জন্য গভীরভাবে শ্বাস টানার ফলে ফুসফুসের ভেতরে অক্সিজেনের সর্বোচ্চ ব্যাবহার হয়। নামায পড়ার ফলে শরীর-মন প্রফুল্ল হয়। বাইরের দুশ্চিন্তা এসে মনে বাসা বাঁধে না। কুরআন তেলাওয়াত করায় বা শোনায় মনে পরিবর্তন হয়। আধ্যাত্মিক চেতনায় মন ভরে উঠে। মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আত্মতৃপ্তিতে মন ভরে উঠে। মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার সময় এলাকার অনেক লোকের সাঙ্গে দেখা-সাক্ষাত হয়, কুশল বিনিময় হয়। ফলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়। নামায কায়েম করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি আমরা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থ থাকতে পারি। আল্লাহ আমাদের কত উত্তম ব্যাবস্থাপনাই না দিয়েছেন।

ফজরে ওঠার স্বাস্থ্যসুবিধা

সকালে ঘুম থেকে ওঠা স্বাস্থ্যসম্মত। জ্ঞানী ব্যাক্তিরা বলেন, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলে স্বাস্থ্যবান, জ্ঞানী আর ধনী হওয়া যায়। Early to bed and early to rise, Makes a man healthy, wealthy and wise (বেঞ্জামিন ফ্রান্কলিন)। ইসলাম অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের জন্যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরজ করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রথম ওয়াক্তই ফজরের নামায। আর ফজরের নামায আদায় করতে হয় অতি প্রত্যুষে, সুবহে সাদিকের পর হতে সূর্য উঠার পূর্বেই। সময় মত নামায আদায় করার জন্য অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠতে হয়। সুতরাং ইসলাম সকালে ঘুম

Dhaka University Institutional Repository

থেকে উঠাকে যেমন ফরজ করেছে, তেমনি উৎসাহিতও করেছে। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠা খুবই বরকতময়। সুতরাং যারা দেরিতে ঘুম থেকে উঠে, তারা সকালে উঠার বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।

আজকাল শহরে বসবাসকারীদের বেশির ভাগ লোকের অভ্যাস দেরিতে ঘুমাতে যাওয়া এবং দেরিতে ঘুম থেকে উঠা। গ্রামে অবশ্য এই অভ্যাস কিছুটা কম। একজন স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের সকালে সূর্য উঠার পূর্বে ঘুম থেকে উঠা অবশ্যই কর্তব্য। এটা একজন ভালো মুসলমানের অভ্যাসে পরিণত হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠার স্বাস্থ্য সুবিধা অনেক। মসজিদে জামাতে নামায অদায়ের জন্য বাসা-বাড়ি থেকে মসজিদ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া এবং হেঁটে অসার ফলে ভাল ব্যায়াম হয়। নামাযের সময় ও নামায আদায়ের মাধ্যমে ব্যায়াম হয়। এছাড়াও সকালে ঘুম থেকে উঠলে হাঁটা-হাঁটি বা ব্যয়াম করার অনেক সময় পাওয়া যায়। শরীরের জন্য হাঁটা খুবই জরুরী। নিয়মিত ব্যায়াম উচ্চরক্তচাপ ও হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়ক। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে হৃদরোগের ঝুকি বেশি হয়। কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ার বড় কারণ চর্বিযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া এবং ব্যায়াম না করা। চর্বিযুক্ত খাবার খেতে হবে কম। ব্যায়াম করতে হবে বেশি। ব্যায়াম করলে খারাপ কোলেস্টেরল 'এল ডি এল' এর মাত্রা কমে । আর ভাল কোলেস্টেরল 'এইচ ডি এল' এর মাত্রা বাড়ে। ব্যায়াম করলে রক্ত নালির দেয়ালে চর্বি জমতে পারে না। ফলে রক্তনালি সরু হয় না, সঠিক থাকে। ব্যায়াম করলে হৃদযন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ে। নিয়মিত ব্যায়াম রক্তচাপ কমাতেও সহায়ক। চিকিৎসা বিজ্ঞনীরা বলেন, প্রতিদিন ৩০ (ত্রিশ) মিনিট করে সপ্তাহে ৫ দিন ব্যায়াম করলে রক্তচাপ কমবে প্রায় ৪ থেকে ৯ মিলিমিটার। মাত্র কয়েক সপ্তাহেই এরূপ ফল পাওয়া যাবে।

নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে রক্তচাপ থাকবে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে। ইসলামি জীবন-যাপনে দৈনন্দিন বেশ ব্যায়াম হয়। একজন মুসলমান দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন, নামায পড়ার সময় নামাযের কিয়াম, রুকু, সিজদাহ, বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরের অনেক ব্যায়াম হয়। আর জামাতে নামায পড়ার সময় মসজিদে যাওয়া-আসার সময় হাঁটার মাধ্যমে যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। এই ব্যায়াম শরীরের জন্য উপকারি, হাড়ের প্রতিটি জোড়া, চোখ, ঘাড়, রক্তনালি ও হৃৎপিন্ডের জন্য ভালো। বিকেলে ব্যায়াম করার চেয়ে সকালে ব্যায়াম করার সুবিধা একটু বেশি। সারারাত ঘুমানোর কারণে শরীরের পেশীগুলো একটু শিথিল হয় এবং ব্যায়ামের জন্য বেশি উপয়োগী হয়। পক্ষান্তরে বিকালে পেশীগুলো থাকে বেশি ক্লান্ত। ব্যাস্ত জীবনে বিকালে ব্যায়াম করার জন্য সময় বের করা খুবই কষ্ট সাধ্য। সকালের বাতাস থাকে নির্মল। ধুলা-বালি এবং ক্ষতিকর গ্যাস থাকে খুবই কম। এরূপ বাতাস শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

সারারাত অভূক্ত থাকার ফলে সকালে আমাদের শরীরে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যায়। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলে সকাল সকাল নাস্তা করার মাধ্যমে দ্রুত শরীরের খাদ্যের অভাব পূরণ হয়। অপর দিকে দেরিতে ঘুম থেকে উঠলে নাস্তা করার জন্য বেশি সময় পাওয়া যায়না। অল্প নাস্তা করেই তাড়াহুড়ো করে বাইরে বেরিয়ে পড়তে হয়। ফলে শরীর ব্যবহার করে শরীরের জমে থাকা শক্তি। আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। সকালে উঠলে এ সমস্যাগুলো হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠা স্বাস্থের জন্য খুবই উপকারী। এ ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

সকালের নির্মল পরিবেশে ফজরের নামাযে আধ্যাত্মিক চেতনায় মন ভরে উঠে। আত্মতৃপ্তিতে মন পরিপূর্ণ হয়। ফলশ্রুতিতে, মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে। সকালে ঘুম থেকে উঠলে আমরা আল্লাহর অদেশ পালনের পাশাপাশি এসব স্বাস্থ্য সুবিধা পেতে পারি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মু'মিন মহিলারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফজরের নামায পড়তেন, তারপর সর্বাঙ্গে কাপড় জড়িয়ে ঘরে ফিরতেন। (তখনও এরূপ অন্ধকার থাকতো যে) তাঁদের কে কেউ চিনতে পারতো না।[২৫৭]

সঠিক সময়ে জামায়াতের সহিত নামায আদায় করা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে যেমন প্রিয়, তেমনি স্বাস্থ্যকর ও বটে। ফজরের নামায জামায়াতের সাথে আদায় করতে হলে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয়। সুতরাং ইসলাম সকালে ঘুম থেকে উঠাকে ফরজ করেছে।

রোযা রাখার স্বাস্থ্যোপকার

চন্দ্র বৎসরের বার মাসের মধ্যে শুধু 'রামযান' মাসের নাম পবিত্র কুরআনে সূরা 'আল বাকারায়' উল্লেখ রয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ উল্লেখ করেন, রমজান মাস এমন একটি মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, আর এই কুরআন মানব জাতির জন্য পথের দিশা। মানুষের জন্য সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাসটি পাবে, সে এই মাসে রোযা রাখবে।[২৫৮]

তাছাড়া 'সিয়াম' শব্দটি মোট চৌদ্দবার কুরআন মাজীদে সূরা আল বাকারা, আন নিসা, আল মায়িদা, মরিয়ম, আল আহযাব ও মুজাদালাহ্ এই ছয়টি সূরায় প্রয়োগ দেখা যায়। তবে সিয়ামের বিধান সম্বলিত আয়াতগুলোর একত্র সমাবেশ ঘটেছে সূরা আল-বাকারায়। তাছাড়া সহীহ্ হাদীস গ্রন্থগুলোতে সিয়ামের মাহাত্ম্য, মর্যদা ও বিধি-বিধান সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। আদম (আঃ) হতে নূহ (আঃ) পর্যন্ত প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে সিয়াম ফরয ছিল। একে বলা হয় 'আইয়ামে বীয' এর রোযা। ইহুদীদের প্রতি সপ্তাহে শনিবার, বছরের মধ্যে মুহর্‌রমের ১০ম তারিখে এবং হযরত মূসা (আঃ) এর পর্বতে ৪০ দিন সিয়াম পালনের স্মৃতি স্মরণে ঐ ৪০ দিন সিয়াম পালনের নির্দেশ আছে। মহর্‌রমের আশুরার রোযার কারণ হলো হযরত মূসা (আঃ) এর শুকরিয়ার সিয়াম। সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'পাশবিক প্রবৃত্তি দমন'। তাই এর মাধ্যমে তা সম্ভব বলে যুগে যুগে নবী রাসূল ওহী লাভের প্রাক্কালে সিয়াম পালন করতেন। হযরত ঈসা (আঃ) ইঞ্জীল প্রাপ্তির পূর্বে দীর্ঘ ৪০ দিন সিয়াম পালন করেছিলেন। ইহুদী ও খৃষ্ঠানদের উপর যে ৪০ দিন সিয়াম ফরজ তাকে ইংরেজীতে লেন্ট (Lent) বলা হয়। অবশ্য খৃষ্টানদের খুব কম লোকেই এ সিয়াম পালন করে থাকেন। হিন্দুরা প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১১ ও ১২ তারিখ শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী ও দ্বাদশীর উপবাস ব্রত পালন করেন। কোন কোন হিন্দু কার্তিক মাসের প্রতি সোমবার উপবাস করে থাকেন। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের জৈন ধর্মবলম্বীরা প্রতি বছর কয়েক সপ্তাহ ধরে উপবাস পালন করেন। প্রাচীন

---

[২৫৭] প্রাগুক্ত, ৫ম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪২, হাদীস নং ১৩৪২

[২৫৮] شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(আল-কুরআন ২ : ১৮৫)

Dhaka University Institutional Repository

মিসরীয়দের মাঝেও ঠিক অন্যান্য ধর্মের আনন্দ উৎসবের মত উপবাস পালন করার প্রথা চালু ছিল।[২৫৯]

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকার 'সিয়াম' প্রবন্ধের লেখক লিখেছেন, 'এমন কোন ধর্ম আমাদের স্মরণে আসে না, যার ধর্মীয় নিয়ম নীতির মাঝে অবশ্যই উপবাসকে অন্তভূক্ত করা হয়নি'। আরো বলেছেন, প্রকৃতই উপবাস ধর্মীয় কর্মকান্ড হিসাবে সকল ধর্মের মাঝেই বিদ্যমান আছে। উপরোক্ত বিশ্লেষণের পর মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন মজিদে নির্দেশ দিয়েছেন, হে মুমিনরা! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়ে ছিল, যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পার।[২৬০]

এই মাসের মর্যাদা এই জন্যে বেশী যে পবিত্র কুরআন, ইব্রাহীম (আঃ) এর সহীফা, দাউদ (আঃ) এর যবুর, মূসা (আঃ) এর তাওরাত এবং ঈসা (আঃ) এর ইঞ্জীল এই রমযান মাসেই অবতীর্ণ হয়।

ঈসা (আঃ) এর মাতা মরিয়ম সিয়াম পালন করতেন।[২৬১]

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের দ্বিতীয় সালে মুসলমানদের উপর এক মাস সিয়াম ফরয করা হয়। ধন ও মালের যেমন যাকাত আদায় করতে হয় ঠিক তেমনি সিয়াম শরীরের যাকাত স্বরূপ। 'প্রত্যেক বস্তুর যাকাত (পরিশোধক) রয়েছে, আর দেহের যাকাত হলো সিয়াম'। সিয়াম দ্বারা মানুষ শারীরিক মানসিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করবে এটাই ইসলামের শিক্ষা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মায়া, মাৎসর্য এই ষড় রিপুকে নিয়ন্ত্রিত করাই সিয়ামের বিশেষ উদ্দেশ্য। এই ষড় রিপুই মানুষের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। ষড় রিপু দমন করা ইসলামের শিক্ষা নয় বরং এ গুলোকে নিয়ন্ত্রিণ করাই ইসলামের শিক্ষা।[২৬২] এই রিপু দমনের জন্যে খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ না করে বা সংসার ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে বাস করবার মত কষ্টসাধ্য রীতি চালু আছে। ইসলাম ষড় রিপুকে বস্তুত শরীরের দাবী বলে স্বীকার করে কিন্তু এর দমন নয় বরং শরীয়তের সীমার মধ্যে এর নিয়ন্ত্রণ করাই কর্তব্য বলে মনে করে।

মানব জীবনের ৪টি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা (Basic needs) তা হলো :

* ক্ষুধা নিবারণের চাহিদা
* পিপসা নিবারণের চাহিদা
* বিশ্রাম (নিদ্রা) গ্রহণের প্রবনতা ও
* কাম বাসনার চাহিদা।

এগুলোর ন্যায় সংগত চাহিদা পূরণের দ্বারা মানব জীবন সুন্দর মার্জিত ও উৎকর্ষ-মন্ডিত হয়। এগুলোর চরম স্বল্পতা জীবনকে স্থবির, পঙ্গু ও অর্থব করে দেয়। আবার এ সবের ব্যাপারে অত্যধিক বাড়াবাড়ি জীবনকে লাগামহীন ও বেপরোয়া করে তোলে এবং পশুত্বের দিকে ঠেলে দেয়। ইসলাম এ চারটি মৌলিক চাহিদার বিজ্ঞান সম্মত ও ন্যায় সংগত বাস্তবায়নের দ্বারা মানব চরিত্রকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে আগ্রহী এবং এ কাজে সিয়ামের ভূমিকা সর্বাধিক। অথচ মুসলিম সমাজের এক শ্রেণীর

---

[২৫৯] ড. দেওয়ান আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

[২৬০] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ আল-কুরআন ২ : ১৮৩

[২৬১] فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا (আল-কুরআন ১৯ : ২৬)

[২৬২] ড. দেওয়ান আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যাক্তিগণ সিয়ামকে অস্বীকার করে এবং উহা পালন করে না। তারা সিয়ামের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও শারীরিক কোন প্রকার উপকারিতাই দেখে না। এজন্য সিয়ামের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা অর্থাৎ দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মনে এর বৈজ্ঞানিক প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্তই দরকার।

প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানদের জন্য রোযা একটি ফরজ ইবাদত। সারা দিন রোযা রাখা আপাত দৃষ্টিতে বেশ কষ্টকর একটি ইবাদত এবং মনে হতে পারে যে সারা দিন না খেয়ে থাকার ফলে শরীরের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এমন কোন ইবাদতের বিধান রাখেননি যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। বরং খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, সবই নির্ধরণ করেছেন আমাদের উপকারের জন্যই। রোযা রাখা স্বাস্থ্যের জন্য অপকারী নয় বরং উপকারীই বটে। তবে আমরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়ার জন্য রোযা রাখিনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ফরয হুকুম পালনের জন্য রোযা রাখি। তারপরও রোযা রাখলে স্বাস্থ্যগত অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। নিচে রোযা রাখার কয়েকটি স্বাস্থ্যগত উপকারের কথা উল্লেখ করা হলো।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী, স্বাস্থ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থ্যতা; শুধু কোন রোগ বা অক্ষমতার অনুপস্থিতিই নয়। অর্থাৎ কোন ব্যাক্তির শরীরে কোন রোগ বা অক্ষমতা না থাকলেই যে তিনি স্বাস্থ্যবান বা সুস্থ, তা ঠিক নয়। সুস্থ হতে হলে তাঁকে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে হবে। এর সাথে আধ্যাত্মিক দিকের কথাও বলা হয়। কিভাবে আমরা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ থাকতে পারি? শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর খাবার, ব্যায়াম, বিশ্রাম ইত্যাদি। মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের জন্য চায় সুস্থ শরীর, সুস্থ সমাজ। রোযা কি আমাদের সুস্থ থাকতে সহায়তা করে? রোযা স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কতৃক দেওয়া স্বাস্থ্যের সংজ্ঞার সব দিকই অর্জন করতে রোযা আমাদের সহায়তা করে।

শারীরিক দিক

পবিত্র রমজান মাসের ৩০ দিন বা ২৯ দিন সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার থেকে বিরত থেকে রোযা রাখতে হয়। রোযা রাখার ফলে খাদ্যনালী একটু বিশ্রাম পায়। বছরে একবার এই রমযান মাসেই কেবল এই সুযোগটা পাওয়া যায়। রোযা রাখার জন্য স্বাদ গ্রন্থি ১৪-১৫ ঘন্টা বিশ্রামের কারণে সন্ধ্যায় ইফতারির কী মজাই না পাই! সারা দিন রোযার শেষে খাদ্যনালীর রস নব উদ্যমে কাজ করতে পারে। শরীরের বাড়তি ওজন নানা রোগের কারণ। রোযা শরীরের বাড়তি ওজন জনিত অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। রোযা রাখলে রক্তের চিনির পরিমাণ কমে। সুতরাং ডায়াবেটিসে রোযা বেশ উপকারী। ডায়াবেটিস রোগীদের রোযা রাখার ব্যাপারে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। চিকিৎসকের পরামর্শমত ওষুধ ব্যাবহার করে ও নিয়ম মেনে রোযা রাখলে ডায়াবেটিস রোগীদেরও তেমন সমস্যা হয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে কেহ যদি এমন রোগাক্রান্ত হয় যে, যদি রোযা রাখে তবে রোগ বেড়ে যাবে, রোগ দুরারোগ্য হয়ে যাবে, অথবা জীবন হারাবার আশঙ্কা হয়, তবে তার জন্য রোযা না রেখে আরোগ্য লাভের পর রোযা কাযা করা দুরস্ত আছে। যখন কোন মুসলমান দিনদার চিকিৎসক সার্টিফিকেট দেবেন যে, রোযা রোগীর ক্ষতি করবে, তখন রোযা ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

জায়েয হবে। রোযা রাখার ফলে রক্তে চর্বি কমে। আর চর্বি কমলে হৃদরোগ ও উচ্চরক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনাও কমে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য রোযা খুবই উপকারী। রোযার মাসে রাতে তারাবিহ্‌র নামায পড়তে হয়। হেঁটে মসজিদে গিয়ে এশা ও তারাবিহ্‌র নামায পড়ায় শরীরের যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। মসজিদে যাওয়া-আসার সময় হাঁটার মাধ্যমে ব্যায়াম এবং নামায পড়ার সময় নামাযের মাধ্যমে ব্যায়াম। তারাবিহ্‌র নামাযের সময় শরীরের যে ব্যায়াম হয়, তা শরীরকে ফিট রাখতে সহায়তা করে। মোটামুটি দীর্ঘ সময় ধরে তারাবিহ্‌র নামায আদায়ের ফলে, শরীরের মাংসপেশী ও হাড়ের জোড়ার ব্যায়াম হয়। অস্থি, সন্ধি অধিকতর কর্মক্ষম হয়। শরীর থাকে ফিট। নামাযের কারণে হাড়ের ঘনত্ব বাড়ে। মাংসপেশী ও হৃদপিন্ডে রক্ত সরবরাহও বেড়ে যায়। হৃদপিন্ডে ও ফুসফুসে কর্মক্ষমতাও বাড়ে।[২৬৩] শরীরের বাড়তি ওজন কমাতেও তারাবিহ্‌র দীর্ঘ নামায বেশ কার্যকর। তারাবিহ্‌র নামাযের সময় বিশ রাকাতে কিয়াম, রুকু, সিজদা, বৈঠক ইত্যাদির বাড়তি পরিশ্রমের জন্য ইফতার ও সন্ধা রাতের খাবার শরীরে ব্যবহৃত হতে পারে। খাবার থেকে শক্তি আহরিত হতে পারে শরীরে। প্রতি রাকাত নামাযে বেশ কয়েক ক্যালরি শক্তি খরচ হয়। এতে করে সাহরীতে পর্যাপ্ত ক্ষুধা লাগে, খাওয়ার ইচ্ছাটা স্বাভাবিক থাকে।

মানসিক দিক

রোযা মানসিক প্রশান্তি অর্জনে সহায়তা করে। আল্লাহর জন্য রোযা রাখা হয়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রয়াসে মন তৃপ্তিতে ভরে যায়। মানসিক প্রশান্তি আসে। মসজিদে মসজিদে খতম তারাবিহ্‌ হয়। খতম তারাবিহ্‌র দীর্ঘ সময় কুরআন তেলাওয়াত হয়। কুরআন তেলাওয়াত শুনেও মনে প্রশান্তি আসে। রোযা রাখার মাধ্যমে মানসিক অবস্থা, চিন্তা ও আচরণ উন্নত হয়। দুশ্চিন্তা ও হতাশা কমে। আত্মশক্তি বাড়ে। ক্রোধ দমন ও সংযমী হতে রোযা যথেষ্ট সহায়ক। কেউ ঝগড়া করতে চাইলেও সংযমী হয়ে ক্রোধ দমনের উপায় হিসাবে বলতে হয়, 'আমি রোযাদার'। স্বাস্থ্যের জন্য অপকারী অভ্যাস বা বদ-অভ্যাস যেমন, ধুমপান, পান ও জর্দা পাতা ইত্যাদি বর্জনে রোযা অত্যান্ত সহায়ক। সারা দিন তো রোযাই থাকা হয়। পানাহার থেকে বিরত হওয়ার পাশাপাশি ধুমপান থেকেও বিরত থাকতে হয়। রাতে ইফতারের পর থেকে সাহরী পর্যন্ত অল্প সময় ধুমপান না করলে এক মাসেই ধুমপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করা সম্ভব।

সামাজিক দিক

সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে বসে ইফতার করার একটা রেওয়াজ আছে। পরিবারের লোকজনের সাথে তো বটেই, পরিবারের বাইরের লোকজনের সাথেও। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব একসঙ্গে খেলে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় হয় এবং বন্ধুত্ব বাড়ে। রমযান মাসের তারাবিহ্‌র নামাযের সময় এলাকার সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত হয়, কুশল বিনিময় হয়। এতে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

---

[২৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক দিক

তারাবিহ্‌র নামাযের আগে বয়ান ও তারাবিহ্‌তে ত্রিশ পারা কুরআন শোনায় মনে পরিবর্তন হয়। আধ্যাত্মিক চেতনায় মন ভরে উঠে। সুতরাং রোযা আমাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ থাকতে নিশ্চিত ভাবে সহায়তা করে। আল্লাহর হুকুম পালন করার মাধ্যমে পবিত্র মাহে রমযানের রোযা রেখে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি আমরা যেন রোযা থেকে স্বাস্থ্য সুবিধা লাভ করতে পারি, আল্লাহ আমাদের সে তওফিক দান করুন। আমীন।

রমযানের খাবার-দাবার

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র রমযান মাসে প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য রোযা রাখাকে ফরয বা অবশ্য পালনীয় ইবাদত হিসেবে নির্ধরিত করেছেন। এ মাসের প্রতিদিন সুবহে সাদেকের পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থেকে রোযা রাখতে হয়। খাবার খেতে হয় রাতে। দীর্ঘ সময় পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয় বলে রাতে যে খাবার খাওয়া হয়, তা হওয়া চাই স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর। এটি সুষম ও পরিমিতও হওয়া চাই। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে রমযানে সুষম খাদ্য গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোযার মাসের খাবার অন্যান্য মাসের খাবার থেকে যে একেবারেই ভিন্ন হবে, তা কিন্তু নয়। হওয়া উচিতও নয়। এ মাসের খাবার-দাবার অন্যান্য মাসের খাবার-দাবারের মতোই হবে। এ মাসে প্রতি রাতে সাধারণত তিন বার খাওয়া হয়। সূর্যাস্তের সাথে সাথেই করা হয় ইফতার। মাগরিবের নামাযের একটু পরেই খাওয়া হয় সন্ধ্যারাতের খাবার। আর শেষরাতে খাওয়া হয় সাহ্‌রী। যাদের শরীরের ওজন বেশী বা স্বাভাবিক, রমযানে বেশী খাবার খেয়ে তাদের ওজন যেন না বাড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর যাদের ওজন কম বা স্বাভাবিক, তাদের খেয়াল রাখতে হবে রমযানে ওজন যেন বেশী না কমে। সারা দিন রোযার শেষে শরীর থাকে ক্লান্ত, শক্তি থাকে কম। ইফতারের সময় শরীর, বিশেষ করে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকোষ, খাবারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক শক্তির যোগান পায়। ইফতারের দু-একটা খেজুর ও একটু শরবত সে শক্তির জোগান দিতে পারে। সাথে পেঁয়াজু, ছোলা, মুড়ি, শসা শরীরের অন্যান্য চাহিদা মেটায়। তবে মিষ্টি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার এবং বেশি মসলাযুক্ত খাবার ও ভাজাপোড়া খাবার পরিমাণে কম হওয়া চাই।

ইফতারের সময় একসঙ্গে বেশি খাওয়া উচিত নয়। মাগরিবের নামাযের পর সন্ধ্যারাতের খাবারে ভাত বা রুটি প্রচুর সবজি, দু-এক টুকরা মাছ বা মাংস, দুধ ও ফল থাকা চাই। সারাদিন রোযা রাখার কারণে শরীরে পানির কিছুটা ঘাটতি দেখা দেয়। এ ঘাটতি পূরণ করার জন্য ইফতার ও ঘুমানোর মধ্যবর্তী সময়ে প্রচুর পানি পান করতে হবে। সাহরীতে একটু কম খবার খাওয়াই ভালো। একটু দেরিতে হজম হয়, সাহরীতে এরূপ খাবার গ্রহণ করাই শ্রেয়। দেরিতে হজম হয় এরূপ খাবারের মধ্যে আছে কম ছাঁটা চাল, আটা, ডাল, মাংস ইত্যাদি। আর দ্রুত হজম হয় এরূপ খাবারের মধ্যে আছে চিনি, মিষ্টি, ময়দা ইত্যাদি। খাবারের তালিকায় আঁশযুক্ত খাবারও থাকতে হবে। আঁশযুক্ত খাবারের মধ্যে আছে আটা, সিমের বিঁচি, ছোলা, শাক-সব্জি, ফল ইত্যাদি। শরীরের খনিজ লবণের অভাব পূরণের জন্য শাক-সব্জি ও ফল-মূল দরকার। খেজুরে ও কলায় আছে শর্করা, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম। শসা পানি ও খনিজ লবণের চাহিদা মেটায়। সাহরীতে পানি পান করতে হবে বেশি। সব মিলিয়ে বলা যায়, রমযান মাসে পরিমিত সুসম খাবার খেতে হবে, পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচুর শাক-সব্জি ও ফল-মূল খেতে হবে। অন্যদিকে অতিভোজন, অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার, অতিরিক্ত চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার এবং ধুমপান পরিহার করতে হবে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাত্না

পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ থেকে ত্বক ছেদন করাকে খাত্না (circumcision) বলে যা মুসলমান ছেলেদের জন্য সুন্নাত। আমাদের দেশে কোথাও স্থানীয় ভাবে একে 'মুসলমানী' বলে থাকে। সর্ব প্রথমে খাত্না করেছিলেন নবী ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসসালাম।

খাত্নার ব্যাপারে জনৈক শৈল্য চিকিৎসাবিদের (Surgical specialist) অভিমত হচ্ছে Apparently circumcision did not originate among the Jews. They took the custom from either the Babylonians or the Negroes, Probably the later. It has been, Practiced in west Africa for over 5,000 years. (Bailey and Love's short Practice of surgery) অর্থাৎ : স্পষ্ট রুপে খাত্না রীতিটা ইহুদীদের মধ্যে থেকে উদ্ভব হয়নি। তারা এই প্রথাটি গ্রহণ করেছিল হয় ব্যাবিলনীদের নিকট থেকে, না হয় নিগ্রোদের নিকট থেকে, সম্ভবত শেষেরটি থেকে। পাঁচ হাজার বছর পূর্ব থেকে এই রীতিটা পশ্চিম আফ্রিকাতে অনুশীলন হয়ে আসছে।[২৬৪]

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুরুষের খাত্না করার পিছনে কি কি যুক্তি ও অভিমত আছে তা ব্যাখ্যা করার পূর্বে আমরা প্রথমে দেখে নিতে চাই ইসলামের দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব আছে কতটা। কেননা ইসলামের সব কয়টি বিধানই বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। আর জীবন যাপনের সঠিক পন্থা সমূহ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন হয়েছিল।

ইসলামের দৃষ্টিতে খাত্না

খাত্না প্রথা পয়গম্বর ইবরাহীম (আঃ) থেকে আরম্ভ হয়ে[২৬৫] আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রচলিত থাকবে ইনশায়াল্লাহ। পুরুষের জন্যে খাত্না করা সুন্নাত এবং স্বাস্থ্য সম্মতও বটে। ইসলাম এই খাতনার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়নি তবে তা বয়ো-প্রাপ্ত হওয়ার পুর্বেই করা উচিত। এ ব্যাপারে দু'টি হাদীস নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষের স্বভাবগত বিষয় হল পাঁচটি। খাত্না করা, নাভীর নিচের পশম কামানো, বগলের পশম উপড়ানো, গোপ কাটা এবং (অতিরিক্ত) নখ কাটা।[২৬৬]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ) ৮০ (আশি) বছর বয়সের পর 'কাদ্দুম' নামক স্থানে নিজেই নিজের খাত্না করেন। কুতাইবা (র) অবুয যিনাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন 'কাদ্দুম' একটি স্থানের নাম।[২৬৭]

---

[২৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

[২৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

[২৬৬] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, খন্ড ৯ম, অনুমতি চাওয়া অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ২৬১১, হাদীস নং ৫৮৬০

[২৬৭] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৮৬১

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খাত্না

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে খাত্না করা বা পুরুষাঙ্গের ত্বক ছেদনকে অতি প্রয়োজনীয় কাজ বলে অভিহিত করেছে এবং এর উপকারিতার স্বপক্ষে সুদৃঢ় মত প্রকাশ করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, খাত্না করলে অনেক গুরুত্বর ব্যাধি থেকে রেহায় পাওয়া যেতে পারে। 'Bailey and loves short Practice of Surgery' নামক সার্জারী বইতে ১২৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, Circumcision correctly performed soon after birth confers almost total immunity against carcinoma of the penis. On the other hand (and this is difficult of explanation) circumcision after early infancy does not provide the same degrce of protection. For practical purposes, then, carcinoma of the penis occurs only in men who have not been circumcised in early infancy. অর্থাৎ : জন্মের পরক্ষণেই যদি ঠিকমত খাত্না করানো হয় তা হলে পুরুষাঙ্গে ক্যান্সার রোগ হবে না, অপর পক্ষে (এবং এ ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন) শৈশবের পরে খাত্না করলে অনুরূপ সমান ফল পাওয়া যাবে না। কার্যতঃ পুরুষাঙ্গের ক্যান্সার ঐ সমস্ত লোকদেরই হয় যারা শৈশবের পূর্বে খাত্না করেনি।[২৬৮]

বর্তমান কালের চিকিৎসাবিদদের অভিমত হচ্ছে ছেলে জন্ম গ্রহণের পরেই খাত্না করে দিতে হবে, সে যে কোনো ধর্মেরই হউক না কেন। পশ্চাত্যের হাসপাতল ও মাতৃসদনগুলোতে ছেলে সন্তান প্রসব করার পরে বাধ্যতামূলক ভাবে খাত্না করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতের বিশিষ্ট শৈল্য চিকিৎসাবিদ অধ্যাপক ডাঃ কে দাস তাঁর 'Clinical Methods in Surgery' বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেন : Mohammedans owing to their religious custom of compulsary circumcision in infancy will naturally not suffer from phimosis, paraphimosis and sub-prepucial infection. Carcinoma of the penis is said to be less common in them. possibly for the same reason. অর্থাৎ : শৈশবকালে খাত্না করানো মুসলামানদের ধর্মীয় রীতিতে বাধ্যাতামুলক বলে স্বাভাবিকভাবে তারা ফাইমুসিস, প্যারা-ফাইমুসিস এবং সাব-প্রিপুসিয়াল প্রদাহ প্রভৃতি রোগে ভোগেনা। সেজন্যে পুরুষাঙ্গে ক্যান্সার তাদের বেলায় খুব একটা দেখা যায় না।

পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের ত্বকের ভিতরে এক প্রকার রস অনবরত নির্গত হয়, তাকে বলা হয় স্মেগমা (smegma). চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে এই স্মেগমা রস পুরুষাঙ্গে নানাবিধ রোগ এমনকি ক্যান্সার সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। যদি কোন মহিলার স্বামীর খাত্না না করানো থাকে তবে ঐ মহিলার জরায়ুর মুখে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে (Gynaecology) সমস্ত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞগণ যথার্থই বলেছেন, Rarity of the disease (Carcinoma of the cervix) in Muslims and Jewes অর্থাৎ : মুসলমান ও ইহুদী মহিলাদের জরায়ুর মুখে ক্যান্সার খুবই কম হয়।[২৬৯]

---

[২৬৮] ড. দেওয়ান আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫

[২৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬

Dhaka University Institutional Repository

খাত্না না করলে যে সমস্ত রোগ হয়

পুরুষের শৈশবে খাত্না না করানোর জন্যে যেসব রোগ হতে পারে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. সাব-প্রেপুসিয়াল প্রদাহ (Sub – prepucial inf ection) : পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে অবস্থিত বাড়তি চামড়ার (Prepuce) ভিতরে প্রদাহ হয় এবং তা একিউট অথবা ক্রনিক হতে পারে।

২. ফাইমুসিস (phimosis) : পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের অবস্থিত বাড়তি চামড়া প্রদাহ যখন দীর্ঘায়িত (Chronic) অথবা আকস্মিক (*Acute*) হয় তখন এই রোগ হয়ে থাকে। এতে প্রস্রাবের নালির বহির্ভাগ ঐ বাড়তি চামড়া আবৃত করে একেবারেই বন্ধ করে ফলে প্রস্রাব করতে মারাত্মক অসুবিধা হয়। প্রস্রাব বের হতে না পারাতে পুরুষাঙ্গের মাথা বেলুনের মতো ফুলে যায় এবং তীব্র ব্যথা হয় তখন হাসপাতালে নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে খাত্না করানো হলে রোগী উপশম পায় এবং ভালো হয়ে যায়।

৩. প্যারা-ফাইমুসিস (*Para – hpimosis*) : পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের বাড়তি চামড়া হঠাৎ করে আটসাট হয়ে এবং পিছনের দিকে সরে এসে আটকিয়ে যায় কিন্তু পূর্ব অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। এতে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের পিছনের দিক অর্থাৎ গোড়া সংকুচিত হয়ে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ফুলে ফেঁপে যায় এবং ব্যাথা হয়। এটা আমাদের দেশে স্থানীয় ভাবে কোথাও বলে গায়েবী খাত্না। প্রকৃত পক্ষে কোনো খাত্না নয় বরং একটি রোগ। উক্ত রোগটি দেখতে খাত্নার মতো তাই লোকেরা বিশেষ করে অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এটা মনে করে থাকে। এরূপ ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখানো উচিত অথবা হাসপাতালে নিয়ে খাত্ন করানো উচিত। তা ছাড়া এর চিকিৎসা ও হচ্ছে খাত্না করানো। অনেক সময় কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয় না এবং সে ক্ষেত্রে কোন চিকিৎসারও প্রয়োজন হয় না। এরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটে থাকে।

৪. গ্রপুসিয়ালের পাথর (prepucial calculi): শৈশবে খাত্না না করালে বুড়ো বয়সে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়ার ভিতরে পাথর হতে পারে সাধারনত : তিন প্রকারের পাথর দেখা যায়।

- শুধু স্মেগমা হতে পাথর তৈরি হতে পারে।
- স্মেগমা ও প্রস্রাবের লবনের সঙ্গে মিশেও পাথর হতে পারে।
- শুধু প্রস্রাবের লবণের দ্বারা পাথর তৈরি হতে পারে।

চিকিৎসা হলো সার্জনের পরামর্শ অনুযায়ী খাত্না করা।

৫. ব্যালানু পস্থাইট্রিস (Balano posthitis) : পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের বাড়তি চামড়ায় প্রদাহ হলে তাকে পস্থাইটিস বলে এবং শুধু পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে প্রদাহ হলে তাকে ব্যালানইটিস বলে। সাধারণত: উভয় প্রদাহ এক সাথে সংঘটিত হয় বলে এই রোগের নাম একত্রে ব্যালানু পস্থাইটিস বলা হয়।

৬. লিউকুপ্লাকিয়া (Leukoplakia of the glans penis)

৭. পিনাইল প্যাপিলুমা (Penile papilloma)

Dhaka University Institutional Repository

৮. পুরুষাঙ্গে প্যাজেটস্ রোগ (Paget's disease of the penis)

৯. পুরুষাঙ্গে ক্যান্সার (Carcinoma of the penis)

খাত্না না করলে এইড্সে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি

খাত্না না করা ভারতীয়দের এইচ আই ভি ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খাত্না করেছে এমন লোকদের তুলনায় আটগুণ বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ২৯৮ জন ভারতীয় নাগরিকের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল প্রকাশ করেছে। ভারতের পুনাই এ অবস্থিত একটি হাসপাতালে যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এইচ আই ভি-১ জীবাণুতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় একটি বড় মাপের গবেষণা করেছে। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে ইনফেকশাস ডিজিজেস সোসাইটি অফ আমেরিকার ৪১তম সভায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রধান স্টিভেন রিনল্ড এই ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন। এই গবেষণাটিতে ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ২ হজার ২৯৮ জন এইচ আই ভি-১ আক্রান্ত রোগীর ওপর পরীক্ষা চালানো হয়।[২৭০]

ইসলাম যে জীবন বিধান দিয়েছে তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানানু তা'আলা ঘোষণা করেছেন সূরা ইয়াসিনে, অর্থাৎ : শপথ বিজ্ঞানময় কোরআনের।[২৭১]

এ ছাড়া এটাও প্রমানিত হয় যে ইসলাম বিজ্ঞানের জয়-যাত্রাকে উৎসাহ দিয়েছে। আল-কুরআনে সুরা আল-বাকারার ২৬৯ নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে যে, অর্থাৎ: এবং যাকে হিকমত (জ্ঞান) দেয়া হয়েছে তাকে অনেক কল্যাণ ও দান করা হয়েছে।[২৭২]

পক্ষান্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যাবতীয় কাজ-কর্ম, নির্দেশ ও অনুমতি প্রভৃতি সম্পূর্ন বিজ্ঞান ভিত্তিক। তাঁর আচার-আচরণ, রীতি-নীতি এবং প্রদত্ত আদেশ নিষেধই হচ্ছে উত্তম আদর্শ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন, অথাৎ : (হে মুসলমানেরা) তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রসূলের (জীবনের) মাঝে অনুকরণ যোগ্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। (আদর্শ রয়েছে) এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের মুক্তির আশা করে, (সর্বোপরি) যে বেশি পরিমাণে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে।[২৭৩]

সুতরাং খাত্না একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এবং সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক কাজ। একে কোনো মতেই অবহেলা বা কম গুরুত্ব দেয়া উচিৎ নয়। এটা যে স্বাস্থ্য সম্মত তা আজ সর্বজন স্বীকৃত।

আখেরী নবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের সপ্তম দিনে দাদা আব্দুল মোত্তালেব যথা নিয়মে তাঁহার খাত্না করিয়েছেন। তবে এরূপ দুই একটি ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটে, যাদের খাত্না করার বা মুসলমানী দেয়ার প্রয়োজন হয় না। একে এদেশের মুসলমানেরা খোদাই খাত্না বলে উল্লেখ করে থাকে।

---

[২৭০] প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮

[২৭১] وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (আল-কুরআন ৩৬ : ২)

[২৭২] يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ (আল-কুরআন ২ : ২৬৯)

[২৭৩] لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (আল-কুরআন ৩৩ : ২১)

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসা এবং সংযম

চিকিৎসা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিপরীতধর্মী খেয়াল দেখা যায়। কিছু সংখ্যক লোক রোগ নিরাময়কে শুধু মাত্র ঔষধপত্র ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করে। আর কিছু লোক আছে যারা কোন কোন সময় কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে ঔষধপত্রকে অনর্থক মনে করে। বরং সেক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিকে উপকারী ও যথেষ্ট মনে করে থাকে। কিছু লোক এমনও আছে যারা ঔষধপত্রকে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী মনে করে। তবে এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম।

ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কী? আল্লাহ তা'আলার শেষ নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্পর্কে কি শিক্ষা দিয়েছেন? ঔষধপত্র ও চিকিৎসা থেকে বিরত থাকা এবং ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন? এ সকল প্রশ্নের জবাবের জন্য নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

চিকিৎসা গ্রহণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসা গ্রহণের জন্য চিকিৎসকের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ঔষধ-পত্র ব্যবহারের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় বরং এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃত সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ এমন কোন রোগ অবতীর্ণ যার নিরাময়ের উপকরণ সৃষ্টি করেন নি।[২৭৪]

রোগমুক্তি ঔষধের নিজস্ব গুণ বা ক্ষমতা নয়। আল্লাহ তা'আলা ঔষধের মধ্যে রোগ মুক্তির বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দেওয়াতে রোগ মুক্তি হয়। আল্লাহর ইচ্ছাই শুধু মাত্র ঔষধ রোগ মুক্তির কারণ হতে পারে। যদি তিনি ইচ্ছা না করেন তবে কোন ঔষধই কার্যকরী হয় না, এমনকি চিকিৎসক সঠিক ঔষধ নির্বাচনই করতে পারে না। যখন মানুষের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন অভিজ্ঞ ডাক্তারও বোকা বনে যায়।

ব্যাধি ও প্রতিকার

স্বাস্থ্য সুরক্ষা সর্ম্পকিত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা মূলক কয়েকটি মূল্যবান হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আবূ হুরায়রাহ (রা:) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কালোজিরায় মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে।[২৭৫]

আবূ সাইদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

[২৭৪] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৭২, হাদীস নং ৫২৭৬

[২৭৫] প্রাগুক্ত,পরিচ্ছেদ ২২৭৮, হাদীস নং ৫২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

বললেন, 'তাকে মধুপান করাও। দ্বিতীয়বার আসলে তিনি বললেন, তাকে মধুপান করাও। তৃতীয়বার আসলে তিনি বললেন, তাকে মধুপান করাও। এরপর পুণরায় এসে বলল, আমি অনুরূপই করেছি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ সত্যই বলছেন। কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলছে। তৎপর তাকে পুণরায় মধু পান করালে সে তা পান করল এবং তাতে তার আরোগ্য লাভ হলো।[২৭৬]

ইবনে উমার (রাঃ) এর সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্টি হয়। কাজেই তা পানির সাহায্যে নিভিয়ে দাও। না'ফি (র) বলেন, 'আব্দুল্লাহ (রাঃ) যখন বলতেন, তোমাদের উপর থেকে শাস্তিকে হালকা কর।[২৭৭]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রোগে ওফাত পান সেই রোগের সময় তিনি নিজ দেহে 'মুআব্বিযাত' (আল ফালাক ও আন নাস) পড়ে ফুঁক দিতেন। এরপর যখন রোগ তীব্র হয়ে গেল তখন আমি তদ্ধারাই তাঁর দেহের উপর ফুঁ দিতাম আর আমি তাঁর নিজের হাত তাঁর দেহের উপর বুলিয়ে দিতাম। কেননা তাঁর হাতে বরকত ছিল। রাবী বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কিভাবে ফুঁক দিতেন? তিনি বললেন, তিনি তাঁর দুই হাতের উপর ফুঁক দিতেন, এর পর সেই হাতদ্বয় দ্বারা আপন মুখমন্ডল বুলিয়ে নিতেন।[২৭৮]

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জ্বর জাহান্নামের ধূয়া হতে আসে সুতরাং তাকে পানি দ্বারা শীতল করো।[২৭৯]

রাফে বিন খাদিজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জ্বর জাহান্নামের ধূয়া হতে আসে সুতরাং তাকে পানি দ্বারা শীতল করো।[২৮০]

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের অভিমত হচ্ছে, জ্বর হলে সঙ্গে সঙ্গে মাথায় পানি অথবা বরফসহ ব্যাগ (Icebag) দিয়ে বা সমস্ত শরীরে বরফ বা পানি দিয়ে মুছে ফেলা একান্ত কর্তব্য। অতএব দেখা যায় আজ হতে প্রায় পনেরশত বছর পূর্বে নবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতিকে যে শিক্ষা দিয়েছেন একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করেছে। অতএব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী অবশ্যই চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন রোগ অবতীর্ণ করননি যার নিরাময়ের উপকরণ সৃষ্টি করেন নি।[২৮১]

শির্কী শব্দ দ্বারা মন্ত্র পড়া হারাম। পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা ফুঁক দেওয়াই সর্বোৎকৃষ্ট মন্ত্র। পবিত্র কুরআনের আয়তের ভিতর সূরা আল ফাতিহা, সূরা আল ফালাক, সূরা আন নাস প্রভিতী দ্বারা ফুঁক দেওয়াই উত্তম। বর্তমানে সর্প দংশনের ঔষধ বেরিয়েছে এবং ফলপদ প্রমাণিত হয়েছে সুতরাং সাপে কাঁটলে ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

---

[২৭৬] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৭৫, হাদীস নং ৫২৮২
[২৭৭] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৯৯, হাদীস নং ৫৩১২
[২৭৮] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২৩০৩, হাদীস নং ৫৩২৪
[২৭৯] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৯৯, হাদীস নং ৫৩১৪
[২৮০] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৯৯, হাদীস নং ৫৩১৫
[২৮১] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

রোগ-ব্যাধি এবং এর প্রতিকার সম্বন্ধে চিকিৎসা শাস্ত্রের অভিমত হচ্ছে Prevention is better than cure. অর্থাৎ : রোগ প্রতিরোধ আরোগ্যের চেয়ে উত্তম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) রোগ প্রতিরোধের দিকে বেশী নজর দিয়েছে। দুনিয়া ব্যাপী সকল দেশে রোগ প্রতিরোধের কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। বাংলাদেশও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে চললে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা আরও ত্বরান্বিত হবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে আটটি রোগের প্রতিষেধক হিসেবে নবজাত শিশুদেরকে প্রাথমিক টিকা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং শিশুর তিন মাস বয়স থেকে দু'বছরের মধ্যে নিম্ন লিখিত রোগের প্রাথমিক টিকা অবশ্যই দেওয়া উচিত। উল্লেখ্য যে, দেশের সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকে টিকা দেওয়া হয়।

- ডিপিটি ইনজেকশন (D-Diphtheria, P-Pertussis, T-Tetanus): ডিফথেরিয়া, হুপিংকাশ ও টিটেনাস রোগের প্রতিষেধক।
- পলিও ড্রপ (Poliomyelitis): পলিও মাইলাইটিস রোগের প্রতিষেধক।
- যক্ষা (Tuberculosis): যক্ষা রোগের প্রতিষেধক ইনজেকশন।
- হাম ইনেজেকশন (Measles): হাম রোগের জন্য প্রতিষেধক।
- হেপাটাইটিস ইনজেকশন (Hepatitis): ভাইরাস জনিত লিভার প্রদাহ সহ জন্ডিস রোগের প্রতিষেধক।
- চিনেক পক্স ইনজেকশন (Chicken Pox): জল বসন্তের প্রতিষেধক।

স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ

দিনে-রাতে তিনবার খাবার, মধ্যে দু'বার সামান্য নাশতা। অতিভোজন নয় কখনো। সারাদিনের খাবারে থকতে হবে সব ধরনের পরিমাণ মতো খাবার। শর্করা, আমিষ, তেল, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি। যাকে বলে সুষম খাবার। এসব খাবার থেকে দেহ শক্তি পাবে। দেহের ক্ষয় পূরণ হবে। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়বে। খাদ্য-আঁশও থাকতে হবে খাবারে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও চিকিৎসায়, কোষ্ঠকাঠিন্য, শরীরের ওজন কমাতে, মেদভূড়ি কমাতে, খাদ্যনালি ও স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমাতে খাদ্য-আঁশ উপকারী। বাইরের খাওয়া-দাওয়া করার সময়ও ভাবতে হবে খাবারটা স্বাস্থ্যসম্মত কি না। ধুলাবালি, মাছি, অপরিচ্ছন্নতা, বাসি পচা বা নিম্ন মানের খাবার থেকে সতর্ক হয়ে খাবার গ্রহণ করতে হবে।

স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ার প্রয়োজনীয়তা

ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চা হতে হবে স্বাস্থ্যকর। হাত ধোয়া, খাওয়া, বিশ্রাম, ঘুম, দাঁত মাজা, নখকাটা, গোসল, প্রস্রাব-পায়খানা, পোশাক-আশাক সবকিছুর অভ্যাস হওয়া চাই স্বাস্থ্যসম্মত।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মিত ব্যায়ামের সুফল

নানা রকমের ব্যায়াম আছে। হাঁটা, জগিং, দৌড়ানো, সাইকেল চালানো, সাঁতারকাঁটা, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা সহ আরো কত কী! হাঁটা একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। সহজ ও মুটামুটি ঝুঁকিহীন। উপকার অনেক। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ প্রতিরোধ হবে; শরীরের মেদ কমবে। শরীর থেকে ঘামের মাধ্যমে দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায়, ফলে শরীর ও মন থাকে প্রফুল্ল। প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে ৫ দিন একটু দ্রুত (মিনিটে ১০০ কদম) হাঁটলে শরীর থাকবে ফিট। সাঁতারকাঁটা একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। এর মাধ্যমে শরীরের সমস্ত অঙ্গের ব্যায়াম হয়। যাদের সুযোগ আছে তারা এর সুফল নিতে পারেন।

দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার গুরুত্ব

শরীরের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক, রক্তের চর্বির আধিক্য, উচ্চ রক্তচাপ, মহিলাদের স্তন ক্যান্সার ইত্যাদি অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সুতরাং শরীরের ওজন রাখতে হবে সঠিক। এ জন্য একদিকে যেমন চাই পরিমিত খাবার, অন্যদিকে এ খাবার ব্যাবহারের জন্য তেমনি চাই পরিমিত ব্যায়াম। যাদের শরীর মোটা তারা একটু কম খেলে এবং বেশি পরিশ্রম করলে শরীরের ওজন কমানো সম্ভব।

অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব

যে কোন প্রকারের নেশাই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ধূমপান তার অন্যতম। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ধূমপানের কারণে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ফুসফুস, মুখ, গলা ও পাকস্থলির ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস, হাঁপানি সহ নানা রোগ হতে পারে। সুতরাং ধূমপন ত্যাগ করতে হবে এখনই। ধূমপনের মতোই মদ্যপান একটি বড় সমস্যা। শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা সমস্যা দেখা দেয় মদ পানের কারণে। শারীরিক বিভিন্ন রোগ-শোক এসে ভর করে। লিভারে চর্বি জমে, লিভারের প্রদাহ বা হেপাটাইটিস হয়। লিভার সিরোসিসের মতো জটিল রোগও দেখা দিতে পারে। ঠোঁট ও মুখ থেকে শুরু করে খাদ্যনালির বিভিন্ন অংশে মরণ ব্যাধি ক্যন্সার হতে পারে। হতে পারে পাকস্থলির প্রদাহ বা গ্যাস্ট্রাইটিস। অগ্নাশয়ের প্রদাহ বা প্যানক্রিয়াটাইটিসও হতে পারে। ওপরের পেটে প্রচন্ড ব্যাথা। রক্তের চর্বির পরিমান বাড়ে। রক্তনালির দেয়ালে চর্বি জমে। ফলে দেখা দেয় উচ্চ রক্তচাপ। বেড়ে যায় হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি। মানসিক অশান্তি ও নিদ্রাহিনতা দেখা দেয়। শরীর হারায় শারীরিক ভারসাম্য। মারামারি, ছিনতায়, আত্মহত্যা, নারীঘটিত সামাজিক অন্যায়, সড়ক দুর্ঘটনা ইত্যাদি ব্যাক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। শ্লোগান উঠেছে, মাদককে না বলুন। অথচ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মাদককে না বলে দিয়েছে। যুগে যুগে মানুষ বিপথগামী হয়েছে। আল্লাহকে ভুলে নানা অন্যায় অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। তাইতো যুগেযুগে নবী-রাসূলদের আগমন হয়েছে মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিতে। সঠিক পথে অর্থাৎ, আল্লাহর পথে নিয়ে আসতে। ইসলামের শুরুর দিকে খোদ আরব দেশেও আর দশটা অন্যায় অত্যাচরের ন্যায় মদ, জুয়া ইত্যাদি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। এই মদপানের কারণেই তখনকার সমাজে নানা অনাচার হতো। এক সময় কয়েকজন সাহাবী হুজুর (সা.) কে মদ, জুয়া ইত্যাদর খারাপ দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিল হলো, তারা আপনাকে মদ ও জুয়া

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, দুটোতেই মানুষের জন্য পাপ ও উপকার রয়েছে। তবে পাপ উপকার অপেক্ষা বেশি।[২৮২]

তাৎক্ষণিকভাবে মদ ও জুয়াকে হারাম করা হয়নি। মানুষ তাৎক্ষণিক মদ ও জুয়া পুরোপুরি বর্জন করেনি। পরবর্তী সময়ে আয়াত নাযিল হয়েছে, হে মুমিনরা! নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেয়ো না।[২৮৩] এভাবে ধীরে-ধীরে মানুষকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এবং সব শেষে এ সম্পর্কিত নির্দেশ এসেছে, হে মু'মিনরা! মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ণয়ের তীর এসব নোংরা ও অপবিত্র, শয়তানের কাজ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং তোমরা এসব বর্জন কর। আশা করা যায় তোমরা সফল হবে। শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়। আর আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে চায়। তোমরা কি এখনও বিরত হবে না?[২৮৪]

ইসলামে মদপান হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে কয়েক বার বলেছেন 'মদপান করো না। কারণ এটি সব অন্যায়ের উৎস' হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তারা যখন বললো এটা তো ওষুধ। তখন মহান আল্লাহ বললেন, 'এটা অসুখও। এ কারণে ইসলামে মদ্যপান নিষেধ করেছেন। যে মদ শুধু শরীরের জন্য এত ক্ষতিকর, ইসলাম কত আগেই না তা নিষিদ্ধ করেছে! ইসলামি বিধি-বিধান মেনে মদপান তথা সব নেশা জাতীয় দ্রব্য পরিহার করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি আমরা যেন শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থ্য থেকে স্বাস্থ্য সম্মত জীবন-যাপন পালন করতে পারি সে জন্য আমাদের সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

ব্লাডপ্রেশার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

হৃৎপিন্ড রক্ত পাম্প করে রক্তনালি দিয়ে সারা শরীরে সরবরাহ করে। আবার পাম্প করার পূর্বে সারা শরীর থেকে রক্ত এসে হৃৎপিন্ডে জমা হয়। হৃৎপিন্ড যখন সংকুচিত হতে হতে রক্ত পাম্প করে, তখন ধমনি (রক্তনালি) দিয়ে রক্ত শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয়। রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্তনালির দেয়ালে রক্ত যে চাপ প্রয়োগ করে, তাকে সিসটোলিক চাপ বলে। স্বাভাবিক সিসটোলিক রক্তচাপ হচ্ছে ১২০ মিলিমিটার পারদ (১২০ মিলিমিটার উচ্চতর পারদের পাদদেশে যে পরিমান চাপ বাড়বে, এ চাপ সেই চাপের সমান)। সিসটোলিক প্রেসার ১২০ থেকে ১৩৯-এর মধ্যে থাকলে তা উচ্চ রক্তচাপের দিকে যাচ্ছে বলা যায় (একে প্রাক উচ্চ রক্তচাপ বলে)। আর ১৪০ এর বেশি হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাই ব্লাড প্রেসার বলে। হৃৎপিন্ড রক্ত পাম্প করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সারা শরীর

---

[২৮২] يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (আল-কুরআন ২ : ২১৯)

[২৮৩] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً (আল-কুরআন ৪ : ৪৩)

[২৮৪] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (আল-কুরআন ৫ : ৯০-৯১)

Dhaka University Institutional Repository

থেকে রক্ত এসে হৃৎপিন্ডে জমা হতে থাকে। এ রক্তকে গ্রহণ করার জন্য হৃৎপিন্ড তখন প্রসারিত হতে থাকে। এ সময় ধমনিতে (রক্তনালিতে) রক্তের যে চাপ থাকে, তা-ই ডায়াসটোলিক রক্তচাপ। স্বাভাবিক ডায়াসটোলিক রক্তচাপ ৮০ মিলিমিটার পারদ। ৮০ থেকে ৮৯ পর্যন্ত ডায়াসটোলিক রক্তচাপ থাকলে তা প্রাক-উচ্চ রক্তচাপ। আর ৯০ এর উপরে হইলে সেটা উচ্চ রক্তচাপ। সিসটোলিক উচ্চ রক্তচাপই হোক বা ডায়াসটোলিক রক্তচাপই হোক, কোনটাই শরীরের জন্য ভালো নয়। হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনির অসুখসহ অনেক কিছুই হতে পারে।[২৮৫] যদি আপনার জানা থাকে যে আপনার রক্তচাপ স্বাভাবিক তাহলে ৬ মাস পর পর রক্তচাপ পরীক্ষা করা ভাল। আর যদি আপনি উচ্চ রক্তচাপের রোগী হন তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে হবে।

রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

কোলেস্টেরল হলো রক্তের চর্বি। এটা এমন একটি চর্বি যা সুস্থ থাকার জন্য পরিমিত পরিমাণ জরুরী। কোলেস্টেরল আমাদের শরীরকে সুস্থ সবল রাখে। এর সাহায্যে রক্ত বিভিন্ন হরমোন ও ভিটামিন তৈরীতে সহায়তা করে। শরীরের লক্ষ লক্ষ কোষের গঠন প্রক্রিয়ায় কলেস্টেরল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কোলেস্টেরল সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে নেতি বাচক ধারণা আছে তাহা সঠিক নয়। পূর্ণ বয়স্কের ক্ষেত্রে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা প্রতি ১০০ মিলিলিটারে দুইশত মিলিগ্রামের মধ্যে থাকা উচিত।[২৮৬] কোলেস্টেরলের আধিক্যের সমস্যা হচ্ছে অবচেতন ভাবে শরীরের রক্তনালীগুলো বিশেষ করে হৃৎপিন্ডের Coronary Artery তে চর্বির আস্তরণ পড়ে সংকীর্ণ হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপসর্গ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এটা ধরা পড়ে না। বিশেষ করে আমাদের দেশে চিকিৎসা সচেতনতার অভাবে অনেক সময় এগুলো উপেক্ষা করা হয়। বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে কোলেস্টেরল চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী দিক নির্দেশনা দিয়েছে। মানব দেহে কোলেস্টেরলের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা ও কোন কোন ক্ষেত্রে অপকারিতা সম্পর্কে সবারই কমবেশী ধারণা থাকা প্রয়োজন। নিয়মিত ব্যাংকের একাউন্ট চেক করার মত রক্তের Lipid Profile চেক করাও সবার জন্য জরুরী। কোলেস্টেরল হিসাব নিকাশে যদি গরমিল থাকে তাহলে অনেক শারীরিক অসুবিধা হতে পারে।

কোলেস্টেরল রক্তে প্রবাহিত হয় প্রটিনের সাথে সংযুক্ত হয়ে, লাইপোপ্রটিন নামে। লাইপোপ্রটিনের আবার বিভিন্ন নাম। হাই ডেনসিটি লাইপোপ্রটিন (এইচ ডি এল) এবং লো ডেনসিটি লাইপোপ্রটিন (এল ডি এল)। এগুলোর একটি ভাল কোলেস্টেরল এবং অন্যটি খারাপ কোলেস্টেরল। 'এইচ ডি এল' হলো ভাল কোলেস্টেরল আর 'এল ডি এল' হলো মন্দ কোলেস্টেরল। 'এইচ ডি এল' কোলেস্টেরল রক্তের সব কোলেস্টেরলকে লিভারে নিয়ে যায় প্রসেসিংয়ের জন্য, নিষ্কাশনের জন্য। এতে রক্তের কোলেস্টেরলের পরিমান কমে, রক্তনালির দেওয়ালে কোলেস্টেরল জমে কম। রক্তনালি ভাল থাকে। উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে। তাই 'এইচ ডি এল' হলো ভাল কোলেস্টেরল। আর 'এল ডি এল' কোলেস্টেরল রক্তনালির দেওয়ালে জমা হয়। রক্তনালির দেওয়ালে ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে পুরু ও শক্ত। ফলে দিনে দিনে বাড়তে থাকে রক্তচাপ; পরিনতি উচ্চ

---

[২৮৫] অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ্, *সুস্বাস্থ্যের জন্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[২৮৬] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

রক্তচাপ। কমে যায় রক্তের প্রবাহ। সম্ভাবনা বাড়ে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের। তাই 'এল ডি এল' হলো মন্দ কোলেস্টেরল। মন্দ কোলেস্টেরল আধিক্য সাধারণত নিম্নোক্ত অবস্থাগুলোতে বেশী দেখা দেয়।

* মেদবহুলতা
* ডায়াবেটিস
* কিডনী রোগ
* একটানা বিশেষ কিছু ঔষধ সেবন
* বংশগত কারণ
* বসে কাজ করা
* থাইরয়েড রোগ
* লিভার রোগ
* অনিয়ন্ত্রিত চর্বি জাতীয় খাদ্য খাওয়া

এইচ ডি এল বাড়ানো এবং এল ডি এল কমানোর উপায়

ঔষধ ছাড়া যে সমস্ত পন্থায় এইচ ডি এল বাড়ানো এবং এল ডি এল কমানো যায় সেগুলো হচ্ছে-

➢ ওজন কমানো।

➢ কায়িক পরিশ্রম না থাকলে ব্যায়াম করা।

➢ ধূমপান ত্যাগ করা।

➢ ঘরের তাপমাত্রায় জমে যাওয়া রান্নার তেল অর্থাৎ সম্পৃক্ত তেল পরিহার করা। এগুলোর বদলে অসম্পৃক্ত রান্নার তেল যেমন : যয়তুন, সরিষা, বাদাম, সূর্যমুখী, ভুট্টা ও সয়াবিন তেল ব্যবহার করা।

➢ আঁশযুক্ত খাবার বেশী খাওয়া। যেমন : সব ধরণের শাক-সবজী, ফল ও ডাল খাওয়া।

➢ রসুন ও ইছুপগুল ব্যবহার করা।

➢ মাছ, বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ বেশী খাওয়া।

➢ কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাদ্য পরিহার করা। যেমন : লালগোশত, ডিমের কুসুম, কলিজা, মাছের ডিম, চর্বি, হাঁসমুগীর চামড়া, হাড্ডি মজ্জা, ঘি, মাখন, ডালডা, গলদা চিংড়ি, নারিকেল ইত্যাদি।

➢ সর্বোপরি ডায়াবেটিস থাকলে তা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

মনমেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনীয়তা

কিছু কথা বা কাজ আছে যেগুলো করলে মন ভাল থাকে। আবার এমন কিছু কথা বা কাজ আছে যেগুলো করলে মন খারাপ হয়। আমাদেরকে মন্দটা পরিহার করে ভালটা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নে বর্ণিত কাজগুলো করলে সুফল পাওয়া যাবে।

➢ হাসুন প্রাণ খুলে। হাসলে 'এনডরফিন' নিঃসরণ হয়, যা মস্তিষ্কে জাগায় ভালো লাগার অনুভূতি। হাসি খুশি মানুষ সুস্থ থাকে দীর্ঘ দিন। আপনার প্রিয় কাজগুলো করুন। প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান, গল্প করুন, আর প্রাণ খুলে হাসুন।

➢ ব্যায়াম করুন নিয়োমিত। ব্যায়ামে, এমনকি কেবল উঠ-বস করলে, যৌবনের হরমোন 'গ্রোথ হরমোন'-এর নিঃসরণ বাড়ে। আর এই হরমোনের জন্য মন ভালো হতে পারে। ব্যায়ামের ফলে মস্তিষ্কে মন ভালো লাগার মতো কিছু 'নিউরোট্রানস্মিটারও' নিঃসরণ হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

➢ হাতের পরশও ভালো করতে পারে মন। পরশেও নিঃসরন হয় 'এনডরফিন', 'গ্রোথ হরমোন'। এগুলো স্ট্রেসের ক্ষতিকর দিক কমায়। গবেষণায় দেখা গেছে, চিকিৎসকের নিয়মিত হাতের পরশ পাওয়া রোগীরা পরশ না পাওয়া রোগীদের চেয়ে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

যে সমস্ত পরিবারের পিতা-মাতা উভয়ই পরিবারের বাহিরে শুধু মাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যস্ত থাকেন এবং তাদের সন্তানদেরকে অন্যের মাধ্যমে লালন-পালন করেন ফলে, তাদের সন্তানদের পরিপূর্ণ ভাবে মানসিক বিকাশ ঘটে না। পরবর্তীতে এরা মানসিক ভাবে অন্যদের থেকে অনেক বিষয়েই পিছিয়ে থাকে। তারা সব সময় হিনমন্যতাই ভোগে। তাদের মন সব সময় দূর্বল থাকে।

পরিমিত আহার

আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মু'মিন ব্যক্তি এক উদরে খায় আর কাফের সাত উদরে খায়।[২৮৭]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দু'জনের খাবার তিন জনের জন্য এবং তিন জনের খাবার চার জনের জন্য যথেষ্ট।[২৮৮]

মুহম্মদ ইবনে বাশ্‌শার (র) নাফি' (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রাঃ) ততক্ষণ পর্যন্ত আহার করতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সাথে খাওয়ার জন্য একজন মিসকিনকে ডেকে আনা না হতো। একদা আমি তাঁর সঙ্গে বসে আহার করার জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসলাম। লোকটি খুব বেশি আহার করলো। তিনি বললেন, নাফি' এ ধরনের লোককে আমার কাছে নিয়ে আসবে না। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মুমিন এক পেটে খায়। আর কাফির সাত পেটে খায়।[২৮৯]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার তাঁর ইন্তিকালঅব্দি একাধারে তিন দিন আহার করে পরিতৃপ্ত হয়নি। আরেকটি বর্ণনায় আবূ হাযিম আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, একদা আমি প্রচন্ড ক্ষুধার যন্ত্রণায় আক্রান্ত হই। তখন ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং মহান আল্লাহর (কুরআনের) একটি আয়াতের পাঠ তার থেকে শুনতে চাইলাম। তিনি আয়াতটি পাঠ করে নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। এদিকে আমি কিছু দূর চলার পর ক্ষুধার যন্ত্রণায় উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। একটু পরে দেখি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মাথার কাছে দাঁড়ানো। তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা। আমি বললাম লাব্বাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ ওয়া'সাদায়াকা' (আমি হাজির ইয়া রাসুলুল্লাহ আপনার সমীপে) বলে সাড়া দিলাম। তিনি আমার হাত ধরে তুললেন এবং আমার অবস্থা বুঝতে পারেন। তিনি আমাকে বড়িতে নিয়ে গেলেন এবং এক পেয়ালা দুধ দেওয়ার জন্য আদেশ করলেন। আমি কিছু পান করলাম। তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা আরো পান করো। আমি আবার পান করলাম। তিনি পুণরায় বললেন আরো। আমি পুনর্বার পান করলাম। এমন কি আমার পেট তীরের মত সমান হয়ে গেল। এরপর আমি ওমরের সাথে সাক্ষাত করে আমার অবস্থা তাকে জানালাম এবং

---

[২৮৭] ইমাম মুসলিম (র), প্রাগুক্ত, খন্ড ৭ম, ৩৭তম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩২, হাদীস নং ৫২১৬

[২৮৮] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২১১৫, হাদীস নং ৫০০০

[২৮৯] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২১১৬, হাদীস নং ৫০০১

Dhaka University Institutional Repository

বললাম, হে ওমর আল্লাহ তা'আলা এমন এক জন লোকের মাধ্যেমে বন্দোবস্ত করেছেন যিনি এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে বেশি উপযুক্ত। আল্লাহর কসম, আমি তোমার কাছে আয়াতটির পাঠ শুনতে চেয়েছি অথচ আমি তোমার চেয়ে ভাল পাঠ করতে পারি। উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে আপ্যায়ন করা আমার কাছে লাল বর্ণের উটের চেয়েও অধিক প্রিয়।[২৯০]

হযরত জাবালা ইবনে সুহাইম (রাঃ) বর্ণনা করেন। তখন ছিল দুর্ভিক্ষের বছর। আমরা ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদেরকে খাওয়ার জন্যে খেজুর দেওয়া হতো। একদিন আমরা যখন খানা খাচ্ছিলাম তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, তোমরা দুইটি খেজুর একত্রে মিলিয়ে খেয়ো না, কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে একত্রে খেতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, তবে তার ভাই (যার সঙ্গে সে একত্রে খাচ্ছে) অনুমতি দিলে এর ব্যতিক্রম করে খেতে পারবে।[২৯১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামমের জামানায় মদীনা শরীফের ডাক্তারগণ হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকত।[২৯২] এমনকি এক ডাক্তার নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামমের নিকট অভিযোগ নিয়ে এল যে, কোন রোগীই তার নিকট যায় না। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সম্ভবত এর কারণ এই যে, এ সকল লোকেরা সে পর্যন্ত খাবারের প্রতি হাত বাড়ায়না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তীব্র ক্ষুধা অনুভব না করে। আর পরিপূর্ণ রূপে পেট ভরার পূর্বেই খাবার খাওয়া ছেড়ে দেয়। তাই মনে করা যায় যে কম খাওয়ার কারণেই তাদের সুস্থতা বজায় আছে।[২৯৩] কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষের রোগ-ব্যাধি পুর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ খাদ্য। বেশীরভাগ মানুষ এখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করে। আজ প্রত্যেকটি শহরেই অসংখ্য খাবারের হোটেল। সেখানে বাহারি রকমের খাবারে ভরপুর। এর মধ্যে কোন্‌টি স্বাস্থ্য সম্মত এবং কোন্‌টি অস্বাস্থ্যকর তা বোঝার উপায় নেয়। তবে একথা সত্য যে, 'ফার্ষ্ট ফুডের' 'দোকনে খাবারের নামে যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়া যায় এর বেশীর ভাগই 'সম্পৃক্ত' চর্বিতে দোষণীয়, যা খেলে পাকস্থলী, লিবার, কিডনী, হৃৎপিন্ড সহ শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ সমস্ত খাদ্য দ্রব্য উচ্চ রক্তচাপের ব্যক্তিদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আমাদের দেশে যে সমস্ত কোমল পাণীয় পাওয়া যায় এর বেশীর ভাগই কিডনীর জন্য ক্ষতিকর। বর্তমানে অসুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে পাকস্থলী, লিবার, কিডনী, হৃৎপিন্ড ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখাই বেশি।

---

[২৯০] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২১০৬, হাদীস নং ৪৯৮৩

[২৯১] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২১৪৮, হাদীস নং ৫০৫২

[২৯২] প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

[২৯৩] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

খাবারের মধ্যে ফুঁক না দেওয়া

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদ্য ও পাণীয় দ্রব্যে ফুঁ দিতেন না এবং তিনি পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতেন না।[২৯৪]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম কতই না জ্ঞানগর্ভময়। কারণ ব্যক্তির দাঁত অথবা মুখের মধ্যে যে কোন সংক্রামক ব্যাধি থাকতে পারে। এই ব্যাধি একজন থেকে অন্য জনের দেহে ছড়াতে পারে। কারো কারো মুখ থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হয়। এমতাবস্থায় প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, খানার মধ্যে ফুঁক দেওয়া অন্যের জন্য কতটুকু কষ্টের কারণ হয় এবং স্বয়ং খাদ্য গ্রহণকারীর জন্যই বা কতটুকু ক্ষতিকর।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশী গরম খানা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, এর মধ্যে বরকত হবে না। এটা সতঃসিদ্ধ কথা যে, আপনি পরীক্ষামূলক ভাবে রুটির তাওয়া থেকে গরম গরম রুটি তুলে তুলে খাওয়া শুরু করুন এবং লক্ষ্য করে দেখুন সাধারণ খানার চেয়ে অধিক খেতে পারেন এবং খাওয়ার সময় রুটির পরিমাণ সম্পর্কিত ধারণাটুকুও থাকে না।

গরম খাদ্য গ্রহণে মুখের মধ্যের ছাল উঠে যায়, খাদ্যনালি ও পরিপাক তন্ত্রের সুস্থতা অর্থাৎ স্বাভাবিক কার্যক্ষমতার উপর প্রভাব পড়ে। গরম খাদ্য গ্রহণের মধ্যে ঠান্ডা পানি পান করলে দাঁতের বড় ধরনের ক্ষতি হয়। বিশেষ করে গরমকালে বরফের ঠান্ডা পানি পানকারীর জন্য গরম খানা খাওয়া খুবই ক্ষতিকর। সুতরাং ধীর-স্থির ভাবে খাবার গ্রহণ করা উচিত, যাতে ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা করার প্রয়োজন না হয় এবং দাঁত, খাদ্যনালি ও পরিপাক তন্ত্রের সুস্থতার জন্য ক্ষতিকর না হয়।

হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

আবূ জুহায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি হেলান দিয়ে আহার করিনা।[২৯৫]

আবূ জুহায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি তাঁর কাছে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে বললেন, হেলান দেওয়া অবস্থায় আমি আহার করিনা।[২৯৬]

সাধারণভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্ত বাণীর সঙ্গে দ্বীনী আকিদা, ইসলামী নীতিমালা এবং ধর্মীয় বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে। এটা চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যাপার এবং শারীরিক সুস্থতার খাতিরে উক্ত নির্দেশ মেনে চলা খুবই জরুরী। এটা হজমশক্তি ও পরিপাক প্রক্রিয়ার জন্য অশেষ ক্ষতিকর। হেলান দিয়ে অথবা উপুড় হয়ে শুয়ে খাওয়া শুধু স্বাস্থ্যগত

---

[২৯৪] ইমাম ইব্ন মাজাহ (র), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩২৮৮

[২৯৫] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২১১৭, হাদীস নং ৫০০৬

[২৯৬] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫০০৭

Dhaka University Institutional Repository

ও ভদ্রতার পরিপন্থী নয় বরং এটা পশুর স্বভাবও বটে। হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উপকারের পক্ষে, কারণ চিকিৎসা শাস্ত্রও তাঁর জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত।

ইসলাম শুধু মাত্র কতিপয় আকীদা বিশ্বাসের নাম নয় এবং ইসলামী শিক্ষা শুধু কিছু মাযহাবী ইবাদত ও প্রকাশ্য রীতি-নীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। বরং ইসলামী শিক্ষা পুরা মানবীয় জীবনের অন্তর্ভুক্ত। আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের প্রতিহি ক্ষেত্রেই পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অসভ্য, বর্বর এবং মুর্খ জাতির মধ্যে প্রেরিত হন এবং নিজেও অক্ষর জ্ঞান শূন্য ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ওহীর মাধ্যমে তিনি দুনিয়াবী জ্ঞ্যান-বুদ্ধি ও কৌশল ইত্যাদি এ পরিমাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন যা বড় বড় পন্ডিত বুদ্ধিমান ও দার্শনিকগণ দেখে বিশ্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।

পায়ে হাঁটা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, মানুষ আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ার চেয়ে চিকিৎসার প্রতি বেশী ঝুকে পড়েছে। কিন্তু মাঝে-মাঝে এ চিন্তাও করা দরকার যে, আমাদের রোগ-ব্যাধির কারণ কি? কেন আমরা বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধিতে ভুগছি? একথা সকলে স্বীকার করবেন যে, এর মূল কারণ হলো অলস এবং কর্মবিমুখ জীবন-যাপন ও জ্ঞানের সল্পতা। আমরা মানসিক পরিশ্রম কিছুটা হয়তো করি কিন্তু শারিরীক পরিশ্রম এত কম করি যা আমাদের শরিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য যথেষ্ট নয়। শারিরীক পরিশ্রমের দ্বারা মাংসপেশী, হাড়, জয়েন্ট, এগুলো যেমন মজবুত হয় তেমনি হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, যকৃত, পাকস্থলী ইত্যাদি দ্রুত সঠিক কার্যাদি সম্পন্ন করে শরীরকে সুস্থ রাখে। অর্থাৎ, নিয়োমিত শারীরিক পরিশ্রম ব্যতিত দীর্ঘ দিন সুস্থ থাকা যায় না। পায়ে হাঁটা একটি উত্তম ব্যায়াম। এই ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীর সুস্থ রাখা যেতে পারে।

নিয়োমিত শারীরিক পরিশ্রম ব্যতিত আমরা সাধারণত যে সমস্ত রোগ-ব্যাধি ভোগ করি নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

গ্যাষ্ট্রিক

গ্যাষ্ট্রিক পাকস্থলীর রোগ। খাদ্যদ্রব্য সঠিক ভাবে হজম না হওয়ার কারণে গ্যাষ্ট্রিকের সৃষ্টি হয়। ইদানিং বাস, ট্রেন, স্টেশন, বাজার, অলিতে-গলিতে সর্বত্রই হজমের ঔষধপত্রের বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায়। গাছ-গাছড়ার রস, ছাল-বাকোল, বড়ি, বটিকা, দানা, মিক্সার ইত্যাদির বিক্রেতাও পাবেন। সকলেই দাবী করে, এটি গ্যাস্ট্রিক রোগ নিরাময়ের একমাত্র মহৌষধ। বর্তমানে সারা বিশ্বে পাকস্থলীর রোগ নিরাময়ের জন্য যত ঔষধ-পত্র তৈরী হচ্ছে তার মধ্যে গ্যাস্ট্রিক রোগ অন্যতম। অথচ নিয়োমিত শারীরিক পরিশ্রম ব্যতিত আমরা যত ধরনের চিকিৎসা ব্যাবস্থায় গ্রহণ করি না কেন, সেগুলো কেবল মাত্র সাময়িক উপশম দিতে পারে। এর সঠিক চিকিৎসা হলো নিয়োমিত শারীরিক পরিশ্রম করা এবং ইসলাম নির্দেশিত পরিমিত খাবার খাওয়া। আমরা যখন ঘি দিয়ে রান্না করা সুস্বাদু

Dhaka University Institutional Repository

খাবার খেয়ে চেয়ারে বসে থাকি এবং চলাফেরা করি না, তখন উক্ত খাদ্য হজম না হয়ে পচে যায়। ফলে তা রোগ প্রতিরোধক হওয়ার পরিবর্তে রোগ জীবাণুতে পরিণত হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য

বর্তমান যুগে এটি একটি কঠিন সমস্যা। গাছ-গাছড়া, ঔষধ-পত্র ইত্যাদি সেবনে যদি এর উপশম হয় তাহলে তো ভাল, না হলে সারা জীবন এই রোগ সঙ্গের-সাথী হয়ে থাকবে এবং এর থেকে শরীরের অনেক রোগের সৃষ্টি হবে। রোগী চিকিৎসার সাথে সাথে যদি পায়ে হেঁটে চলা শুরু করে তবে কোষ্ঠ-কাঠিন্য থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

অর্শ্বরোগ

কোন ব্যক্তি যদি কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এই রোগ সাধারণত পাকস্থলীর রোগের কারণে হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যদি ইসলামিক নিয়ম মেনে খাবার খায় এবং নিয়োমিত ভাবে শারিরীক পরিশ্রম ও হাঁটা-চলা শুরু করে তাহলে তার অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম। আর যদি কোন ব্যক্তির অর্শ্বরোগ হয়ে থাকে তাহলে সে ব্যক্তি উপরোক্ত নিয়ম-কানুন মেনে হাঁটা-চলা করলে এবং ডাক্তারের পরামর্শক্রমে কিছু ঔষধ সেবন করলে, ইনশাআল্লাহ সে অচিরেই এই কষ্টদায়ক রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

মেদভূড়ি

আমাদের সমাজে বিশেষ করে শহর অঞ্চলে মেদভূড়িওয়ালা অনেক লোক দেখা যায়। সাধারণত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে মেদভূড়ি হয়ে থাকে। মেদভূড়ি জীবনের জন্য অস্বস্তিকর ও কষ্টদায়ক। মেদভূড়ির জন্য মানুষ কত রকম অশান্তি ভোগ করছে। এর চিকিৎসার জন্য কত রকম চটকদার বিজ্ঞাপন তৈরী হচ্ছে। মানুষ হাজার হাজার টাকা এর পেছনে ব্যয় করছে। তবুও কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে মেদভুঁড়ি কি অপ্রতিরোধ্য? আদৌ নয়। এর যথাযথ চিকিৎসা রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি ইসলামিক নিয়ম মেনে খাবার খায় এবং নিয়োমিত শারিরীক কাজ-কর্ম ও হাঁটা-চলা করে তাহলে তার মেদভূড়ি হতেই পারে না। আর যে ব্যক্তির মেদভূড়ি হয়েছে সে চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে কিছু ঔষধ সেবন সহ দৈনিক ৫ কিলোমিটার নিয়োমিত হাঁটা-চলা করে, হাঁটার গতি হবে মিনিটে নূন্যতম ১০০ কদম। এভাবে নিয়োমিত হাঁটলে এবং ইসলামিক নিয়ম মেনে খাবার খেলে মাত্র ৪০ দিনেই মেদভূড়িওয়ালা ব্যক্তির মেদভূড়ি কমে যাবে ইনশাআল্লাহ। এমনকি পরিশেষে তার পোশাক পরিবর্তন করতে হতে পারে।

হৃৎপিন্ডের রোগ

হৃৎপিন্ড একটি ক্রিয়াশীল অঙ্গ। এটা গতিশীলতাকে পছন্দ করে। কিন্তু হৃৎপিন্ডের বাহক মানুষ অধিক অলসতা করে এবং কাজ থেকে বিরত থাকে। অতএব মানুষ যদি হৃৎপিন্ডের ন্যায় সচল ও সক্রিয় না হয় তবে হৃৎপিন্ড অকেজো হয়ে যাবে। তারপর একে সক্রিয় ও সচল করার জন্য চিকিৎসার নামে বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ও পন্থা অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু তাও অকেজো হলে অনেক জটিলতা দেখা

Dhaka University Institutional Repository

দেয়। এ কারণে হৃৎপিন্ডের জটিলতা দেখা দেওয়ার পূর্বেই যদি নিয়মিত হাঁটা-চলা করা যায় তাহলে তার হৃৎপিন্ডের রোগ হতে পারে না।

অনিদ্রা

ইদানিং অধিকাংশ মানুষের নিকট ঘুম এক প্রকার সোনার হরিণ। ডাক্তারদের ক্লিনিক এবং হেকিমদের দাওয়াখানাসমূহ বর্তমানে এরূপ রোগীদের মহাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান যতোই আধুনিক উপায়-উপকরণ ও পন্থা আবিষ্কার করছে, রোগ-ব্যাধিও দিন দিন ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এর মূল কারণ, অলস জীবন-যাপন। ঘুমের জন্য সমস্ত প্রকার চিকিৎসার পরও যখন কোন ব্যক্তির ঠিকমত ঘুম হয় না, তখন যদি সে দৈনিক নিয়োমিত ভাবে শারিরীক পরিশ্রম ও পায়ে হেঁটে চলাফেরা করে তাহলে দেখবেন যে, অনিদ্রা তার থেকে বহু দূরে চলে গেছে। এমনকি যে রোগীর উপর ঔষধ, পুরিয়া, অনুবটিকা ও ডোজ কোন ফল হয় না, তখন যদি সে নিয়মিত ভাবে শারিরীক পরিশ্রম ও পায়ে হেঁটে চলাফেরা করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে, তবে পুনরায় সে স্বাভাবিক সুখনিদ্রা পাবে ইনশাল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাস্থ্য সুরক্ষার ইসলামী বিধান

আবির্ভাবের প্রথম লগ্ন থেকেই ইসলাম তার সত্য ও ন্যায়ের শাশ্বত সৌন্দার্যের আলেকে সমগ্র মানব জাতিকে সুপথ দেখিয়ে চলেছে। মানুষের মধ্যে যারা প্রকৃত জ্ঞানী ও অনুসন্ধানী, কেবল তারাই খুঁজে পেয়েছেন সত্যের ও শান্তির সন্ধান, খুঁজে পেয়েছেন একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহকে, জেনেছেন স্বাস্থ্য সুরক্ষার সর্বোত্তম পদ্ধতি। আধুনিক সভ্যতার এই যুগে মানুষ আজ কঠিনতম ব্যস্ততার শিকার। সবাই চায় স্বচ্ছলতা, আর্থিক নিরাপত্তা, চায় শান্তি। বস্তুত মানুষের আত্মিক শান্তি এবং বেঁচে থাকার জন্য এটি অপরিহার্য।

ইসলামের যৌক্তিকতা, সরলতা, পাপের প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা; রোগ ও অশুচিতা, ক্ষতিকারক পানাহার, অন্ধবিশ্বাস ও অবাস্তববাদিতা থেকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা, মনকে আল্লাহ ভীরু করে ইবাদতের দিকে মনোযোগ এনে মানসিক প্রশান্তি প্রদানের ক্ষমতা এক কথায় ইসলামের সৌন্দর্য আজ ভোগবিলাসী বস্তুতান্ত্রিক অশান্ত অপরিতৃপ্ত বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করছে, তাদেরকে আকর্ষণ করছে ইসলামের দিকে।

ইউ এস এ টুডে (UAS Today) পত্রিকার ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৯৪ইং সংখ্যর ভাষ্য হচ্ছে- ইসলাম আমেরিকানদের জোয়ারের টানের মত প্রবল শক্তিতে কাছে টেনে নিচ্ছে। আমেরিকানরা এ সর্বজনীন বিশ্বধর্মের প্রতি ক্রমশই ঝুঁকে পড়ছে।

লন্ডনের বিখ্যাত দৈনিক 'টাইমস' তার ৯ই নভেম্বর ১৯৯৩, সংখ্যায় ব্রিটেনে ইসলামের বিকাশ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। তার শিরোনাম ছিল, ব্রিটিশ মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করছে কেন? নিবন্ধটিতে উপশিরোনাম দেয়া হয়েছিল, পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলোর বৈরী আচরণ সত্ত্বেও ইসলাম পাশ্চাত্যের মানুষকে জয় করে চলেছে। নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে- ইদানিং যে বিপুল সংখ্যায় ব্রিটেনবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করছে, তার কোন দৃষ্টান্ত অতীতে আর দেখা যায়নি। পত্রিকাটি আরও লিখেছে : Westerns despairing of their own society rising crime, family breakdown, drugs and alcoholism have come to admire the discipline and security of Islam.

অর্থাৎ পাশ্চাত্যের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের সমাজের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়েছে। তাতে ক্রমবদ্ধমান অপরাধ প্রবণতা, পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস, মদ্যপান ও মাদকাশক্তি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা ইসলাম প্রবর্তিত নিয়ম-শৃংঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে।[২৯৭]

বর্তমানে বিভিন্ন ধর্ম থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করছেন, তারা কোন লোভে পড়ে বা ঝোঁকের মাথায় এটা করছেন না। বরং ব্যাপক অধ্যায়ন, গবেষণা, পর্যালোচনার পর ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সাম্প্রতিকালে ইসলাম গ্রহণকারী অধিকাংশ নও মুসলিমই সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তি-রাষ্টপ্রধান, ডক্টরেট, খেলোয়াড়, চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনিয়ার, ধনকুবের, জমিদার, সাংবাদিক বা কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। এমনকি খ্রিষ্টধর্মের ধারক বহক অনেক পাদ্রীও বর্তমানে ইসলাম গ্রহণ করছেন।

---

[২৯৭] USA Today 27 January 1994, উদ্বৃতি-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিধান

স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। শরীর পরিচ্ছন্ন না থাকলে মনও পরিচ্ছন্ন থাকে না। মন পরিচ্ছন্ন না থাকলে ইবাদত করতে ইচ্ছা হয় না। শয়তান তখন মনকে খারাপের দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং ব্যক্তিকে পাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পরিচ্ছন্ন এবং তিনি পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, আল্লাহ আবশ্যই তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালাবাসেন।[২৯৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা সুন্দর ও পরিপাটি থাকতে পছন্দ করতেন এবং অন্যদেরকেও উৎসাহ দিতেন। অজুর মাধ্যমে মনাদৈহিক ক্লান্তি দূর হয় এবং কাজকর্মে মনোযোগ বাড়ে। গোসলের মাধ্যম দেহের ময়লা দূর হয় এবং হাত দিয়ে শরীর মন্থন করলে চামড়ার নিচে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় ফলে দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রতঙ্গের চামড়া ও মাংসপেশী সতেজ থাকে। এ বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান হাদীস, সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কারও পাত্রে কুকুর পান করে সে যেন পাত্রটি সাতবার ধুয়ে লয়।[২৯৯] মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, যখন কুকুর তোমাদের কারও পাত্র চাটে তা সাত বার ধৌত করবে এবং মাটি দ্বারা প্রথম ধৌত করবে।[৩০০]

আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমাদের কারও বস্ত্রে হায়েযের রক্ত লাগলে তার বিধান কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বস্ত্রে উহা লাগলে সে তা রগড়িয়ে তারপর তা পানি দ্বারা ধৌত করে সালাত আদায় করবে।[৩০১]

সোলায়মান ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি আয়েশা (রাঃ) কে বস্ত্রের ভিতর শুক্র পতিত হওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বস্ত্র হতে আমি উহা ধুয়ে ফেলতাম এবং বস্ত্র ধোয়ার চিহ্ন থাকা অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে যেতেন।[৩০২]

উম্মে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে তাঁর ছোট শিশু সহ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসেছিলেন। শিশুটি বুকের দুধ ছাড়া অন্য খাদ্য গ্রহণ করত না। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোলে নিলে সে মুত্র ত্যাগ করছিল। তারপর পানি এনে তার উপর ছিটিয়ে দিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ ধুইলেন না।[৩০৩]

---

[২৯৮] وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (আল-কুরআন ২ : ২২২)

[২৯৯] ইমাম মুসলিম (র), প্রাগুক্ত, খন্ড ২য়, ২য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২০, হাদীস নং ৫৫৭

[৩০০] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৫৮

[৩০১] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, খন্ড ১ম, হায়য অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ২১১, হাদীস নং ৩০১

[৩০২] প্রাগুক্ত, উযু অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ১৬২, হাদীস নং ২৩০

[৩০৩] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ১৫৭, হাদীস নং ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ

বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা একটি রুচি বিরুদ্ধ এবং ঘৃনিত কাজ। যে পানি বদ্ধ এবং যেখানে আমাদের দৈনন্দিন কাজ কর্ম করতে হয় সে পানিতে এক দিকে প্রস্রাবের কারণে যেমন দুষিত হয়ে যায়, অপর দিকে এই অপবিত্র পানি দ্বারা অজু, গোসল কাপড়-চোপড় পরিস্কার করা, খাবারের পাত্র ধোয়া কিছুই করা সম্ভব হয় না। ফলে সাধারণের জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে। এলাকার মানুষের কষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং রোগ-ব্যাধির বিস্তার লাভ করে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লমের কথা কতই না মূল্যবান।

হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।[৩০৪]

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে এবং পরে সেই পানিতে গোসল না করে।[৩০৫]

'প্রবাহিত পানি পাক' এ কথা তো সকলেরই জানা আছে। এই পানি নহর, ঝর্ণা, নদী বা সমুদ্র যাই হোক; এগুলোর পানি পাক। এমনি ভাবে বড় হাউজ বা পুকুরের বদ্ধ পানিও পাক হয়ে থাকে। এই বড়র পরিমাপ, দৈর্ঘ প্রস্ত ও গভীরতায় ন্যূনতম কতটুকু হতে হবে, ফিকাহবিদগণ তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

বদ্ধ পানি পাক হওয়ার জন্য শর্ত হল এই যে, পানির রঙ গন্ধ ও স্বাদ অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে। অন্যভাবে কথাটাকে এভাবেও বলা যায় যে, পানির পরিমাণ বেশী হবে এবং মাটি বা অন্য কিছুর সংমিশ্রণের দ্বারা পানির আসল অবস্থায় কোন পরিবর্তন হবে না।

একথা স্পষ্ট যে, হাউজ বা পুকুরের অধিক পানিতে মূত্র ত্যাগ করার দ্বারা না পানির রঙ বদলাবে, না স্বাদ নষ্ট হবে। আর না দুগর্ন্ধ সৃষ্টি হবে। এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এই পানি নাপাকও হবে না। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের স্বভাবগত রুচিবোধ ও পরিচ্ছন্নতা এটা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব-পায়খানা করুক আর তা অন্য লোকদের জন্য কষ্ট ও বিরক্তির উদ্রেক হোক। কেননা শুধু আইনের ধারা রক্ষা করে চললেই জীবন সুখময় হয়ে উঠে না এবং হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জিত হয় না।

প্রস্রাব আটকিয়ে রাখা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

প্রস্রাব আটকিয়ে রাখা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এর ফলে মূত্রগ্রন্থির উপর বেশি চাপ পড়ে ফলে মূত্রগ্রন্থি ক্ষতি গ্রস্থ হয়। মূত্র থলী এবং মূত্র যন্ত্রের দূর্বলতা দেখা দেয়া সহ অনেক ক্ষতিকর অসুখ

[৩০৪] ইমাম মুসলিম (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ২১, হাদীস নং ৫৬২
[৩০৫] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৬৩

Dhaka University Institutional Repository

হতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রস্রাব আটকিয়ে রাখতে অথবা প্রস্রাবের সময় বাধা দিতে নিষেধ করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। একজন গ্রাম্য লোক মসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে আরম্ভ করলো, অন্যান্য লোকেরা তাকে বাধা দিতে,গেল। এ সময় হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, লোকটিকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা, তোমাদেরকে সহজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে কঠোরতা করার জন্য বানানো সৃষ্টি করা হয় নি।[৩০৬]

সেই দৃশ্যটি একবার কল্পনা করে দেখুন। আল্লাহর নবীর মসজিদ (মসজিদে নববী)। যেখানে এক রাকাআত নামায অন্য স্থানে পঞ্চাশ হাজার রাকাআত নামাযের মর্যাদা রাখে। সেই পবিত্র মসজিদে একজন অপরিচিত লোক প্রস্রাব করছে। সংগত কারণেই সাহাবায়ে কেরাম উত্তেজিত হয়ে গিয়ে থাকবেন। তাই তাদের চিৎকার করা, তাকে ধরার জন্য দৌড়ানো এবং তাকে প্রস্রাব করতে বাধা দেওয়াটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু বিশ্ব মানবের শিক্ষক সেই রহমতের নবী যিনি তাঁর প্রাণ প্রিয় সাহাবাগণকে বাধা দিলেন এবং বললেন যে, লোকটিকে প্রস্রাব করতে দাও। পরে জায়গাটি পানি দিয়ে ধুয়ে দেবে। তিনি আরো বললেন, তোমাদেরকে মানুষের সাথে সহজ ও সুন্দর আচরণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। মানুষের সাথে কঠোর ও রূঢ় ব্যবহার এবং তাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করার জন্য তোমাদের পাঠানো হয় নি। কেননা, প্রস্রাব আটকিয়ে রাখায় অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং এতে কষ্টদায়ক বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞান আজ বলছে যে, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিজ্ঞানময়।

মলমুত্র ত্যাগের পর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

মলমুত্র ত্যাগের পর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া খুবই প্রয়োজন। মলমুত্র ত্যাগের স্থানে অনেক ধরণের রোগ জীবাণু থাকে। মলমুত্র ত্যাগের পর পরিচ্ছন্ন না হলে সে সমস্ত জীবাণু আমাদের শরীরের সাথে আমাদের বসবাসের পরিবেশে চলে আসে। এ কারণে আমাদের মধ্যে রোগ-ব্যাধির পরিমান বৃদ্ধি পেতে পারে। মলমুত্র ত্যাগের পর শুধু মাত্র শারীরিক পরিচ্ছন্নতাই যথেষ্ট নয়। মানসিক পরিচ্ছন্নতার ও প্রয়োজন। পায়খানা বা প্রস্রাব করার সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া পড়তেন।

হাম্মাদ বর্ণিত হাদীসে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন তখন বলতেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবছিওয়াল খাবায়িছ'। অর্থাৎ : 'হে আল্লাহ! আমি অপবিত্র বস্তু ও অপবিত্রতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।'[৩০৭]

পায়খানা প্রস্রাব হতে ফিরবার সময়ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া পড়তেন।

---

[৩০৬] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ১৫৬, হাদীস নং ২২০

[৩০৭] ইমাম মুসলিম (র), প্রাগুক্ত, ৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২৯, হাদীস নং ৭৩০

Dhaka University Institutional Repository

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানা হতে বের হয়ে "গুফরানাকা" বলতেন। (অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করছি)।[৩০৮]

মলমুত্র ত্যাগ ও এসতেনজা (শৌচকার্য্য) সম্বন্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অমর বাণী সহীহ হাদীস গ্রন্থ থেকে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

আবূ আইয়ুব আনসারী (রাঃ) হতে বির্ণত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা পায়খানায় গমন করো কেবলার দিকে মুখ করোনা এবং তা পিছনেও রেখোনা।[৩০৯]

ইব্নে আবদুল্লাহ ইব্নে সারজিস (রাঃ) হতে বির্ণত। তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গর্তের মধ্যে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, লোকেরা হযরত কাতাদাহ (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন, গর্তে প্রস্রাব করা নিষেধ কেন? রাবী বলেন এরূপ প্রবাদ আছে যে, জিনেরা (সাধারণত) গর্তে বসবাস করে থাকে।[৩১০]

গর্তের ভিতর সাপ বা বিষাক্ত জীব বসবাস করতে পারে এবং ঐগুলো ক্ষতি করতে পারে। জিনেরা গর্তে বসবাস করেত পরে এছাড়াও গর্তের ভিতর প্রস্রাব করলে এর মধ্যে বসবাসকারী প্রাণীটি তার নিজ আবাস স্থলেরও নিরাপদ নয়। অথচ ইসলাম বিনা কারণে সৃষ্টির কোন জীবের ক্ষতি করতে নিষেধ করেছে।

মোয়াজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লানতের তিনটি কারণকে ভয় করো। তা হলো পানিতে, পথের মাঝখানে এবং ছায়ায় মল মূত্র ত্যাগ করা।[৩১১]

পানিতে, পথের মাঝখানে অথবা ছায়ায় মল মূত্র ত্যাগ করলে চলাচলকারী পথিক এবং বিশ্রামরত ব্যক্তিগণের কষ্টের সৃষ্টি হয়। তাদের শরীর ও পোষাক অপবিত্র হতে পারে। এর ফলে তাদের স্বাভাবিক কাজ কর্ম ও ইবাদত বন্দেগিতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। পানিতে এবং পথের মাঝখানে মলমূত্র ত্যাগের কারণে পরিবেশ নষ্ট হয়। রোগ-জীবাণুর বিস্তার লাভ ঘটে, ফলে জনজীবনে দূর্ভগের সৃষ্টি হয়।

ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, যখন আমি দাঁড়িয়ে মূত্র তাগ করতেছিলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখে বললেন, হে ওমর দাঁড়িয়ে মূত্র ত্যাগ করো না। এরপর আমি দাঁড়িয়ে মূত্র তাগ করিনি।[৩১২]

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন যে, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে প্রস্রাবের সহিত প্রোটিন (এলবুমিন) শরীর থেকে বের হয়ে আসে। এটাকে অরথোস্টাটিক এলবুমিনিউরিয়া (*Orthostatic albuminuria*) বা ফাংশনাল এলবুমিনিউরিয়া (*Functional albuminuria*) বলা হয়। ফলে শরীরে প্রোটিনের অভাব দেখা দিতে পারে। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে বিশ্বের সেরা মহামানব ওহী প্রাপ্ত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে নিষেধ

---

[৩০৮] ইমাম আবূ দাউদ (র), প্রাগুক্ত, খন্ড ১ম, কিতাবুত তাহরাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৭, হাদীস নং ৩০

[৩০৯] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ১০৬, হাদীস নং ১৪৬

[৩১০] ইমাম আবূ দাউদ (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ১৬, হাদীস নং ২৯

[৩১১] ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র), প্রাগুক্ত, খন্ড ১ম, পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ চলাচলের পথে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ, হাদীস নং ৩২৮

[৩১২] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ বসে প্রস্রাব করা, হাদীস নং ৩০৮

Dhaka University Institutional Repository

করছেন। ওজর অথ্যাৎ শরীয়ত ও স্বাস্থ্য সম্মত কারণে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার অনুমতি সম্পর্কিত একটি হাদীস হুযইফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

হুযইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা লোকদের ময়লা ফেলার জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন। তারপর তিনি পানি চাইলেন। আমি তার নিকট পানি নিয়ে গেলাম এবং তিনি উহা দ্বারা পবিত্র হলেন।[৩১৩]

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমদেরকে জানিয়েছে যে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে মূত্র ত্যাগ করতেন। তাকে বিশ্বাস করোনা। তিনি বসেই মূত্র ত্যাগ করতেন।[৩১৪]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পবিত্রতা হাসিল করতে চায়, তখন সে যেন তার ডান হাত দিয়ে তা না করে। বরং সে যেন তার বাম হাতে ইস্তিন্‌জা করে।[৩১৫]

অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও তার ক্ষতিকর দিক

মহান রাব্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত। কোন্ কাজে তার মঙ্গল এবং কোন্ কাজে তার অমঙ্গল তা সৃষ্টিকর্তার চেয়ে কে আর ভাল বুঝবে। মানুষ কিভাবে চলবে তিনি তা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, (হে নবী) তুমি মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহকে হেফাজত করে, এটাই (হচ্ছে) তাদের জন্য উত্তম পন্থা। (কেননা) তারা (নিজেদের চোখ ও লজ্জাস্থান দিয়ে) যা করে আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অবহিত রয়েছেন। (হে নবী,) একই ভাবে তুমি মুমিন নারীদেরও বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাজত করে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রদর্শন না করে বেড়ায়, তবে (শরীরের) যে অংশ (সব সময়) খোলা থাকে (সে সব অংশের কথা আলাদা), তারা যেন তাদের বক্ষদেশকে মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে, তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর (আগের ঘরের) ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইয়ের ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের (সচরাচর মেলামেশার) মহিলা, নিজেদের অধিকারভুক্ত দাসী, নিজেদের অধিনস্ত (এমন) পুরুষ যাদের (মহিলাদের কাছ থেকে) কোন কিছুই কামনা করার নেই; কিংবা এমন শিশু যারা এখনও মহিলাদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে কিছুই জানে না, (এসব মানুষ ছাড়া তারা যেন) অন্য কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, (চলার সময়) নিজেদের যমীনের উপর তারা এমন ভাবে পা না রাখে যে সৌন্দর্যকে তারা গোপন করে রেখেছিল তা (পায়ের আওয়াজে) লোকদের কাছে জানাজানি হয়ে যায়। হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য) তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তওবা করো, আশা করা যায় তোমরা নাজাত পেয়ে যাবে।[৩১৬]

---

[৩১৩] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা, হাদীস নং ৩০৫

[৩১৪] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩০৭

[৩১৫] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা এবং ইস্তিন্‌জা করা অনুচিত, হাদীস নং ৩১২

[৩১৬] قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ- وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পৃথিবীতে যেমন নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছে তেমনি আখেরাতের কঠিন আযাবের দিকে নিজেদের ঠেলে দিচ্ছে। সমাজের খুবই কম সংখ্যক মানুষ আল্লাহর এই বিধি-বিধান মেনে চলে, আর বেশির ভাগ মানুষই এর বিপরীত কাজ করে। এরই কারণে আমাদের সমাজে আজ যিনা-ব্যভিচারে ভরে গেছে। মানুষের শরীরে নানা প্রকারের রোগ-ব্যাধি বাসা বেঁধেছে। মানুষের জীবনী শক্তি ও রোগ প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হতে দুর্বলতর হচ্ছে। মানুষ নতুন নতুন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস, ক্যান্সার ইত্যাদি মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করছে। অপর দিকে যারা বেঁচে থাকছে তারাও নানা প্রকার দূরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণায় পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে। বর্তমান সময়ে এমন একটি পরিবারও খুঁজে পাওয়া যাবে না যাদের মধ্যে শারীরিক অথবা মানসিক ব্যাধি গ্রস্ত ব্যক্তি নেই। সমস্ত সমাজই আজ অশান্তিতে ভরপুর। গোটা পৃথিবীই যেন একটি হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। মানুষের আত্মসম্মানবোধ লোপ পেয়েছে, লোপ পেয়েছে আত্মসম্ভ্রম বোধ। মানুষের প্রতি মানুষের কোন সম্মান বোধ নেই। নেই কোন সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের রীতিনীতি মানুষের কল্যাণের জন্য। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধি-নিষেধ মেনে চলা শরীর ও মন উভয়ের জন্যই উপকারী। আর এই বিধি-বিধান না মেনে চললে শরীর ও মন উভয়ই অসুস্থ হয়। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে আজ সমাজে ঘটছে নানা প্রকারের অপরাধ। এর প্রভাবে বাড়ছে অবাধ মিলন, হচ্ছে অবৈধ গর্ভবতী। ফলে, অবৈধ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমেরিকায় ১৯৬৩ সালে ২০ লাখ জারজ সন্তান জন্ম নিয়েছে।[৩১৭]
একজন যুবক যখন নিজেই নিজের যৌবনের অপব্যবহার করছে, তখন প্রথমে শরীরে কষা রোগের সৃষ্টি হবে। এর পর মাথা ব্যাথা, তারপর অনিদ্রা এবং রক্তস্বল্পতা দেখা দিবে। অবাধ যৌনাচারের ফলে মানুষের বিবেক কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তার একটি উদাহরণ হল- এক ব্যক্তি নিউইয়ার্কের একটি দোকানে প্রবেশ করলো। সেখানে ১৮ বছরের একটি মেয়ে বিক্রেতার দায়িত্ব পালন করছিল। সে ব্যক্তি মেয়েটিকে ধরে তার কাপড় খুলে ফেললো এবং তার ইজ্জত লুটতে লাগলো। মেয়েটি চিৎকার দিতে লাগলো কিন্তু কেউ ভ্রূক্ষেপও করল না। মেয়েটি কোন কৌশল অবলম্বন করে তার হাত থেকে ছুটে বাজারের উপর দিয়ে দৌড়ে পালাল। এ লোকটিও পিছু পিছু দৌড়াতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে মেয়েটিকে ধরে ফেলল। প্রথমে তাকে প্রহর করল এরপর তাকে টেনে হিচড়ে দোকানের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। সেখানে তামাসা দেখার জন্য অনেকেই ভিড় জমাল। কিন্তু মেয়েটিকে সাহায্য করল না। তারপর সেখানে পুলিশ আসল এবং মেয়েটিকে দানবের হাত থেকে উদ্ধার করল।

অবাধ মেলামেশা করতে করতে তাতেও যখন তৃপ্তি মেটেনা তখন আরো বিকৃত রুচির পরিচয় দেয়, হয় আরো নির্মম। তখন শুরু করে ধর্ষণের পর হত্যা। এ ঘটনার কিছুদিন পর এ জাতীয় এক নরপশু একটি মেয়ের ফ্লাটে গিয়ে প্রবেশ করল। প্রথমে তার সঙ্গে অপকর্ম করল। তারপর তাকে ছুরি মেরে

جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (আল-কুরআন ২৪ : ৩০-৩১)

[৩১৭] ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, খন্ড ১ - ২, পৃ. ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

হত্যা করে ফেলল। পড়শীরা সকলে এ তামাশা দেখতে থাকল। কিন্তু কেউ তার উদ্ধারে এগিয়ে আসল না।

আবার যিনা-ব্যভিচারের জন্য আমাদের সমাজ ক্ষত বিক্ষত হচেছ। এক পুরুষ বহু নারীতে এবং এক নারী বহু পুরুষে মেলামেশার কারণে একজনের শরীরের রোগ বহুজনের মধ্যে বিস্তার লাভ করছে। এভাবে শত শত বছর ধরে রোগ-ব্যাধি ছড়ানো এবং এর সঙ্গে 'জিনেটিক' প্রভাবে গোটা বিশ্বে নির্মল চরিত্রের একটি পরিবারও পাওয়া যায় না। ফলে, ঘরের প্রশান্তি বিদূরিত হয়, অশান্তি বৃদ্ধি পায়। পুরুষ যতই নিলর্জ্জ ও খারাপ হোক,সে কখনও বরদাশত করে না যে, তার স্ত্রী কয়েক রাত ঘরের বাইরে যাপন করুক। তার স্ত্রী আজ এক জনের বাহুবন্ধনে কাল আরেক জনের বাহুবন্ধনে। স্ত্রী একজনের আর থাকবে আরেক জনের সঙ্গে। স্ত্রী যদি ফুর্তিবাজ হয়ে যায়, তাহলে ঘর সামলাবে কে? আর স্বামী প্রশান্তির খোঁজে কোথায় যাবে? এ ধরনের কার্যকলাপের জন্য সমাজে নৈরাজ্য আর হতাশা চরম ভাবে বিদ্ধ পাচ্ছে, বাড়ছে আত্মহত্যা। আত্মহত্যা আমেরিকায় একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ ৬ মাসে আমেরিকার প্রসিদ্ধ শহর লসএঞ্জেলসে ৭৫হাজার নারীপুরুষ আত্মহত্যা করেছে।[৩১৮]

মহান আল্লাহ বলেন, যখন কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা হলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলতে শুরু করেছে, তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা মানিনা। তারা আরো বলেছে, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধ, সুতরাং আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না।[৩১৯]

স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে দুটি মত প্রচলিত রয়েছে। এর ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা বোধ করছে। একদল লোক ব্যাপক ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে কাজ করছে, সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিরাট অংকের টাকা এ খাতে খরচ করছে। তাদের এক মাত্র লক্ষ জন্মহার কমানো। তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই দেশের এক নম্বর সমস্যা মনে করছেন। জন্মহার কমাতে পারলেই প্রধান সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে তারা প্রচার করছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে ফ্যামিলি প্লানিংকাজে নিয়োজিত মাঠকর্মী পর্যন্ত দেশবাসীকে অবিরত নসীহত করে চলেছেন। এমনকি মসজিদের ইমাম এবং প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণকেও এ কাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করার সাথে সাথে উপর থেকে চাপও সৃষ্টি করা হচ্ছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম বিনামূল্যে ও সস্তায় অতি সহজ লভ্য করার কারণে সমাজ ও পরিবারে যে নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের কোন দুশ্চিন্তা নেই। তারা অন্ধের মতো এক দিকে উৎসাহিত করে যাচ্ছেন অপর দিকে এর পরিণাম চিন্তা করার কোন অবসর তাদের নেই। এর কুফল ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত করেছে সে দিকে খেয়াল করার মত কোন চেতনাই তাদের নেই।

---

[৩১৮] প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৮

[৩১৯] وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ- وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (আল-কুরআন ৩৪ : ৩৪-৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে দেশের আলেম সমাজ ও ধার্মিক লোকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সংগত কারণেই বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে অশ্লীল প্রচারাভিযানের ফলে অবিবাহিতদের মধ্যে ব্যাপক যৌন অনাচার, পত্রিকায় কুমারী মাতার করুণ কাহিনীর খবর, যুব সমাজে যৌতুক ছাড়া বিয়ের প্রতি অনিহা ইত্যাদি কারণে আলেম সমাজ ও ধার্মিক লোকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতি ঘৃনা প্রকাশ করেন এবং জন্মনিয়ন্ত্রণকে জায়েয মনে করেন না। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে দেখা প্রয়োজন, ইহা আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী না ক্ষতিকর। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সব ব্যাপারেই জ্ঞান বুদ্ধি, যুক্তি ও বিবেকের প্রতি মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। অতএব, পবিত্র কুরআন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস অনুযায়ী জ্ঞান বুদ্ধি, যুক্তি ও বিবেক দ্বারা পর্যালোচনা করা হল।

আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস লাইসী বলেন, আমি শুনেছি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) মসজিদের মিম্বারের উপর উঠে বলছিলেন; আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, সব কাজই নিয়াত (সংকল্প) অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। কাজেই যার হিজরাত দুনিয়া লাভের বা কোন মেয়েকে বিয়ে করার নিয়তে হয়েছে তার হিজরাত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে।[৩২০]

এই বিখ্যাত হাদীসটি কষ্টিপাথরে মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রত্যেক কাজের বিচার করে থাকেন। অতএব জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও নিয়তের প্রশ্নটি অত্যন্ত মৌলিক। জন্মনিয়ন্ত্রণের যে আন্দোলন আজ পৃথিবীব্যাপী চালু হয়েছে তা কোন্ উদ্দেশ্যে বা কোন্ নিয়তে? পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব। মানুষ বাড়ছে জ্যামিতিক হিসাবে, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য বাড়ছে গাণিতিক হারে। তাই মানুষের জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যতীত খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব নয় (?)। এ হলো জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রধান যুক্তি। এদের দ্বিতীয় যুক্তি হলো, যে হারে মানুষ বাড়ছে, তাতে কয়েশ বছর পর পৃথিবীতে দাঁড়াবার স্থানও পাওয়া যাবে না (?)। এজন্য এখন থেকে মানব সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, যাতে পৃথিবী এত বড় সমস্যার সম্মুখীন না হয়। এ ব্যাপারে মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন মজীদে বলেছেন, তোমরা অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না। আমিই তোমাদেরকে রিযক দিয়ে থাকি এবং তাদেরকেও (আমি দেব)।[৩২১]

পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযকের দ্বায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত নয়।[৩২২]

কত প্রাণীই রয়েছে যারা তাদের রিযক বহন করে বেড়ায় না। আল্লাহই তাদের ও তোমাদের রিযক দান করেন।[৩২৩]

তিনিই আসমান ও যমীনের যাবতীয় ভান্ডারের অধিকারী। তিনি যাকে খুশী বেশী এবং যাকে খুশী কম রিযক দান করেন।[৩২৪] নিশ্চয় আমি যাবতীয় বস্তু পরিমাণ মত সৃষ্টি করেছি।[৩২৫] আমার নিকট সব জিনিসের ভান্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণ (সেখান থেকে) নাযিল করে থাকি।[৩২৬]

---

[৩২০] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, খন্ড ১ম, ওহীর সূচনা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ১, হাদীস নং ১

[৩২১] وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءاً كَبِيراً (আল-কুরআন ১৭ : ৩১)

[৩২২] أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (আল-কুরআন ১১ : ৬)

[৩২৩] وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ (আল-কুরআন ২৯ : ৬০)

[৩২৪] لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (আল-কুরআন ৪২ : ১২)

[৩২৫] إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (আল-কুরআন ৫৪ : ৪৯)

Dhaka University Institutional Repository

আলকামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর সাথে মিনাতে গমনকালে উসমান (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি তাঁর নিকট হতে দূরে সরে নির্জন আলাপের জন্য অনুমতি চান। অতঃপর যখন আব্দুল্লাহ দেখতে পান যে, তাঁর বিবাহের কোন প্রয়োজন নেই, তিনি আমাকে বলেন হে আলকামা! আমার নিকট এসো! আমি তাঁর নিকট এলে উসমান (রাঃ) তাঁকে বলেন, হে আবূ আব্দুর রহমান! আমি কি তোমাকে একটি কুমারী নারীর সাথে বিবাহ দেব না? যাতে তুমি তোমার শারীরিক শক্তি-সামর্থ ও বলবীর্য ফিরে পাও। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন আমি তা এজন্য বলছি যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে সক্ষম, সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিকে সংবরণকারী, লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণকারী। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে অসমর্থ, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। কেননা তা তার জন্য কামস্পৃহা দমনকারী।[৩২৭]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা অধিক প্রসবদায়ীণী নারীদের বিবাহ কর। কেননা আমি কিয়ামতের দিন তাদের (আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য) নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করবো।[৩২৮]

পবিত্র কুরআন মজীদ ও হাদীসের উপরোক্ত বাণীসমূহ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি যত মানুষ সৃষ্টি করেন প্রয়োজনানুপাতিক হারে তাদের রিযকও সৃষ্টি করেন। অথচ আমরা এ ব্যাপারে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করছি যে কিভাবে সন্তান কম হয় এবং সুখী সংসার গড়ে উঠে। 'তিনি পৃথিবীতে মানুষ পাঠিয়ে দেন, আর তাদের রেশন পাঠান না' একথা যারা মনে করেন, তাদের ধারণা যে আল্লাহ তাদের মতোই অমনোযোগী ও অবিবেচক। মহান আল্লাহ সৃষ্টি সম্পর্কে মোটেই অমনোযোগী নন।

জন্মনিয়ন্ত্রণের ভয়াবহ পরিণাম

আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে নৈতিক সত্তার প্রাধান্য চান। নৈতিকতাই মনুষ্যত্ব এবং নৈতিক চেতনাই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। মানবদেহ বস্তুসত্তা বলেই বস্তুগত সুখের প্রিয়সী। নৈতিকতাবোধ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। বিবেক অন্যায় পথে দেহের দাবী পূরণে আপত্তি জানায় এবং অন্যায় করলে বিবেক দংশন করে। দেহ সত্তা ও নৈতিক সত্তার এই দন্দ্বে বিবেকের বিজয় হলেই মনুষ্যত্বের বিকাশ ও মানবতার কল্যাণ হয়। পিতা মাতার বস্তুগত আরাম-আয়েসের কুরবানীর উপরই সন্তানের সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে। পিতা-মাতা সন্তানের বিকাশ ও কল্যাণের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে তৃপ্তি বোধ করেন। এটা এক পবিত্র আবেগ। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচারাভিযান পিতামাতার এ পবিত্র আবেগকে ধবংস করে মানুষকে ত্যাগের বদলে ভোগের উস্কানী দিচ্ছে। সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা পশুর মধ্যেও আছে। ঐ মমতাবোধ মানুষের মন থেকেও কেড়ে নেয়া হচ্ছে। সন্তান যাতে না হয় সে জন্য যারা প্রাণান্ত চেষ্টা করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে সন্তান জন্ম নেয় সে দুর্ভাগা কি পিতা-মাতার হৃদয় নিংড়ানো স্নেহ মমতা পেতে পারে? এ ভাবেই জন্মনিয়ন্ত্রণ মানুষের বিবেক ও নৈতিকতার উপর আঘাত হানছে। অবৈধ গর্ভধারণ অবৈধ যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে সর্বশেষ বাধা, জন্মরোধ পদ্ধতি সমাজ থেকে সে বাধাও দূর করে দিয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে

---

[৩২৬] وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (আল-কুরআন ১৫ : ২১)

[৩২৭] ইমাম আবূ দাউদ (র), প্রাগুক্ত, খন্ড ৩য়, বিবাহের অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৯৬, হাদীস নং ২০৪২

[৩২৮] মুসনাদে আহমদ, ২য় খন্ড, পৃ ১৭২; রিয়াদ, পৃষ্ঠা ৫০০ হাদীস নং ৬৫৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে দায়িত্বহীন যৌন সম্পর্কের সকল সুযোগ সৃষ্টির পর জন্মরোধ পদ্ধতি এক শ্রেণীর নারীকে ব্যভিচারীনী হতে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছে।

তবে যারা বিবাহ পূর্ব যৌন সম্পর্ককে মোটেই আপত্তিকর মনে করে না, আপত্তি মনে করে না নর-নারীর অবাধ মেলা-মেশা। সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে যদি অবাধ যৌন মিলনের পথ প্রশস্ত হয়, তাতে তাদের মাথা ব্যথা হবার কথা নয়। জন্মরোধ পদ্ধতির আশির্বাদে, বিভিন্ন হোটেল বা ক্লাবের মাধ্যমে যারা নারীকে প্রকাশ্যে পর পুরুষের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতে উৎসাহিত করে, ফলে এক পুরুষে বহু নারী এবং এক নারীতে বহু পুরুষের অবৈধ মেলামেশার কারণে সমাজে বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সোনার সংসার আজ গোরস্থানে পরিণত হয়েছে। এ সমস্ত রোগ-ব্যাধি পুরুষানুক্রমে আজ সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে সিফিলিস, গনোরিয়া, এইড্‌স, ওভারীর টিউমার, বেদনা পূর্ণ ঋতুস্রাব, জরায়ুর ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, বন্ধাত্ব, কিডনী পীড়া, লীভার পীড়া ইত্যাদি রোগে আমাদের সমাজ আজ জরাগ্রস্ত।

জন্মনিয়ন্ত্রণের ষ্টেরিলাইজেশন (পুরুষ এবং মহিলাদের স্থায়ী পদ্ধতি) ও ভ্রুণ হত্যার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। এ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অবিবাহিতদের নাগালের বাহিরে রাখতে হবে। এ সব পদ্ধতি শুধু মাত্র বিবাহিত দম্পতিদের জন্য, শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে সাময়িক সময়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

গবেষণায় ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, যে সকল মহিলা সন্তান কম হওয়ার আশায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছে তাদের অবস্থা কিরূপ হয় নিম্নে তার কিছুটা চিত্র দেওয়া হলো।
এক মহিলা প্রায়ই বেহুঁশ হয়ে যেত। অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন, এমনকি পীর ফকিরের দরবারেও ঘুরেছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। অবশেষে চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকট আনা হল। উক্ত মহিলা কথা প্রসঙ্গে নিজেই বললেন, তিনি লজ্জাস্থানে 'প্রিভেন্টিভ ক্যাপ' রেখেছেন। যেদিন তা রেখেছেন সেদিন থেকে মাঝেমধ্যে বেহুঁশ হয়ে যান। এখন তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন এটা ব্যবহার করা তার জন্য সমীচীন নয়। যখন রোগ নির্ণয় করে লজ্জাস্থানে 'প্রিভেন্টিভ ক্যাপ' অপসারণ করা হলো এবং সামান্য কিছু পথ্য দেওয়া হল, তখন তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। পাগল এক মহিলার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেল, তিনি সুখী সংসার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ২ মাস বড়ি ব্যবহার করেছেন। এভাবে কোন কোন মহিলার এ সকল ঔষধে বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দেয়। কারও কারও পেট বড় হয়ে যায়, কারো বা শরীর ফুলে যায়। বিভিন্ন প্রকার জটিল রোগ সৃষ্টি হয়। মূলত যখনি আমরা স্বভাব সিদ্ধ নিয়ম ভঙ্গ করার চেষ্টা করবো, তখনই আমাদের দিকে আল্লাহর চাবুক পড়তে থাকবে। আমাদের উচিত আল্লাহর নিয়ম-কানুনের দিকে ফিরে আসা। কিন্তু আমরা তার বিপরীত এমন চিকিৎসা আরম্ভ করি, যার ফলে তার শাস্তি দ্বিগুণ নেমে আসে।

আমেরিকার মেক্সিকো ইউনিভার্সিটির চীফ গাইনোকোলোজিষ্ট, ডাক্তার মেডিকিউন, মহিলাদেরকে সতর্ক করে বলেন, খবরদার! যদি সন্তান কম হওয়ার জন্য ঔষধ ব্যবহার কর, তবে অগণিত রোগ

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের জড়িয়ে ধরবে। তুমি শুধু স্থায়ী রোগীই হবে না বরং ক্যান্সারের প্রবল সম্ভাবনা তোমার মাথায় দুলতে থাকবে।

➢ একজন অভিজ্ঞ সার্জন বলেন, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি যে, আপনি গাইনি ওয়ার্ডে গিয়ে জরিপ চালিয়ে দেখুন, জরায়ুর ক্যান্সারে সে সকল মহিলারাই বেশি আক্রান্ত হয়, যারা গর্ভপাত করিয়েছে।

➢ ইসলামের শিক্ষা হলো, অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারীদেরকে তোমরা বিবাহ কর। পক্ষান্তরে "দু'টির বেশী সন্তান নয়, একটি হলে ভাল হয়" এ শ্লোগান নারীদের গর্ভপাত ঘটাতে উৎসাহিত করছে ফলে, নারীরা অসংখ্য রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

➢ গর্ভপাত ঘটালে অগণিত স্ত্রী রোগ (Gyanaecological Disease) দেখা দেয়।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) মহিলাদের ব্রেষ্ট এবং যোনীপথে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় প্রিভেন্টিভ ক্যাপ, দীর্ঘ সময় যাবত বড়ি সেবন ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। যে সকল মহিলা এ সকল ঔষধ নিয়মিত ব্যবহার করেন, রিপোর্ট অনুযায়ী তারা যে কোন সময় ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন।[৩২৯]

হারাম জিনিসের মধ্যে আরোগ্য নেই

হারামের অর্থ হল ঐ জিনিস যা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে সকল জিনিস ব্যবহার করতে শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে তা হারাম। বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট যে, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিসকে যখন ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন তখন আল্লাহর কোন অনুগত বান্দার জন্য তা ঔষধ হিসাবে এবং চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা কিরূপে বৈধ হতে পারে? যেখানে সর্বোতভাবেই তা ব্যবহার নিষেধ, সেক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় তা ব্যবহার করা কিরূপে জায়েয হবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরোল্লেখিত হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, হারাম বস্তুর মধ্যে আরোগ্য দানের কোন ক্ষমতা নাই এবং এ কথাও প্রমাণিত যে, হারাম কোন কিছুকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা নিষেধ।

রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অপরিমিত ব্যবহার

আমাদের দেশে সকল প্রকার ফসল ফলানোর জন্যই রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। আজ থেকে ৩০ বছর পূর্বেও রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার ছিল অনেক কম। তখন জমিতে উর্বরা শক্তি ছিল প্রচুর। বর্তমান সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ফসলি জমি কমে যাওয়ার কারণে বছরে একই জমিতে কয়েক প্রকার ফসল ফলানোর প্রয়োজন হয়। অধিক ফসল প্রাপ্তির আশায় ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং ফসলকে পোকা-মাকড়ের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। এই রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের ব্যবহার বৈজ্ঞানিক রূপে করা

---

[৩২৯] ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, খন্ড ১ - ২, পৃ. ৩৭০-৩৭২

Dhaka University Institutional Repository

হলে খাদ্যদ্রব্য এবং পরিবেশের উপর কম ক্ষতিকর প্রভাব পড়তো। কিন্তু আমাদের দেশের বেশির ভাগ কৃষকই এ ব্যাপারে কোন নিয়ম-কানুনের প্রয়োজনীয়তা মনে করে না। তারা কীটনাশকের মত প্রাণঘাতী বিষের যত্র তত্র ব্যবহার করে। কারবুফুরাণ, ফেনথিয়ন, ইমিডাক্লোপ্রিয়ড ইত্যাদি কীটনাশক সাধারনত আমাদের দেশের ফসলে ব্যবহার করা হয়। 'কারবুফুরাণ' অর্গানোকার্ব গ্রুপের ঔষধ। এই ঔষধ সাধারণত ধান, আখ ও চা গাছ ইত্যাদি ফসলের জন্য ব্যবহৃত হয়। 'ফেনথিয়ন' অরগানো ফসফেট গ্রুপের ঔষধ। এই ঔষধ সাধারণত ধান, আখ, লেবু জাতীয় গাছ, আম, ইত্যাদি ফসলের জন্য ব্যবহৃত হয়। 'ইমিডাক্লোপ্রিয়ড' ক্লোরোনিকোটিনাইন গ্রুপের ঔষধ। এই ঔষধ সাধারণত ধান, সিম, তুলা, আখ, চা, বেগুণ, আলু ইত্যাদি ফসলের জন্য ব্যবহৃত হয়।

অনুসন্ধানে জানা যায়, আখ এবং বিভিন্ন প্রকারের সব্জিতে যেভাবে কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তা রীতিমত শিউরে উঠার মতো। যে পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তাতে সমস্ত ফসলই বিষাক্ত হয়ে যায়। মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানে আরো উদ্বেগজনক তথ্য পাওয়া যায়। প্রতিটি ঔষধের কার্যক্ষমতা অন্তত ৭ থেকে ১৪ দিন। তবে ব্যবহৃত বেশির ভাগ ঔষধের মেয়াদ প্রায় ১৪ দিন। নিয়ম অনুযায়ী ঔষধের কার্যকারীতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন আখ বা সব্জি খাওয়া যাবে না। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা, ক্ষেতে ঔষধ প্রয়োগের পরের দিনই ক্ষেত থেকে সব্জি সংগ্রহ করা হয়, যা সম্পূর্ণ বিষ যুক্ত। এই বিষ যুক্ত সব্জিই আমরা প্রতিদিনই খেয়ে থাকি। আর এ কারণে যাদের জীবনী শক্তি দূর্বল তাদের প্রায় সারা বছরই লিভার এবং পাকস্থলীর পীড়া লেগেই থাকে। এদের সুস্থ হয়ে বাঁচার অধিকার যেন কেড়ে নেয়া হয়েছে। যারা সুস্থ আছে তাদের খাদ্য বিষের প্রভাবে জীবনীশক্তি দূর্বল হয়ে ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ভারতীয় তৈরী 'ইমিডা ক্লোপ্রিড' কীটনাশক বেগুণ, ধান বা আমে ব্যবহার করা হয়, যার ক্ষতিকর প্রভাবে ক্যান্সার হওয়ার ঝুকি খুবই বেশি। কৃষি বিভাগের মাঠ পর্যায়ে যে সমস্ত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা রয়েছেন, কৃষকরা তাদের কথা ভ্রুক্ষেপ করে না। কৃষকরা সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন এবং কীটনাশক তাদের নাগালের মধ্যে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করেনা, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।[৩৩০] বিবেক বুদ্ধি খাঁটিয়ে বোঝার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, অথবা বিবেক বুদ্ধি না খাটানোর কারণে তারা তিরস্কৃত হবে'। বিবেক বুদ্ধি খাঁটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ পাক কুরআনে শব্দটি উল্লেখ করেছেন। যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ তাদের বিবেক বুদ্ধি কাজে না লাগিয়ে জেনে বুঝে অথবা অজ্ঞাতসারে আমাদের খাদ্যকে বিষাক্ত করছেন এবং কতৃত্বশীল ব্যক্তিরা সংশোধণের উপায় বের না করে নিশ্চুপ আছেন, তারা সতর্ক না হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেবেন। অতএব স্বাস্থ্যগত গুরুত্ব অনুধাবন করে এ ব্যাপারে আমাদের সকলেরই নিজ নিজ দায়ীত্বের প্রতি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

---

[৩৩০] وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ (আল-কুরআন ১০ : ১০০)

Dhaka University Institutional Repository

বিষের মধ্যে বসবাস

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। এই খাদ্য থেকে শক্তি তৈরী হয়। আমাদের জীবন নামের ইঞ্জিনটি এই শক্তি দ্বারাই চালিত হয়। আমরা সাধারণত দিনে তিন বার খাদ্য গ্রহণ করি। এ ছাড়াও আমরা দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করি। আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি, আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তা কতটা নিরাপদ? আমরা যে ভাত বা রুটি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি এর বেশীর ভাগই কীটনাশক বিষ যুক্ত। অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে খাদ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সব্জি গ্রহণ করি তা কতটা স্বাস্থ্য সম্মত? কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং ঔষধের ক্রিয়া থাকা অবস্থায় আমরা বাজার থেকে ক্রয় করে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার ফলে খাদ্য হয় বিষাক্ত। আমরা প্রতিদিন পুষ্টির অভাব পুরণের জন্য যে সমস্ত ফল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি তা কতটা নিরাপদ? ফলে বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য স্প্রে করার কারণে ফল পঁচে না এবং মাছি পর্যন্ত বসে না। কলাতে এক প্রকার ঔষধ স্প্রে করা হয় যার ফলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে গাঢ় হলুদ বর্ণের রং হয়ে যায়। আম এবং লিচু গাছে মুকুল আসার পুর্ব থেকেই বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা স্প্রে করা শুরু হয় এবং ফল বিক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

আমরা যে দুধ শহর এলাকা থেকে (বিশেষ করে ঢাকা শহরে) ক্রয় করি সেটা কতটা স্বাস্থ সম্মত? ভ্রাম্যমান আদালত অভিযানে বের হলে বিক্রেতা ব্যতীত দুধের পাত্র পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় স্বাভাবিক। কয়েকটি ক্যামিক্যাল একত্রিত করে দুধের মত দেখতে এক প্রকার দ্রব্য দুধ হিসাবে বর্তমানে বাজারে বিক্রয় হয়। আমিষের বড় অংশ আমরা মাছ থেকে পূরণ করি। কিন্তু আমরা প্রতিদিন খাদ্য হিসাবে যে মাছ গ্রহণ করছি তা কতটা স্বাস্থ্য সম্মত? কারণ, মাছের কথা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে ফরমালিনের নাম স্মরণে এসে যায়। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত প্লাস্টিকের পাত্র একের অধিক বার ব্যবহার করি সেটা কতটা স্বাস্থ্য সম্মত? বেশির ভাগ প্লাস্টিকের পাত্র একবারের অধিক ব্যাবহার না করার জন্য স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ পরামর্শ দেন। রান্নার কাজে আমাদের ব্যবহৃত এ্যালুমিনিয়মের পাত্র কতটা স্বাস্থ্য সম্মত? কারণ, ডাক্তার ডেভিস্ট নাইট এফ. সি. এস. লিখেছেন, এ্যালুমিনিয়ম পাত্রের ব্যবহার ডাক্তারী দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিকর।[৩৩১]

আমরা যে কোমল পানীয় পান করছি তা কিডনীর জন্য কতটা সহনশীল? কারণ কিডনী পরবর্তীতে অতিরিক্ত পানি মূত্র গ্রন্থির মাধ্যমে বের করে দেয়। আমরা যে সমস্ত পোল্ট্রি মুরগী এবং ডিম খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি তা কতটা স্বাস্থ্য সম্মত? কারণ ৩০ দিন থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে মুরগী (দেড় কেজি থেকে দুই কেজি ওজনের) বড় করতে যেয়ে যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করা হয় তা আমাদের জন্য কতটা স্বাস্থ্য সম্মত? তাহলে আমাদের এখন চিন্তা করার সময় নয় কি? আমরা দৈনন্দিন জীবনে কতটা স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য গ্রহণ করছি। এই খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের জন্য কতটা নিরাপদ?

বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ও কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় আমাদের পাকস্থলীর অবস্থা দিন দিন খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে ততোই নতুন নতুন উচ্চ ক্ষমতাশীল গ্যাস্ট্রিকের ঔষধ তৈরী হচ্ছে। লিভার ও এখন আর পূর্বের মত কাজ করতে পারে না। এক পর্যায়ে প্যানক্রিয়াস আর পূর্বের মত ইনসুলিন তৈরী করতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে ডায়াবেটিকসের রোগীর সংখ্যা দিন দিন

---

[৩৩১] ডাঃ মুহাম্মাদ তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, খন্ড ১ - ২, পৃ. ৩৬৪

Dhaka University Institutional Repository

বেড়েই চলেছে। এর সঙ্গে যদি কোন ব্যক্তির শারীরিক পরিশ্রমের কমতি হয়, তাহলে জীবন ধবংসকারী ডায়াবেটিকস তার জন্য অবধারিত। দিন দিন আমাদের হৃৎপিন্ডের অবস্থাও ক্রমান্বয়ে দূর্বল হচ্ছে। হৃৎপিন্ডের রোগীর সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিডনী রোগ এবং মরণ ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে কয়েক গুণ বেশী। এর প্রভাবে দিন দিন প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে বন্ধাত্ব এবং গাইনি রোগীর সংখ্যা। এভাবে বিভিন্ন খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাবে আমরা দিন দিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছি। এখন আর আমরা শুধু মাত্র খাদ্যের উপর ভরসা করতে পারছি না। খাদ্যের পাশপাশি বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন (ঔষধ) আমাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ হতে শুরু করেছে। এ ধারা বন্ধ করা না হলে নিকট ভবিষ্যতে গোটা দেশই একটি হাসপাতালে পরিণত হতে পারে। এই চলমান বিপজ্জনক পথ থেকে ফিরে আসার জন্য সবার মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান, প্রশিক্ষণ, গণ সচেতনতাসহ ইসলামী ধারায় জীবন পরিচালনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটির পাত্র, কাঁচের পাত্র, কাঠের পাত্র ইত্যাদি ব্যবহার করতেন, যা ছিল স্বাস্থ্য সম্মত। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে জীবন পরিচালনা করতে বলেছেন। অপর দিকে ইসলাম কারো ক্ষতি করতে নিষেধ করেছে।

ক্ষতিকর ঔষধ ব্যবহার না করা

'খবীস' অর্থ অপবিত্র, বাজে, ক্ষতিকর, খারাপ, নষ্ট, এবং অপছন্দনীয়। যাকে পবিত্র কালামে হারাম পর্যন্ত বলা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাপাক কোন কিছু ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এটা পবিত্রতা, রুচীবোধ, এবং মানবীয় মর্যাদার পরিপন্থী। তবে অপারগতা থাকলে ভিন্ন কথা। কেননা মানুষ যখন একেবারেই নিরূপায় হয়ে যায় এবং তার জন্য অন্য কোন পথই খোলা না থাকে, এমতাবস্থায় জীবন বাঁচাবার জন্য শরীয়ত জীবন রক্ষা পরিমাণ যে কোন খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। নতুবা সকল নাপাক জিনিসই নিষিদ্ধ। আল্লাহ তোমাদের জন্য মৃত দেহ, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম ঘোষনা করা হয়েছে সে সব প্রাণী হারাম করে দিয়েছেন, তবে কোন লোক যদি বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে সে তা বিদ্রহী হিসাবে অথবা সীমালঙ্ঘন কারী হিসাবে না করে, তবে তাতে কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহ কারী।[৩৩২]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবন বিনাশী ঔষধ অর্থাৎ বিষ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৩৩৩]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বিষপান করে নিজেকে হত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনের অনন্ত কালের বাসিন্দা হয়ে বিষপান করতে থাকবে।[৩৩৪]

---

[৩৩২] إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন ২ : ১৭৩)

[৩৩৩] ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র), প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ জীবন বিনাশী ঔষধ ব্যবহার নিষিদ্ধ, হাদীস নং ৩৪৫৯

Dhaka University Institutional Repository

যদি এমন কোন ঔষধ হয়, যা এক রোগে উপকারী কিন্তু তাতে অন্য কোন রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে ঐ ঔষধ বর্জন করা উচিত। যদি কোন ঔষধ দ্বারা রোগ সৃষ্টি হওয়ার ভয় থাকে তবে তা ত্যাগ করা কর্তব্য। অসুস্থ ব্যক্তি কিসে আরাম পাবে, কিসে তার শক্তি অর্জিত হবে ও অসুস্থতা দূর হবে চিকিৎসকের এটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর এ মহান উদ্দেশ্য নিয়েই মানুষ তিক্ত স্বাদহীন ঔষধ সেবন করে, ইনজেকশন গ্রহণ করে, অপারেশনের কষ্ট সহ্য করে। এরূপ বহু উদহরণ আছে যে, অনভিজ্ঞ এবং হাতুড়ে চিকিৎসক অনেক সময় তাঁর রোগীদের এমন ঔষধ দিয়ে থাকে যা কোন একটি রোগকে তো দূর করে দেয় ঠিকই তবে অপর একটি রোগ সৃষ্টিরও কারণ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে সস্তা খ্যাতি, নাম-যশের আকাংখী ও লোভী চিকিৎসকগণ জেনে বুঝেই এ ধরনের অপচিকিৎসা করে থাকে। অতএব এ সকল লোক মানুষের জীবন নিয়ে খেল-তামাশা করে এবং আল্লাহর ভয়ে তাদের বুক প্রকম্পিত হয় না।

মাছিবাহিত বিভিন্ন রোগের কারণ ও চিকিৎসা

মাছি একটি উড্ডয়নশীল ছোট প্রাণী। এই প্রাণীটি সবসময় ময়লাযুক্ত জায়গায় বসবাস করে। এ ছোট্ট প্রাণীটির ক্ষতিকর প্রভাব এবং এর থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা দেখে বিজ্ঞানীরা আজ বিস্ময়ে হতবাক।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কারো পানির পাত্রে মাছি পতিত হলে এটাকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে উঠাও। কেননা মাছির এক পাখায় রোগ ও অপর পাখায় রোগের প্রতিষেধক রয়েছে।[৩৩৫]

মাছি ময়লাযুক্ত স্থানে বসবাস করার কারণে এ প্রাণীটিকে কেউই পছন্দ করে না। মাছির বিষক্রিয়া সম্পর্কে কারো অজানা নেই। তবে এর এক পাখায় রোগ এবং অন্য পাখায় শেফা রয়েছে। এ সম্পর্কে কারো যদি দ্বিমত থাকে; তার স্মরণ রাখা উচিত যে, এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী। সুতরাং এতে সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশই নেই। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগেও কেহ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেনি। এ সকল তত্ত্ব দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায়, মাছির মধ্যে রোগ নিরাময়ের প্রভাব রয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মাছি নিমজ্জিত খাদ্য অথবা পানকৃত পানি গ্রহণ করা না করা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং কোন ব্যক্তি এমন খাদ্যাদি গ্রহণ করতে না চাইলে এতে জোর করার কিছুই নেই।

বসে কাজ করলে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে

গবেষণায় এ কথা বলা হয়েছে যে, দীর্ঘ সময় বসে কাজ করলে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ও মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে। এমনকি ব্যায়াম করলেও এই ঝুঁকি এড়ানো যায় না। গবেষণার ফল ডায়াবেটলজিয়ায়

---

[৩৩৪] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৪৬০

[৩৩৫] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২৩২৯, হাদীস নং ৫৩৬৬

Dhaka University Institutional Repository

(ডায়াবেটিক্স রোগ সংক্রান্ত প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকা) প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যমান ১৮টি গবেষণা বিশ্লেষণ করে গবেষণাটি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের লিসেস্টার ও লফবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা। প্রায় আট লাখ লোকের উপর ওই ১৮টি গবেষণা করা হয়েছিল। দীর্ঘ সময় ধরে বসে কাজ করেন বা শুয়ে থাকেন, এমন ব্যক্তিরা বেশী করে হাঁটাচলা করলে অবশ্যই উপকৃত হবেন। আধুনিক সমাজে টেলিভিশন দেখা, গাড়িতে অবস্থান করা বা কম্পিউটার ব্যবহৃত হয় বেশী। তাই উন্নত সমাজে অনেকেই শরীরের ভারসাম্য রক্ষার জন্য ব্যায়াম করেন। আগের গবেষণাগুলোতে দেখা গেছে, মানুষের বসে কাজ করার মাত্রার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন কেউ সপ্তাহে ১৪ ঘন্টার কমবেশী সময় টেলিভিশন দেখে কাটিয়ে দেন। আবার অনেকে ৩ থেকে ৮ ঘন্টা পর্যন্ত বসে কাজ করেন। গবেষক দলের প্রধান লিসেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপক এমা উইলমট বলেন, বেশী সময় ধরে বসে কাজ করা ব্যক্তিদের ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও মৃত্যুর ঝুঁকি বেশী। কোন কর্মী সারা দিন ডেস্কে বসে কাজ করলে তার উচিত কাজ শেষে সোজা ব্যায়ামাগারে চলে যাওয়া। অধ্যাপক এমা উইলমট আরো বলেন, কেউ কেউ দিনে সাধারণত আধা ঘন্টা ব্যায়াম করে মনে করেন, তারা ভালোই আছেন। কিন্তু তাদের বাকি সাড়ে ২৩ ঘন্টা নিয়েও ভাবা উচিত।[৩৩৬]

গবেষণাটির উল্লেখযোগ্য একটি দিক হচ্ছে, বেশি সময় ধরে কাজ করার সঙ্গে ডায়াবেটিসের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া। এমা উইলমট আরো বলেন, যারা বসে কাজ করেন, তাদের গ্লুকোজের মাত্রার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা কমে যায়। গবেষক দলের সদস্য লফবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্পুয়ার্ট বিডল বলেন, কম্পিউটারে বসে টানা কাজ এড়াতে ল্যাপটপে কাজ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ল্যাপটপটি এমন জায়গায় রাখতে হবে, যাতে সেটি আনতে গিয়ে উঠা-বসা করতে হয়।[৩৩৭]

সকালের নাস্তা না খেলে চর্বি বাড়ে

চর্বি কমাতে উঠেপড়ে লেগেছেন? ছেড়ে দিয়েছেন সকালের খাবার? কিন্তু এতেও উপকার হচ্ছে কি? বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সকালে খাবার না খেলে মানুষের শরীরে আরো বেশি চর্বি জমে। সকালের নাস্তা না খেলে মানুষের মস্তিষ্ক কেমন খাবারের প্রতি আগ্রহী হয় সেই বিষয়ে গবেষণা করা হয়। লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের ২১ জনের মস্তিষ্ক অভিবীক্ষণ (স্ক্যান) করে দেখেন বিজ্ঞানীরা। এতে দেখা গেছে, স্বাভাবিক ওজনের মানুষের প্রত্যেকেই সকালের নাস্তা গ্রহণ না করার পর অধিক ক্যালরিযুক্ত খাবারের প্রতি আসক্তি দেখিয়েছে। গবেষকরা বলেছেন, সকালের খাবার না খেলে অধিক ক্যালরিযুক্ত খাবারের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করতে মস্তিষ্ক পক্ষপাতমূলক আচরণ করে। যারা সকালে নাস্তা গ্রহণ করেন না তারা দিনের অন্যান্য ভাগে অনেক বেশি খাবার গ্রহণ করেন। সকালে নাস্তা করেননি এটা মাথায় রেখেই তারা খাবারের প্রতি বেশি আসক্তি দেখান। বাড়তি নজর থাকে চর্বিযুক্ত খাবারের প্রতি। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা বলেছেন, সকালের খাবার গ্রহণ না করলে তা চর্বি কমাতে কোন ভূমিকাই রাখে

---

[৩৩৬] দৈনিক *প্রথম আলো*, ১৮ অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১১

[৩৩৭] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

না। সম্প্রতি নিউরোসায়েন্স ২০১২ সম্মেলনে এ-সংক্রান্ত একটি গবেষণা নিবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে।[৩৩৮]

টেলিভিশন দেখলে আয়ু কমে

অবসরে কিংবা প্রয়োজনে টেলিভিশন না দেখলে চলে না। পরিবারের প্রতিটি সদস্যদের জন্য এটা সত্য। দীর্ঘ সময় টেলিভিশনের সামনে বসেও থাকেন কেউ কেউ। এবার বিজ্ঞানীরা তাদের নতুন করে ভাবার জন্য একটি তথ্য দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন প্রতি ঘন্টায় টেলিভিশন দেখায় ২২ মিনিট পর্যন্ত আয়ু কমায়। তবে এটি সবার জন্য নয়। টেলিভিশন দেখার সঙ্গে শারীরিক অন্যান্য সমস্যা ও নেতিবাচক অভ্যাসগুলো যুক্ত হয়ে আয়ু কমানোর পরিমাণটি নির্ধারণ করে। গবেষণাটি করেছেন অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। ব্রিটিশ সাময়িকী 'স্পোর্টস মেডিসিন'-এ প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখানো হয়, টিভি দেখা মৃত্যুর হারের উপরও প্রভাব ফেলে। অষ্ট্রেলিয়ায় ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ১১ হাজার ২৪৭ জনের উপর পরিচালিত এ সমীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, টিভি দেখা ও না দেখা দর্শকদের প্রত্যাশিত জীবনকালের মধ্যে পার্থক্য আছে। গবেষকরা বলেছেন, কম কাজ করা, মোটা শরীর ও ধুমপান- এমন সব অভ্যাস ও শারীরিক সমস্যার সঙ্গে বাড়তি টেলিভিশন দেখা মানুষের আয়ু কমিয়ে দেয়। যারা প্রতিদিন ৬ ঘন্টা করে টিভি দেখেন, তারা শারীরিক শ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এমন অবসর কাটানো ব্যক্তিদের চেয়ে ৫ বছর আগেই মারা যেতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়ার নির্দেশিকাতে শিশুদের ২ ঘন্টার বেশি টিভি দেখতে দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে কোন নির্দেশনা নেই।[৩৩৯]

হাতুড়ে ডাক্তার

মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পেছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।[৩৪০]

শু'আয়েব (রাঃ) এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে (অন্যের) চিকিৎসা করে, অথচ তার চিকিৎসা জ্ঞান আছে বলে ইতিপূর্বে জানা যায়নি তাহলে সেই দায়ী হবে।[৩৪১]

যদি এমন কোন ব্যক্তি চিকিৎসা করে যার চিকিৎসা বিষয়ে কোন জ্ঞান বা পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, এমতাবস্থায় যদি রোগীর কোন ক্ষতি হয় তাহলে রোগীর সমস্ত দায় দায়িত্ব উক্ত চিকিৎসকের উপর বর্তাবে। যে সকল অনভিজ্ঞ চিকিৎসক মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন নিয়ে খেলা করে তারা শুধূ মাত্র আইনের দৃষ্টিতেই দোষী নয় বরং মানবতার দৃষ্টিতেও দোষী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা নীতি অনুযায়ী তাদেরকে মহান আল্লাহর সামনে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। সনদ-বিহীন হাতুড়ে চিকিৎসক ছাড়াও সার্টিফিকেটধারী অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ, চাই সে হেকিম,

---

[৩৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[৩৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

[৩৪০] وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (আল-কুরআন ১৭ : ৩৬)

[৩৪১] ইমাম ইব্ন মাজাহ্, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ চিকিৎসা জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা করা, হাদীস নং ৩৪৬৬

Dhaka University Institutional Repository

কবিরাজ অথবা এলোপ্যাথিক বা হোমিপ্যাথিক ডাক্তার এ বাস্তবতাকে ভুলে গেলে চলবে না যে, সর্ব অবস্থায়ই সে একজন মানুষ। সুতরাং যখন সে কোন রোগ নির্ণয়ে অক্ষম অথবা সঠিক ঔষধ নির্বাচন করতে না পারে তখন শুধু অনুমানের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া উচিত নয়। আর যদি তার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভুল চিকিৎসায় রোগীর কোন সমস্যা হয় তবে সে আল্লাহ এবং মানব জাতি উভয়ের নিকটই দোষী সাব্যস্ত হবে। অনভিজ্ঞ এবং হাতুড়ে চিকিৎসক অনেক সময় রোগীদের এমন ঔষধ দিয়ে থাকে যা কোন একটি রোগকে তো দূর করে দেয় ঠিকই তবে অপর একটি রোগ সৃষ্টিরও কারণ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে সস্তা খ্যাতি, নাম-যশের আকাঙ্খী ও লোভী চিকিৎসকগণ জেনে বুঝেই এ ধরনের অপচিকিৎসা করে থাকে। অতএব এ সকল লোক মানুষের জীবন নিয়ে খেল-তামাশা করে এবং আল্লাহর ভয়ে তাদের বুক প্রকম্পিত হয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীস জানার পর হাতুড়ে চিকিৎসকদের মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করার পেশা ত্যাগ করা উচিত।

মেকআপের ক্ষতি

শারীআতের সীমার মধ্যে থেকে নারীদের সৌন্দর্য চর্চা করা কেবল বৈধই নয়; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা কাম্যও। বিশেষ করে স্বামীদের উদ্দেশ্যে নারীদের সৌন্দর্য চর্চা করা পূণ্যের কাজ। কারণ এর ফলে স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের আকর্ষণ ও ভালোবাসা বেড়ে যায়। যে সব সৌন্দর্য উপকরণ নারীদের চেহারা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং তাদের চেহারার কোন ক্ষতি সাধন করে না এবং তাতে যদি চেহারার আসল রূপ চাপা না পড়ে, তা ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই। অপর পক্ষে যে সব সৌন্দর্য উপকরণ চেহারার ক্ষতি সাধন করে এবং যাতে চেহারার আসল রূপ চাপা পড়ে যায়, তা ব্যবহার করা উচিত নয়। এ কারণে মেহেদী কিংবা ক্রীম অথবা কসমেটিকসের সাহায্যে মুখমন্ডলকে কৃত্রিম উপায়ে এমন ভাবে লাল, ফর্সা বা উজ্জ্বল করা জায়েয নয়, এতে চেহারার আসল রূপই চাপা পড়ে যায়। এতে অনেক সময় বিবাহ প্রার্থী ছেলে বা ছেলে পক্ষ ধোঁকায় পড়ে যায়। তবে স্বামীদের কাছে সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য তাদের অনুমতি নিয়ে স্ত্রীদের তা করতে কোন দোষ নেই। তবে বর্তমানে আমাদের দেশে চেহারার রং ফর্সা ও উজ্জ্বল করতে স্টেরয়েড জাতীয় মলমের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিউটিশিয়ানরা মুখের রং ফর্সা করার জন্য এ জাতীয় মলম ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকে। এ ধরনের স্টেরয়েড জাতীয় মলম ত্বকে দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে অ্যালার্জি সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলে মুখে চুলকানি ও গোটা দেখা দেয়। এছাড়াও ত্বক শুকিয়ে পাতলা হয়ে যেতে পারে এবং ত্বকের সরু রক্তনালীগুলো প্রসারিত হতে পারে। সূর্যের আলোর অতি বেগুনি রশ্মি ত্বককে কাল করে দেয়। মুখের ত্বক যাদের কালো, পারতপক্ষে সূর্যের আলো এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও সূর্যের আলোর সাহায্যে আমরা ভিটামিন 'ডি' পেয়ে থাকি।

চর্ম-অ্যালার্জি ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দিদারুল আহসান মহিলাদেরকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেন, যারা জন্মগতভাবে কালো অথবা শ্যামলা, তারা মলমের মাধ্যমে ফর্সা হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালাবেন না। কারণ এতে ত্বক সাময়িক ভাবে কিছুটা ফর্সা হতে পারে, কিন্তু ঔষধ বন্দ করে দেওয়ার পর আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। মনে রাখবেন, কালোই জগতের আলো! তবে যদি কেউ কালো নিয়ে খুব

Dhaka University Institutional Repository

দুচিন্তায় ভোগেন, তবে একটু বেশী করে গাজর খাবেন। গাজরে ক্যারোটিন থাকে, যা ত্বকের গায়ে হালকা হলদে আভা এনে দেয়।[৩৪২]

যতটুকু জানা গেছে যে, মেকআপ যদিও কিছু সময় ধরে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; তথাপি চেহারার জন্য তা ভীষণ ক্ষতিকর। এর ফলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে চেহারার রঙ ও উজ্জ্বল্য অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। তখন মেকআপ বা অন্য কিছু দিয়ে তা ধরে রাখা যায় না। অতএব ব্যবহারের পূর্বে ভেবে দেখতে হবে মেকআপ ক্ষতিকর কিনা। যদি বাস্তবিকই ক্ষতিকর হয়ে থাকে, তবে তা ব্যবহার করা কোন মতেই শারী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। কারণ, ইসলামের মূলনীতি, যা ক্ষতিকর তা নিষিদ্ধ।[৩৪৩]

কখনো মেয়েদের চেহারায় মেসতা, ছোট ছোট দাগ, ব্রণ, ফুস্কুড়ি ইত্যাদি দেখা দেয়। ঔষধ সেবন অথবা মলম ব্যবহারের সাহায্যে এ সব দাগ দূর করে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও শ্রী রক্ষা করতে কোন দোষ নেই। সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে মুখে ক্রীম ব্যবহার করতে কোন নিষেধ নেয়, যদি তাতে মুখের কোন প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। সাধারণত মুখের ক্রীমে পারফিউম ছাড়াও কিছু জৈব রং যেমন এজোডাই, লেনোলিন এবং সংরক্ষক হিসেবে প্যারাবেন ব্যবহার করা হয়, যা চেহারার জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের ক্রিমের প্রতিক্রিয়া চামড়া জ্বালা করা ও এলার্জিমূলক।[৩৪৪]

লিপিস্টিকের ক্ষতি

লিপিস্টিক ঠোঁটের জন্য ক্ষতিকর। লিপিস্টিক ব্যবহারের ফলে ঠোঁটের আদ্রতা ও মসৃণতা হ্রাস পায়। অনেক সময় এর ব্যবহারের ফলে ঠোঁট ফেটে যায়। অভিজ্ঞগণ বলেন, লিপিস্টিক ব্যবহারের পর ছয় ঘন্টা পর্যন্ত খাদ্য-পানীয়, ধুলাবালি ও অপরিচ্ছন্ন সবকিছুর সংস্পর্শ থেকে ঠোঁটকে রক্ষা করা উচিৎ, নতুবা ঠোটে ছত্রাক জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই মহিলাদের জন্য লিপিস্টিক খুবই ক্ষতিকর।[৩৪৫] ইসলামের মূলনীতি হলো, যা ক্ষতিকর তা নিষিদ্ধ।[৩৪৬] এর আলোকে লিপিস্টিকও নিষিদ্ধ হবে। তদুপরি কিছু কিছু ব্রান্ডের লিপিস্টিকে 'রোডামিন বি' ও 'ব্রিলিয়েন্ট ব্লু' নামের যে রঙ থাকে, তা ক্যান্সার সৃষ্টির সাথে জড়িত বলে চর্ম বিশেষজ্ঞগণ অভিযোগ করেন।[৩৪৭]

নখপালিশের ক্ষতি

আজ থেকে দুই হাজার বছর আগে ডাক্তারগণ আঙ্গুলের নখ এবং স্বাস্থ্যের সম্পর্ক বুঝতে পেরেছিল। বর্তমানে ডাক্তারদের দৃষ্টি সর্ব প্রথম রোগীর নখের উপর পড়ে। নখের রং দেখে রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার ধারণা নেওয়া হয়। নখপালিশ ব্যবহারের ফলে নখের স্বাভাবিক রং দেখে রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার ধারণা নেওয়া সম্ভব নয় ফলে, সঠিক চিকিৎসার প্রয়োজনে, রোগীকে রক্তের পরীক্ষা করাতে হয়, এতে সময় এবং অর্থ ব্যয় দু'ই বৃদ্ধি পায়। বর্তমান যুগের মহিলারা নখের যে পালিশ ব্যবহার

---

[৩৪২] ডা.দিদারুল আহসান, রমণীর মুখের রঙ বদলাতে মলম, *নয়া দিগন্ত*, ২৩ মার্চ ২০০৮, পৃ. ১১

[৩৪৩] ড. আহমদ আলী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক পর্দা ও সাজসজ্জা*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০১০ খ্রি. পৃ. ১৯৬

[৩৪৪] ডা. নাজমুল আলম, প্রসাধনী, *মাসিক পৃথিবী*, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৪৬

[৩৪৫] ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, খন্ড ৩ - ৪, পৃ. ১১৯

[৩৪৬] ড. আহমেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

[৩৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

করে তা নখের জন্য খুবই ক্ষতিকর। চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে, নেইল পালিশ দেহের জন্যেও ক্ষতিকর। নখপালিশ নখের বায়ুকূপ বন্ধ করে দেয় এবং নখের স্বাভাবিক আদ্রতা শোষণ করে। এর ব্যবহারে নখের উপর আস্তরণ জমে যায়। এ ধরনের অবস্থায় ফরজ গোসল ও অজু বিশুদ্ধ হবে না।

নখপালিশের প্রধান রাসায়নিক উপাদান 'ফরমালডিহাইড প্লাস্টিক' ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে 'নিকেল'। 'ফরমালডিহাইড প্লাস্টিক' ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। এর থ্যালেট লিভার, কিডনী ও প্রজননতন্ত্রের ক্ষতি করে। নেইল পালিশের টলুইন অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থিগুলোর কার্যক্রমে কিছু বিঘ্ন ঘটায়। এর জন্য শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মানোরও আশংকা থাকে।[৩৪৮]

নখ লম্বা করা

প্রতিটি সুস্থ মানুষের নখ প্রতি মাসে এক ইঞ্চির এক অষ্টমাংশ বৃদ্ধি পায়। একজন সাধারণ মানুষের জীবনে ৫০ বছরে আঙ্গুলে ৬ ফুট নখ সৃষ্টি হয়।[৩৪৯]

লম্বা নখ রাখা বর্তমানে ফ্যাশন মনে করা হয়। অথচ এটা মারাত্মক নোংরামী। লম্বা নখ জীবাণু বহন করে, ফলে ডায়রিয়ার মত নানাবিধ মারাত্মক রোগ হতে পারে। নিয়মিত নখ কেটে পরিচ্ছন্ন রাখা সুরুচির পরিচয় বহন করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশটি বিষয়কে মানব স্বভাবের অংশ হিসাবে গণ্য করেছেন তন্মেধ্যে 'নখকাটা' অন্যতম।

সুগন্ধি ও তার ব্যবহার

যে সব জিনিস মানব মনে উত্তেজনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করে, তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম কিছু নিয়ম-কানুন বেধে দিয়েছে। নারী ও পুরুষ কোন্ ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ঘরোয়া পরিবেশে যে কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই। তবে ঘরের বাইরে তারা যে সুগন্ধি ব্যবহার করবে তা এমন হতে হবে যার রঙ আছে গন্ধ নেই। যেমন যা'ফরান।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাবধান, পুরুষদের সুগন্ধ হচ্ছে এমন জিনিস যাতে গন্ধ আছে রং নেই, আর মেয়েদের সুগন্ধি হচ্ছে যাতে রঙ আছে গন্ধ নেয়।[৩৫০]

চারিদিক সুবাস ছড়িয়ে আলোড়িত করে তোলে এমন সুগন্ধি ব্যবহার করে ঘরের বাইরে যাতায়াত করা মেয়েদের জন্য জায়েয নয়। শুধু স্বামীর উদ্দেশ্যে তীব্র মন মাতানো সুগন্ধি ব্যবহার করার অনুমতি আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে মেয়েলোক সুগন্ধি লাগিয়ে বেগানা পুরুষদের কাছ দিয়ে যাতায়াত করবে, সে ব্যভিচারিনী।[৩৫১]

---

[৩৪৮] ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, খন্ড ৩ - ৪, পৃ. ১২০

[৩৪৯] প্রাগুক্ত

[৩৫০] ইমাম, আবূ দাউদ (র), প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস অধ্যায়, হাদীস নং: ৩৫২৭

[৩৫১] ইমাম তিরমিযী (র), প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব অধ্যায়, হাদীস নং: ২৭১০

Dhaka University Institutional Repository

দেবর, ভাসুর ভগ্নিপতি, চাচাত ভাই, মামাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, খালাতো ভাই সবাই গায়ের মাহরাম ও বেগানা। কাজেই তাদের সামনে দিয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে বা সুসজ্জিতা বেশে আসা যাওয়া করা যাবে না।

বর্তমান সময়ে বাজারে অনেক ধরনের সুগন্ধি (পারফিউম) পাওয়া যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পারফিউম শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এটা 'এসেনশিয়াল ওয়েল' এবং কিছু রাসায়নিক যৌগের মিশ্রণ। সুগন্ধটা নির্ভর করে ব্যবহারিক যৌগের উপর। পারফিউমে মিশ্রণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় বালসাম, বেনজাইল, স্যালিসাইলেট ইত্যাদি। এগুলো ব্যবহারের ফলে চামড়ায় একজিমা, ইরাইথেমা বা লাল স্ফীতি, শোথ ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। আরো ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হিসাবে চামড়ায় 'বারলকডার্মাটাইটিক' নামক জটিল চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। পারফিউম ও ওডি কোলনের ৮ মেথোক্রিসোরালেন নামের রাসায়নিক উপাদানটির প্রভাবে চামড়ার রঙ বাদামী হতে কালচে হয়।[৩৫২]

শরাব বা মদ সভ্যতা ও মানবতার দুশমন

মদ্যপান তথা মাদকাসক্তি একটি বড় সমস্যা। শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা সমস্যা দেখা দেয় মদ্যপানের কারণে। শারীরিক বিভিন্ন রোগ-শোক এসে ভর করে। লিভারে চর্বি জমে, লিভারের প্রদাহ বা হেপাটাইটিস হয়। লিভার সিরোসিসের মতো জটিল রোগ ও দেখা দিতে পারে। মুখের ঠোঁট থেকে শুরু করে খাদ্যনালির বিভিন্ন অংশে মরণব্যাধি ক্যান্সার হতে পারে। হতে পারে পাকস্থলির প্রদাহ বা গ্যাস্ট্রাইটিস। অগ্নাশয়ের প্রদাহ বা প্যানক্রিয়াটাইটিসও হতে পারে। ওপরের পেটে প্রচন্ড ব্যাথা। রক্তের চর্বির পরিমাণ বাড়ে। রক্তনালির দেয়ালে চর্বি জমে। ফলে দেখা দেয় উচ্চ রক্তচাপ। বেড়ে যায় হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি। মানসিক অশান্তি ও নিদ্রাহিনতা দেখা দেয়। শরীর হারায় শারীরিক ভারসাম্য। মারামরি, ছিনতায়, আত্মহত্য, নারী ঘটিত সামাজিক অন্যায়, সড়ক দুর্ঘটনা ইত্যাদি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়।[৩৫৩]

শ্লোগান উঠেছে, মাদককে না বলুন। পবিত্র ধর্ম ইসলাম আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মাদককে না বলে দিয়েছে। যুগে যুগে মানুষ বিপথগামী হয়েছে। আল্লাহকে ভুলে নানা অন্যায় অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। তাইতো যুগেযুগে নবী-রাসুলদের আগমন হয়েছে মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিতে, আল্লাহর পথে নিয়ে আসতে। ইসলামের শুরুর দিকে খোদ আরব দেশেও আর দশটা অন্যায় অত্যাচরের ন্যায় মদ, জুয়া ইত্যাদি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। এই মদ পানের কারণেই তখনকার সমাজে নানা অনাচার হতো। এক সময় কয়েকজন সাহাবি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মদ, জুয়া ইত্যাদির খারাপ দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিল হলো, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আপনার কাছে মানুষ শরাব এবং জুয়ার সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলে দিন। ঐ দুটি জিনিসের মধ্যে খুবই খারাবী রয়েছে। যদিও এর মধ্যে মানুষের জন্যে কিছু কিছু উপকারও রয়েছে। তবে এর লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই অনেক বেশী।[৩৫৪]

---

[৩৫২] ডা. নাজমূল আলম, প্রসাধনী, *মাসিক পৃথিবী*, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃ.৪৬

[৩৫৩] অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম ও স্বাস্থ্য*, ঐতিহ্য, ঢাকা: ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রি. পৃ. ৪০

[৩৫৪] يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (আল-কুরআন ২ : ২১৯)

Dhaka University Institutional Repository

তাৎক্ষণিকভাবে মদ ও জুয়াকে হারাম করা হয়নি। মানুষ তাৎক্ষণিক মদ ও জুয়া পুরোপুরি বর্জন করেনি। পরবর্তী সময়ে আয়াত নাজিল হয়েছে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো কখনো নেশাগ্রস্থ হয়ে নামাজের ধারের কাছেও যেও না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এতোটুকু নিশ্চিত না হবে যে তোমরা যা কিছু বলছো তা তোমরা ঠিক ঠিক জানতে ও বুঝতে পারছো, আবার অপবিত্র অবস্থায়ও নামাযের কাছে যেও না, যতক্ষণ না তোমরা পুরোপুরিভাবে গোসল সেরে নেবে, তবে পথচারী অবস্থায় থাকলে তা ভিন্ন কথা, আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো অথবা প্রবাসে থাকো, কিংবা কেও যদি পায়খানা থেকে ফিরে আসো অথবা তোমরা যদি কামসক্ত হয়ে নারী স্পর্শ করো তাহলে পানি দিয়ে নিজেদের পরিস্কার করে নেবে। তবে যদি এ অবস্থায় পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নেবে এবং তার পদ্ধতি হচ্ছে তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও তোমাদের হাত মোসেহ করে নেবে, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা গুনাহ মার্জনাকারী-পরম ক্ষমাশীল।[৩৫৫]

এভাবে ধীরে-ধীরে মানুষকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। সব শেষে এ সম্পর্কিত নির্দেশ এসেছে, হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা জেনে রেখো, মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক এর সব কয়টাই হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ। তোমরা তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করো। শয়তানতো চায় এই মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মাঝে একটা শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে এবং এভাবে মদ ও জুয়ার চক্করে ফেলে সে তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ নামায থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, তোমরা কি একাজ থেকে ফিরে আসবে না।[৩৫৬]

যে মদ শুধু শরীরের জন্য এত ক্ষতিকর, ইসলাম কত আগেই না তা নিষিদ্ধ করেছে! আমরা যেন ইসলামী বিধি-বিধান মেনে মদ্যপান তথা সব নেশাজাতীয় দ্রব্য পরিহার করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থ থেকে স্বাস্থ্য সম্মত জীবন-যাপন পালন করতে পারি।

উপরোক্ত সূরা তিনটিতে শরাবের ক্ষতিসমূহ সম্পর্কে পৃথক পৃথক পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। শরাব তৈরীর প্রধান উপাদান এ্যালকোহল, মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর । ইহা বিভিন্ন জটিল কাজে রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সর্বপ্রথম মুখ থেকেই শুরু হয়। মুখে সাধারণত লালা সদৃশ এক ধরনের পদার্থ থাকে। শরাব পান করার কারণে মুখের লালা উৎপাদনের শক্তি ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে, ফলে মাড়িতে ক্ষত এবং ফোলা দেখা দেয়। সুতরাং শরাবে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের দাঁতগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এরপর কণ্ঠ ও খাদ্যনালিতে প্রভাব দেখা দেয়। উক্ত অঙ্গ দুটি সংবেদনশীল নরম আবরণ দ্বারা গঠিত। শরাব পান করার কারণে উক্ত আবরণটির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে, ফলে অঙ্গদ্বয় ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে এবং ক্যান্সার পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে। শরাব পান করার কারণে পাকস্থলিতে এক প্রকার ধ্বংসাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি হয়। রক্তে

---

[৩৫৫] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً (আল-কুরআন ৪ : ৪৩)

[৩৫৬] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (আল-কুরআন ৫ : ৯০-৯১)

Dhaka University Institutional Repository

লিপিড (Lipid) নামক এক প্রকার চর্বি থাকে যা শরীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ করে। শরাব ব্যবহারের কারনে লিপিড (Lipid) গলে যায়। শরাবের বড় ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে ডিওডেনামের উপর। ডিওডেনাম খুবই স্পর্শকাতর একটি অঙ্গ। ইহা হজমের জন্য এক প্রকার এনজাইম তৈরী করে। শরাবের প্রভাবে এই এনজাইম তৈরীর প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ফলে খাদ্য হজম প্রক্রিয়ায় বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। শরাব লিভারের কাজেও বাধা সৃষ্টি করে, ফলে লিভারের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গও নিজ কাজ ঠিকমত করতে পারে না। শরাবে অভ্যস্ত ব্যক্তির কণ্ঠও খাদ্যনালী, পাকস্থলী, ডিওডেনিয়াম, লিভার, ইত্যাদি আক্রান্ত হওয়ার পর শরীর অভ্যন্তরে নানা প্রকার জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে হজম শক্তি ধ্বংস হয়, মুখ, খাদ্যনালি, পাকস্থলী, ডিওডেনিয়াম, লিভারে ক্যান্সারের মত ঘাতক ব্যাধির সৃষ্টি হয়, শরীরে মেদ জমে। চর্বির আধিক্যর কারনে হৃদরোগ দেখা দেয় এবং সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ কিডনী। শরাবের প্রভাবে কিডনীর বিপজ্জনক পরিণাম হলো কিডনী সংকুচিত হওয়া। নিয়মিত শরাব পানকারীর কিডনী তার জীবদ্দশাই সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হৃদযন্ত্রের পেশীর উপর সরাসরি শরাবের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে। এর প্রভাবে রক্তে (HDL) এর মাত্রা কমে যায় এবং (LDL) এর মাত্রা বেড়ে যায়। রক্তচাপের ভারসাম্যতা বিনষ্ট হয়। হৃদযন্ত্র এবং বাল্‌বের সমস্যা সৃষ্টি হয়। নিয়মতান্ত্রিক রক্তপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটে, দুর্বলতা ও অবসন্নতার সৃষ্টি হয়, মানসিক ভারসাম্যতা নষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত হার্টফেল করে নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, শরাব পান করো না, কারণ তা সমস্ত পাপাচারের দরজাস্বরূপ।[৩৫৭]
খাব্বাব (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবধান! শরাব পরিহার কর। কারণ শরাবের পাপ অন্যান্য সমস্ত পাপাচারকে আওতাভুক্ত করে নেয়, যেমন তার গাছ (আঙ্গুর গাছ) অন্যান্য গাছের উপর ছড়িয়ে যায়।[৩৫৮]

শরাবের অভ্যাস যে সভ্য আমেরিকা মাত্র ১৫ বছরের জন্য বর্জন করতে পারেনি, প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্বে সফলতার সঙ্গে ইসলাম তা বর্জন করেছে এবং শরাবের ধবংসাত্মক প্রভাব থেকে মানবতাকে রক্ষা করে আসছে।

হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধে ইসলামের বিধান

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলাম ধর্মকে মানুষের জন্যে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। এই বিধানে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকর সব বিষয়ই নির্দেশিত আছে। রোগ-শোকের প্রতিরোধ ও নিরাময়ের ইঙ্গিতও দেওয়া আছে এই বিধানে। হার্টের অসুখ, হার্টের রক্তনালির অসুখ, এ সবই হৃদরোগ। হৃদরোগ মারাত্মক রোগ। মৃত্যুর অন্যতম কারণ। নানা কারণে হৃদরোগ হয়ে থাকে। আজকাল বিজ্ঞান বলছে এসব কারণের অনেকাংশই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ইসলামি জীবন-যাপনের মাধ্যমেও যে হৃদরোগ প্রতিরোধ যথেষ্ট সম্ভব তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, নিয়মিত ব্যায়াম উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ প্রতিরোধে

---

[৩৫৭] ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্, প্রাগুক্ত, পানিয় ও পানপাত্র অধ্যায়, অনুচ্ছেদ শরাব সমস্ত পাপ কাজের দরজা স্বরূপ, হাদীস নং ৩৩৭১

[৩৫৮] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৩৭২

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি। কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ার বড় কারণ চর্বিযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া এবং ব্যায়াম না করা। চর্বিযুক্ত খাবার খেতে হবে কম। ব্যায়াম করতে হবে বেশি। ব্যায়াম করলে খারাপ কোলেস্টেরল 'এল ডি এল' এর মাত্রা কমে এবং ভাল কোলেস্টেরল 'এইচ ডি এল' এর মাত্রা বাড়ে। ব্যায়াম করলে রক্ত নালির দেয়ালে চর্বি জমতে পারে না। ফলে রক্তনালি সরু হয় না, সঠিক থাকে। ব্যায়াম করলে হৃদযন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ে। নিয়মিত ব্যায়াম রক্তচাপ কমাতেও সহায়ক। চিকিৎসা বিজ্ঞনীরা বলেন, প্রতিদিন ৩০ (ত্রিশ) মিনিট করে সপ্তাহে ৫ দিন ব্যায়াম করলে রক্তচাপ কমবে প্রায় ৪ থেকে ৯ মিলিমিটার। মাত্র কয়েক সপ্তাহেই এরূপ ফল পাওয়া যাবে। নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে রক্তচাপ থাকবে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে।

ইসলামী জীবনযাপনে দৈনন্দিন বেশ ব্যায়াম হয়। একজন মুসলমান দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন, নামায পড়ার সময় নামাযের কিয়াম, রুকু, সিজদাহ, বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরের অনেক ব্যায়াম হয়। আর জামাতে নামায পড়ার সময় মসজিদে যাওয়া-আসার সময় হাঁটার মাধ্যমে যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। এই ব্যায়াম শরীরের জন্য উপকারি, হাড়ের প্রতিটি জোড়া, চোখ, ঘাড়, রক্তনালি ও হৃৎপিন্ডের জন্য ভালো। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে হলে খাবার হতে হবে হৃদবান্ধব ও পরিমিত। ফলমূল, শাকসব্জি এবং আশযুক্ত খাবার খেতে হবে বেশি বেশি। তেল-চর্বি খেতে হবে অবশ্যই কম। বিশেষ করে, স্যাচুরেটেড তেল। মাংসের চর্বি পরিহার করতে হবে। মাছের তেল ভাল। মাছ খাওয়া যাবে বেশি। সব মিলিয়ে খাবার খেতে হবে পরিমিত। কারণ বেশি খেলে রক্তে চিনি, চর্বির পরিমাণ বাড়ে। শরীরে মেদ জমে, শরীর বেশি মোটা হয়ে যায়। মোটা শরীরে ডায়াবেটিকস, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি রোগ বেশি হয়। এরূপ শরীরে হৃদরোগের ঝুঁকিও বেশি। ইসলাম আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে স্বাস্থ্যকর খাবারের কথায় বলেছে। পরিমিত আহার নবী করিম রাসূলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত।

মিকদাম ইবনে মা'দি কারাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে পেট ভরে, ততটুকু খাদ্য কোন ব্যক্তির তোলা দূষনীয় নয়। যতটুকু আহার করলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা যায়, ততটুকু খাদ্যই কোন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। এর পরও কোন ব্যক্তির উপর তার নফস (প্রবৃত্তি) যয়যুক্ত হয় তবে সে তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।[৩৫৯]

ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঢেকুর দিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের ঢেকুর প্রতিরোধ কর; কারণ যারা পার্থিব জীবনে ভুরিভোজ করবে, তারাই কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত হবে।[৩৬০]

শূকরের মাংসে ক্ষতিকর চর্বি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এ কারণে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যপায় হয়ে পড়ে এবং

---

[৩৫৯] প্রাগুক্ত, আহার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ কম খাওয়া এবং পেট ভরে না খাওয়া, হাদীস নং ৩৩৪৯

[৩৬০] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৩৫০

Dhaka University Institutional Repository

না-ফরমানী এবং সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।[৩৬১]

তোমাদের জন্য মৃত প্রণীর মাংস, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে নিহত প্রাণীর মাংস, শ্বাসরোধ করে হত্যা করা প্রাণীর মাংস, কঠিন আঘাতে নিহত প্রাণীর মাংস, উচ্চ স্থান থেকে পতিত হয়ে আঘাত প্রাপ্ত প্রাণীর মাংস, শিংয়ের আঘাতে (পশু লড়াই) নিহত প্রাণীর মাংস, যে প্রাণীর কিছু অংশ কোন হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলেছে অবশ্য যদি তাকে যবেহ করার সুযোগ পাওয়া না যায় বা কোন বেদীর উপর বলি দেওয়া হয়েছে এবং যে মাংস তীর ছুড়ে (পাশা খেলার ন্যায়) ভাগ্য নির্ণয় করা হয়েছে, এসবই হারাম, এসবই ফাসেকি কাজ।[৩৬২]

দু'টি সমুদ্র সমান হয় না- একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশত (মৎস্য) আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য অলঙ্কারাদি আহরণ কর। তুমি তাতে তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৩৬৩]

তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা গোশত (মৎস্য) খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। তুমি তাতে জলযান সমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার কর।[৩৬৪]

এছাড়াও সুরা ফাতির : আয়াত ১২ এবং সুরা নাহল-এর ১৪ নম্বর আয়াতে মাছ খাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

রমযানে এক মাস রোযা রাখা ফরয। রোযা রাখলে রক্তের চর্বি কমে। আর চর্বি কমলে হৃদরোগ ও উচ্চরক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, সিগারেটের ধোঁয়ার কার্বন মনোক্সাইডের কারণে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়। কোলেস্টেরল জমা হয় রক্তনালির দেয়ালে। ফলে রক্তনালি শক্ত হয়, সরু হয় এবং প্রসারণ কমে যায়। রক্ত চাপ বাড়ে। রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবনতাও বাড়ে। দেখা গেছে, ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে অধূমপায়ীদের চেয়ে প্রায় ১০ বছর আগেই হৃৎপিন্ডের রক্তনালিতে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। রক্ত জমাট বাঁধতে পারে মস্তিষ্কের রক্তনালিতেও। ধূমপানের কারণে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে অক্সিজেনের সরবরাহ কমে যায়। কমে যায় হৃৎপিন্ডেও। এসব কারণে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ধূমপানের জন্য মৃত্যুর প্রধান কারণ হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক। দেখ গেছে প্রায়

---

[৩৬১] إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন ২ : ১৭৩)

[৩৬২] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন ৫ : ৩)

[৩৬৩] وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (আল-কুরআন ৩৫ : ১২)

[৩৬৪] وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (আল-কুরআন ১৬ : ১৪)

Dhaka University Institutional Repository

৯০ শতাংশ হৃদরোগই ধূমপানের জন্য হয়ে থাকে। ধূমপান করা মানে নিজেকে ধ্বংস করা। ইসলাম ধূমপানকে নিরুৎসাহিত করেছে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করোনা। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন।[৩৬৫] আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের নিজেদের ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে, স্ট্রেস বা মানসিক চাপও উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগের গোপন কারণ। ইসলামী জীবন যাপন আমাদের চাপ মুক্ত রাখতে পারে। নামাযের একাগ্রতা মানসিক চাপ কমায়। নামাযের সময় কুরআন তেলাওয়াতে মন প্রফুল্ল হয়। হৃদরোগ প্রতিরোধের জন্য ক্রোধ ও দমন করতে হবে। কারণ ক্রোধের সময় শরীরে এড্রোনালিন ও নরএড্রোনালিন নামক হরমোন নিঃসরণ বেড়ে যায়। এই হরমোন দুটি রক্তনালি গুলোকে সংকুচিত করে এবং হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি ও রক্তনালি গুলোর সংকোচনের ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। হৃদপিন্ডের রক্তনালির সংকোচনের কারণে হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে। মস্তিষ্কেও অত্যন্ত সরু সরু রক্তনালি চিড়ে গিয়ে হতে পারে স্ট্রোক। যারা ঘন ঘনই রাগান্বিত হন, তাদের হৃদরোগ হবার ঝুঁকি শান্ত স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি। রাগান্বিত হওয়ার দুই ঘন্টার মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অন্য সময়ের চেয়ে মুটামুটি দুই গুণ বেশি। ইসলাম ক্রোধ পছন্দ করে না।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, রবের ক্ষমার প্রতি ধাবমান হও প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে ঐ জান্নাতের প্রতি যার বিস্তৃতি আসমান ও যমিনের ন্যায়, তা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত। যারা ব্যয় করে, সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আর তারা ক্রোধ দমন করে, আর ক্ষমা করে মানুষকে; আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।[৩৬৬] নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রোধ পছন্দ করতেন না। একদিন এক লোক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, হুজুর, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ক্রোধান্বিত' হয়ো না।[৩৬৭] লোকটি আরও কয়েক বার নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দিতে বললেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবারই বললেন, 'ক্রোধান্বিত' হয়ো না'। অতএব দেখা যাচ্ছে, ইসলামি জীবন-যাপনের মাধ্যমে হৃদরোগ প্রতিরোধ করা অনেকাংশেই সম্ভব। ইসলামী বিধান পালন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি আমরা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থ থেকে স্বাস্থ্য সম্মত জীবন-যাপন পালন করতে পারি।

---

[৩৬৫] وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (আল-কুরআন ২ : ১৯৫)

[৩৬৬] وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ- الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ- (আল-কুরআন ৩ : ১৩৩-১৩৪)

[৩৬৭] দ্রষ্টব্য, অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম ও স্বাস্থ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

ক্রোধ, স্বাস্থ্য ও ইসলাম

মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কতৃক মনোনীত পরিপূর্ণ জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকর সব বিষয়ই সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশিত আছে এই বিধানে। কল্যাণকর বিষয়গুলো পালন আর অকল্যাণকর বিষয়গুলো বর্জন করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে এই ধর্মে। ক্রোধ মানুষের জন্য অকল্যাণকর। ক্রোধ মানুষের চরম শত্রু।কি যুবক কি বৃদ্ধ, কি পুরুষ কি নারী, ক্রোধ প্রত্যেকেরই ক্ষতি সাধন করে। ক্রেধের কারণে মানুষের স্বাস্থ্যেরও নানাবিধ ক্ষতি হয়। কারণ, ক্রোধের সময় শরীরে এড্রোনালিন ও নরএড্রোনালিন নামক হরমোন নিঃসরণ বেড়ে যায়। এই হরমোন দুটি রক্তনালিকে সংকুচিত করে এবং হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি ও রক্তনালির সংকোচনের ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। হৃদপিন্ডের রক্তনালির সংকোচনের কারণে হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে।[৩৬৮] মস্তিষ্কের অত্যন্ত সরু সরু রক্তনালি ছিড়ে গিয়ে হতে পারে স্ট্রোক। যারা ঘন ঘনই রাগান্বিত হন, তাদের হৃদরোগ হবার ঝুঁকি শান্ত স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি। রাগান্বিত হওয়ার দুই ঘন্টার মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অন্য সময়ের চেয়ে মুটামুটি দুই গুণ বেশি। ক্রোধের সময় শরীরের অনুচক্রিকা নামের রক্তকণিকার মাধ্যমে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা বেড়ে যায়। জমাট বাঁধা রক্ত হৃদপিন্ডের ধ্বমনিতে প্রবেশ করলে রক্তনালি বন্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। জমাট বাঁধা রক্ত মস্তিষ্কের সরু নালিতে গেলে হতে পারে ব্রেইন স্ট্রোক। ক্রোধের সময় শরীরের অক্সিজেনের চাহিদা বেড়ে যায়। হৃৎপিন্ডে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়ে বুকে ব্যাথা (এনজাইনা) হতে পারে। আর বাড়তি অক্সিজেনের চাহিদা পূরণের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়। ক্রোধের সময় মাংসপেশিতে কাঁপুনি হয়। শরীর তখন কাঁপতে থাকে। রাগের জন্য ঘাড় ও মাথার পেশির খিঁচুনি হয়। ফলে মাথা ব্যথা অনুভূত হয় ও ঘুম চলে যায়। ক্রোধের সময় পাকস্থলিতে বেশি অ্যাসিড নিঃসরণ হয়। বেশি অ্যাসিড নিঃসরণ হলে পেপটিক আলসার হতে পারে। ক্রোধের কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। যারা প্রায়ই রেগে যায় তার ঘনঘন ঠান্ডা লাগা, হাঁপানি ইত্যাদি রোগে ভুগতে পারে। রাগী ব্যক্তিরা বেশির ভাগ সময় অসুখীই থাকে। একটু সুখের আশায় বিকল্প হিসেবে ধূমপান, মদপান ইত্যাদির আশ্রয় নেয়। পরিণতিতে শরীরের আরো ক্ষতি হয়। ইসলাম ক্রোধ পছন্দ করে না। পবিত্র কুরআনে এসেছে, রবের ক্ষমার প্রতি ধাবমান হও প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে ঐ জান্নাতের প্রতি যার বিস্তৃতি আসমান ও যমিনের ন্যায়, তা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত। যারা ব্যয় করে, সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আর তারা ক্রোধ দমন করে, আর ক্ষমা করে মানুষকে; আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।[৩৬৯]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রোধ পছন্দ করতেন না। ক্রোধের ক্ষতির কথা বিবেচনা করেই তিনি তা বর্জন করার জন্য নানা রূপ উপদেশ দিয়েছেন। ক্রোধ কখনই শক্তির পরিচায়ক নয়; বরং ক্রোধ মানুষের চরম দুর্বলতা। ক্রোধান্বিত হয়ে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ক্রোধের বসে সে নানা গোনাহের কাজ করে বসে। এজন্য ক্রোধ দমন করতে হবে।

---

[৩৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[৩৬৯] وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ- الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (আল-কুরআন ৩ : ১৩৩-১৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

ক্রোধ দমনের উপায় এসছে রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে। সুলায়মান ইবনে সুরদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনেই দুই ব্যক্তি গালাগাল করছিল। আমরাও তাঁর কাছেই বসাছিলাম। তাদের একজন অপর জনকে এত রাগান্বিত হয়ে গালী দিচ্ছিল যে, তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি একটি কালেমা জানি, যদি এ লোকটি তা পড়তো, তাহলে তার ক্রোধ চলে যেত। অর্থাৎ যদি লোকটি আয়ূজু বিল্লাহি মিনাশ্‌শায়তানির রাজীম পড়তো, তখন লোকেরা সেই ব্যক্তিকে বলল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছেন তা কি তোমরা শুনছো না? সে বলল, আমি নিশ্চয় পাগল নই।[৩৭০]

ক্রোধ দমন করতে পারলে পুরস্কারেরও ঘোষণা আছে ইসলামে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্রোধের অনল থেকে বেঁচে সুস্থ থাকার তওফিক দান করুন। আমীন।

অনাড়ম্বর জীবন

ইসলাম অনাড়ম্বর ও সরলতার ধর্ম। এর প্রতিটি দিকেই রয়েছে শান্তি ও সরলতা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনকে সরল ও সাদামাঠা বানিয়ে আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার বাদশা হয়েও সাধারণ জীবন যাপন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যাদ এবং সেগুলির উপকারিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

- রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি কাঠের পেয়ালা ছিল।
- রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি কাচের পাত্রও ছিল।
- রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটির পাত্রও ব্যবহার করতেন।

কাঠের ও মাটির পাত্র ব্যবহার অনাড়ম্বরেরই পরিচায়ক। আজ চীনের ইয়াং শহরের মানুষ পুনরায় মাটির পাত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কারণ, ধাতব জাতীয় প্রতিটি পাত্রেই ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। প্লাষ্টিকের পাত্র বর্তমান বিশ্বে সভ্যতার যুগের উৎকৃষ্ট উপহার। তবে এ ধরনের পাত্রে খাদ্য দ্রব্য রাখা এবং খাওয়া-দাওয়া করা খুবই ক্ষতিকর। খাওয়া-দাওয়ার জন্য মাটি, চিনামাটি এবং কাঁচের পাত্রই সর্বোত্তম। বর্তমানে প্লাস্টিক এবং কৃত্রিম পদার্থ দ্বারা তৈরীকৃত যে সমস্ত পাত্র ব্যবহৃত হচ্ছে তার ক্ষতির নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল।

কোলেষ্টিকাট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞান বিভাগের ডাক্তার মাইক ফিলিপ বলেন, প্লাস্টিকের পাত্রে গরম খাদ্য বিশেষত চা, কফি পান করা খুবই ক্ষতিকর। এ ক্ষতিকর প্রভাব তখন আরো বৃদ্ধি পায়, যখন চায়ের সঙ্গে লেবুর রস দেওয়া হয়। কারণ এ জাতীয় প্লাস্টিকের পাত্রে ভিতরের অংশ গরম হয় এবং এসিডের প্রভাবে তা গলে গলে বের হতে থাকে। এমতাবস্থায় ঐ পাত্রে চা পান করলে যে 'পলিষ্ট্রিন' শরীরে যাবে, সেটি ক্ষত রোগ বা ক্যান্সার হওয়ার কারণ হতে পারে। ইহা ইঁদুরের উপর পরিক্ষীত।

---

[৩৭০] ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, আচার ব্যবহার অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ২৫০৭, হাদীস নং ৫৬৮৫

Dhaka University Institutional Repository

তিনি লোকদেরকে প্রচলিত সাধারণ পাত্রে খাওয়া-দাওয়া করতে পরামর্শ দিয়েছেন। যদি মাটির পাত্রে জীবাণু প্রবেশ করে, তবে তা চুষে অপর দিক দিয়ে বের করে দেয়।[৩৭১]

এবার ভেবে দেখুন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম কতটা বিজ্ঞানময়। ধাতব পাত্রের পানি পান করার স্বাদের চেয়ে মাটির পাত্রের পানি পান করার স্বাদ ভাল। অভিজ্ঞতাই এর স্বাক্ষী। কিন্তু আমরা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে বরং প্রকৃতির সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি, ফলে প্রকৃতিও আমাদের সঙ্গে বিরূপ আচরণের মাধ্যমে আমাদেরকে পেরেশানিতে রেখেছে। আজ আমরা প্লাস্টিক, পলিথিন, এ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতব পাত্র ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদেরকে জীবনকে কঠিন সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। একজন ইউরোপিয়ান ডাক্তার বলেছেন, অনেক সময় পাকস্থলীতে খাদ্যের অন্তর্গত কুদরতী বিষ থেকে যায়। কিন্তু পাকস্থলীর মজবুত পর্দার উপর তার কোন প্রভাব পড়ে না। এ পূর্ণ শক্তি দিয়ে বিষের প্রভাবের সঙ্গে মোকাবেলা করে এবং কোন ক্ষতিও হয় না। কিন্তু যখন এ্যালুমিনিয়ামের সংমিশ্রণ ঐ পদার্থগুলিকে দূর্বল করে দেয়, তখন ঐ বিষের প্রভাবগুলোই যেগুলো মাইক্রোসকোপ দ্বারাও অনুভব করা যেতো না, সেগুলো ভেসে ওঠে। এ্যালুমিনিয়াম পাকস্থলীতে পৌছে প্রভাব বিস্তার করার পর কোন কোন সময় আমশয়, বমি বমি ভাব, বমি, ক্ষুধা মন্দা, পাতলা পায়খানা, রক্ত দূষিত হওয়া সহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

- মিশিগান ইউনির্ভাসিটির ডাক্তার ভিষ্টোরনের বলেন, এ্যালুমিনিয়মের সকল লবণই মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর।

- শিকাগো ইউনির্ভাসিটির ডাক্তার ভেলস বলেন, এ্যালুমিনিয়ম যুক্ত কেমিক্যাল পাকস্থলীতে পৌছে ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। ভীতরগত অঙ্গের সকল অংশকে দূর্বল করে। লোমকূপে এ্যালুমিনিয়মের কেমিক্যাল জমে ক্ষতি সাধন করে।

- ডাক্তার এইচ এ শিগান বলেন, এ্যালুমিনিয়মের কেমিক্যাল পাকস্থলীতে পৌছে ক্ষুধামন্দা সৃষ্টি করে। অনেক সময় পেটে ব্যাথা হয়। ফলে আমশয়, বমি, বমি বমি ভাব সৃষ্টি হয়।

- যুক্তরাষ্ট্রের হেলথ লীগের প্রধান ডাক্তার হিলডের বলেন, এই কেমিক্যালগুলি পাকস্থলীর শক্তি নিঃশেষ করে দেয়।

- ডাক্তার ডেভিস্ট নাইট এফ. সি. এস. লিখেছেন, এ্যালুমিনিয়ম পাত্রের ব্যবহার ডাক্তারী দৃষ্টিকোন থেকে ক্ষতিকর। নিঃসন্দেহে এই চাকচিক্যময় ধাতব পাত্র নারীদেরকে মোহগ্রস্ত করে এবং নানা ধরনের খাদ্য এই ধাতব পাত্রে রান্না করা হয়। কিন্তু তাদের এ ধরনের পাত্র ব্যবহার না করা উচিত এবং তাতে কোন খাদ্য দ্রব্য কখনো রান্না করবে না, যেগুলিতে এসিড কিংবা লবণাক্ত পদার্থ থাকে।

আধুনিক গবেষণা দ্বারা জানা যায়, এ্যালুমিনিয়মের পাত্রে রান্না করা খাবার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এ বিষয়ে ডাক্তার জর্জ ডোনেলসন ব্যাপক গবেষণার পর প্রমাণ করেছেন যে, এ্যালুমিনিয়মের পাত্রে খাবার রান্না করলে এর কোন কোন পদার্থ বিষাক্ত মিশ্রণে রূপান্তরিত হয়ে খাদ্যে মিলে যায় এবং বিভিন্ন অঙ্গের উপর ধ্বংশাত্মক প্রভাব ফেলে।

---

[৩৭১] ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, খন্ড ১ - ২, পৃ.৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

অন্য এক বিজ্ঞানী বলেন, একবার যখন সোডার পানি এ্যালুমিনিয়মের পাত্রে ঢালা হল, তখন সে পানিতে বুদবুদ উঠতে শুরু করল। তারপর ঐ পানিকেই যখন কাঁচের গ্লাসে রাখা হল, তখন আর বুদবুদ উঠল না। তহলে নিশ্চয় খাবার রান্না করার সময় এ্যালুমিনিয়ম গলে খাদ্যের সাথে মিশে যায় এবং বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ্যালুমিনিয়মের পাত্রে আধ ঘন্টা পানি জাল দিলে তাতে এ্যালুমিনিয়ম হাইড্রোঅক্সাইড (এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ) পানির সঙ্গে মিশে যায়, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে এ্যালুমিনিয়মের পাত্র চাকু দিয়ে চেছে পাত্রের ঝকঝকে অংশে জিহব্বা লাগালে লবণাক্ত স্বাদ অনুভুত হয়। এটা এ্যালুমিনিয়মেরই একটা লবণ। এ্যালুমিনিয়মের সকল পদার্থই ক্ষতিকর। কোনটির মধ্যে বিষাক্ত অংশ বেশি কোনটির মধ্যে কম। এ সব কেমিক্যাল খাদ্যের সাথে মিশে খাদ্যের পুষ্টিমান নষ্ট করে দেয়। এবং খাদ্যের সাথে পাকস্থলীতে পৌছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ক্ষারযুক্ত তরকারী কোন এ্যালুমিনিয়মের পাত্রে আধা ঘন্টা থাকলে তরকারীতে এ্যালুমিনিয়ম যুক্ত হয়ে যায়। কাঁচা আম এ্যালুমিনিয়মের পাত্রে রান্না করে খেলে সঙ্গে সঙ্গে দাস্ত-বমি আরম্ভ হবে। এ্যালুমিনিয়মের কেমিক্যাল পেটে যেয়ে নাড়ীকে দূর্বল করে দেয় এবং পাকস্থলীর পর্দায় ছোট ছোট ক্ষতের সৃষ্টি করে।[৩৭২]

➢ চাক্কী এবং কূয়ার পানি ব্যবহার করা যেদিন থেকে বন্ধ হয়েছে, সেদিন থেকেই নারীদের মধ্যে মেদ, শিরা-উপশিরার খিঁচুনি (Muscle Strain), স্ত্রী রোগ (Gyanaecological Disease), স্নায়ুবিক দুর্বলতার মতো কঠিন কঠিন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

➢ কাপড় ধোয়া একটি সাংসারিক নিয়ম এবং এর দ্বারা বাহু, বক্ষ এবং বক্ষের মাংসপেশীর যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। এই ব্যায়ামের মাধ্যমে নারীরা অগণিত রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পায়। যখন মহিলারা নিজেদের ঘর বাড়ি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, পানি আনা, খাবার রান্না করা, শিশুদেরকে খাবার খাওয়ানো, সেলাই করা, কাপড় বুনোনো ইত্যাদি কাজ করত তখন একদিকে যেমন শারিরীক ব্যায়াম হতো অপর দিকে তেমনি মানসিক আনন্দের মধ্যেও থাকতো, ফলে শরীর ও মন উভয়ই ভাল থাকত। কিন্তু বর্তমান সময়ে মেশিন অথবা কাজের লোকের মাধ্যমে সাংসারিক অতি প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নিয়ে নিজেরা অলস জীবন-যাপন করা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে বাসা বাড়িতে কাজের মহিলার মাধ্যমে কাজ করোনোটা এখন সমাজে স্ট্যাটাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে নারীরা প্রয়োজনীয় ব্যায়াম হতেও নিজেকে বঞ্চিত করছে।

➢ স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা হল, যে সকল মহিলারা তাদের বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান, তাদের পরবর্তী সন্তান প্রসবের মাঝে এমনিতেই দূরত্ব সৃষ্টি হয়। নারীদেরকে সুখী সংসার বানানোর জন্য আর ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন পড়েনা। প্রয়োজন শুধু উপযুক্ত জ্ঞান এবং সচেতনতা।

➢ পূর্বে মহিলারা সুতি কাপড় পরিধান করত। তখন তাদের মধ্যে গোপন স্ত্রী রোগ তেমন বেশী ছিল না। বিশেষতঃ লিউকোরিয়া তো ছিলইনা। অসংখ্যা অভিজ্ঞতার আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এরূপ মন্তব্য করেছেন।

---

[৩৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩-৩৬৬

Dhaka University Institutional Repository

➢ ইতোপূর্বে মেয়েদের বিয়ে-শাদী খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যেত। কারণ, তখন রসম-রেওয়াজের সমস্যা ছিল না। বিশেজ্ঞদের মতে দেরীতে বিয়ে করলে যেরূপ পুরুষের ক্ষতি হয়, তদ্রূপ ক্ষতি হয় নারীদেরও। তাদের ব্রেষ্ট ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

➢ রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংমিশ্রণে মেকআপ তৈরীর সন্ধান কোন হাদীসেই পাওয়া যায়নি। বর্তমান সমাজের মেয়েরা যখন থেকে এই মেকআপ ব্যবহার শুরু করেছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত চেহারার রোগ, এবং কদাকৃতি দূর করার বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহারের চক্করে পড়ে গেছে। ইদানিং অনেক মহিলার মুখে অযাচিত পশম দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের মেকআপ ব্যবহারও এর একটি কারণ।

➢ ঢিলা-ঢালা পোশাক সুস্থতা ও স্বাস্থ্যের জন্য শক্তিশালী খাদ্যের চেয়েও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ জাতীয় পোশাক ছেড়ে দিয়ে আজ আমরা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছি।

➢ ইসলামী জীবন-যাপন সাদাসিধে কিন্তু আরামদায়ক। পাশ্চাত্যের জীবন চাকচিক্যময়, কিন্তু জটিল এবং কষ্টদায়ক। সাদাসিধে জীবন-যাপনকারী অধিকাংশ লোকই রোগ-ব্যাধি, অস্থিরতা, অনিদ্রা, আত্মহত্যা ও তালাকের মত মারাত্মক জটিলতার শিকার খুব কমই হয়ে থাকে। ফলে তারা শারীরিক ও মানসিক ভাবে থাকে খুবই সতেজ।

➢ লিপিস্টিক তৈরীতে প্রথম প্রথম এরূপ চর্বি ব্যবহার করা হত, যা তাড়াতাড়ি গলত না। অনুসন্ধানে জানা গেল, শূকরের চর্বি তাড়াতাড়ি গলে না। তারপর থেকে লিপিস্টিকে শূকরের চর্বি ব্যবহৃত হতে লাগল। এখনো ভাল এবং দামী লিপিস্টিকে শূকরের চর্বি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু লিপিস্টিকে সাধারণত রং জাতীয় দ্রব্য এবং চর্বি জাতীয় শক্ত ভ্যাসলিন ব্যবহার করা হয়। তাই এটা খুবই ক্ষতিকর। কেননা রং থেকে রক্তের অগণিত রোগ ব্যাধি জন্ম নেয়। তার মধ্যে শরীরের মারাত্মক রোগ ক্যান্সার ও জন্ম নেয়।

➢ স্যার জেমস সাগম কানাডার একজন বড় ফিজিওথেরাপিষ্ট। তেল ব্যবহারের ব্যাপারে তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বলেন, পূর্বে আমি মাথায় তেল লাগানোকে সময়ের অপচয় ও ধুলাবলি আটকে থাকার কারণ মনে করতাম। কিন্তু একটি ঘটনা আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। আমি কিউটের একটি গ্রামের রোডে মোটর গাড়ীতে করে যাচ্ছিলাম। এক জায়গায় এক বৃদ্ধকে আরেক বৃদ্ধের মাথায় ম্যাসেজ করতে দেখলাম। আমি ভাবলাম, একি হতবুদ্ধিতা! আমি গাড়ী থামিয়ে তাদের অবস্থা জানতে চাইলাম। তাদের একজন বলতে লাগল, আমার পিতা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে অনেক দূরে চলে যেতেন। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি কিন্তু কোন ফল হলো না। তখন আমাকে এক ব্যক্তি বলল, তুমি তোমার পিতার মাথায় আমলা মালিশ কর। আমি মালিশ করতে আরম্ভ করলাম। এভাবে সাতাশ দিন কেটে গেল, এখন আমার পিতা একেবারে সুস্থ। আমি তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমি রোগীকে ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলাম বাস্তবিকই সে সুস্থ। তার পূর্বের রিপোর্টগুলো পড়ে বুঝলাম, আসলেই সে মানসিক রোগী ছিল। এরপর থেকে আমি তার মত রোগী এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের উপরও এ পদ্ধতি ব্যবহার করলাম। এতে আশাতীত ফল হল। আমি এটাকে মস্তিষ্কের চাপ, শিরা-উপশিরার খিঁচুনী ও মাথা ব্যথার পুরাতন রোগী, ঘাড়ের রগের ব্যথা, কাঁধের ব্যথা এবং খিঁচুনী, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, চেহারার সার্জারীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফলদায়ক পেয়েছি। চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানোর ফলে এক প্রকার উষ্ণতা এবং এনার্জী সৃষ্টি হয়, যা পশম বা চুলের মাধ্যমে শরীরে শিরা-তন্ত্রীকে প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী করে। এমন

Dhaka University Institutional Repository

কি নিয়মিত চুল আঁচড়ালে চুল বৃদ্ধি পায় এবং ঘন হয়। নিয়মিত চুল আঁচড়ানোর ফলে চুলের জীবাণু ও উকুন কম হয়।[৩৭৩]

[৩৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামের আলোকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার কতিপয় দিক নির্দেশনা

১. শরীর ও মন উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ

যাবতীয় রোগ-ব্যাধি মন হতে দেহে বিকাশ পায়। দেহটিকে সুস্থ রাখতে হলে, আগে মনটিকে সুস্থ করতে হবে। দেহকে মনই পরিচালনা করে, এমন কি দেহটি মনেরই স্থূলরূপ মাত্র। মনটি যেমন, দেহটিও তেমনি হবে। মনটি অসুস্থ হলে দেহটি সুস্থ হতে পারে না। দেহটিকে সুস্থ রাখতে হলে, আগে মনটিকে সুস্থ করতে হবে, অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু এখন মনের দিকে কারো কোন দৃষ্টি নেই। শরীরের প্রকৃত সুস্থতা কিসে আসবে, সে দিকেও দৃষ্টি নেই। দৃষ্টি কেবল একেবারে বাইরে, ভিতরটা কেউ দেখে না, বাইরে নিয়েই সবাই ব্যস্ত। ফলে, ভিতরটি অতি ভয়ানক ব্যাধিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই ভয়ানক ব্যাধি শরীরে প্রকাশিত হলে আবার তা চাপা দেওয়ার ফলে ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন ব্যাধিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। অতএব শরীর ও মন উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

২. অসুস্থ মন সকল অপকর্মের মূল

মানুষ দেহের রোগকেই সাধারণত রোগ বলে এবং তারই চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হয়। মনের সুস্থতা বা অসুস্থতা বড় একটা লক্ষ্য করে না। যখন মনের রোগের কারণে তার দ্বারা আর সাংসারিক কাজকর্ম চলে না, শুধু মাত্র তখন তাকে সুস্থ করার জন্য চিকিৎসকের দ্বারস্থ হয়। যদি সাংসারিক কাজ, হিসাব-নিকাশ বা লোকজনের সাথে ব্যবহারের বিষয়ে কোন অসুবিধা বা বিশৃঙ্খলা না ঘটে তবে মনের যে অবস্থাই হোক না কেন, তার প্রতি কেউই নজর রাখে না এবং চিকিৎসার প্রয়োজন বলেও মনে করে না। একটু যত্ন সহকারে লোক-চরিত্র পর্যবেক্ষণ করলেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে, শত-শত ব্যক্তির মধ্যে এক জনেরও মন বোধ হয় সুস্থ নেই। অথচ মনের-রোগ আরোগ্য করার জন্য কারো মধ্যে বড় কোন আগ্রহ দেখা যায় না। অবস্থা দেখে মনে হয় যেন সম্পূর্ণ সমাজের একই অবস্থা। তাহলে কে কার অসুস্থতা বুঝতে পারবে? অসুস্থ মনের কারণে মানুষ প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে কৃত্রিমতার আশ্রয়ের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট করছে। মানুষ প্রকৃতির দ্বারা রোগাক্রান্ত হচ্ছে, সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করে বিভিন্ন প্রকারের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। সন্ত্রাসী, মারামারি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, নারীঘটিত অপরাধ এ সবের প্রকৃত কারণ তাদের অসুস্থ মন। সুস্থ মনে অপরাধ করা তো দূরের কথা, সে সব সময় অন্যের মঙ্গল কামনা করে। আমরা অবশ্য এসব বিষয় এতটা সূক্ষভাবে দেখি না এবং চিন্তাও করি না। কিন্তু এ কথা ধ্রুব সত্য যে, সুস্থ মন কোন অসৎ চিন্তা বা অসৎ কাজ করতে পারে না, অসুস্থ মন সকল অপকর্মের মূল।

Dhaka University Institutional Repository

৩. দেহ ও মন সম্পর্কযুক্ত

মন ও শরীরের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি একটি বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। রোগীর তথ্য সংগ্রহের সময় মানসিক উপসর্গগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যান্য উপসর্গ সংগ্রহ করতে হবে। কারণ, মানুষ কিভাবে রোগাক্রান্ত হয়? এর উত্তর অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বাহিরের রোগশক্তি শরীরের জীবনীশক্তির (রোগ প্রতিরোধ শক্তি) উপর আক্রমণ করে যখন জয়লাভ করে তখন শরীর রোগাক্রান্ত হয়। আর বাহিরের রোগশক্তি শরীরের জীবনীশক্তির (রোগ প্রতিরোধ শক্তি) উপর আক্রমণ করে যখন পরাজিত হয় তখন শরীর রোগাক্রান্ত হতে পারে না। রোগশক্তি একটি সূক্ষ্ম শক্তি, তদ্রূপ জীবনীশক্তিও একটি সূক্ষ্ম শক্তি। উভয় সূক্ষ্ম শক্তি স্থূল শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং যুদ্ধ-ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে। মন ও শরীর একটি আরেকটির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ কারণে অসুস্থতার লক্ষণ প্রথমে মনে প্রকাশ পায় এবং ধীরে-ধীরে শরীরেও প্রকাশ পায়। অতএব, চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানসিক লক্ষণকে প্রাধান্য দিতে হবে কারণ দেহ ও মন উভয়ই সম্পর্কযুক্ত।

৪. শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ

মানব শরীর, শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ দ্বারা রোগ প্রকাশ করে। যখন কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তখন জীবনীশক্তিই তার সমস্ত শরীরে রোগোৎপাদিকা শক্তি কতৃক নানা প্রকার কষ্টদায়ক অনুভূতি তৈরী করে, একেই আমরা রোগ বলি। কারণ, জীবনীশক্তি নিজে অদৃশ্য বলে স্থূল শরীরের উপর ক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট রোগ লক্ষণ শরীরের যে যে অংশ আমারা দেখতে পাই সেই সেই অংশের অনুভূতি ও কাজের গোলযোগ দ্বারা জানা যায়। অর্থাৎ রোগ জীবনীশক্তির রোগাক্রান্ত অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক বিকৃত লক্ষণ দ্বারা আত্মপ্রকাশ করে অন্য কোনও উপায়ে নয়।

৫. অন্তর-রোগের চিকিৎসা

যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্থ তারা কখনও সঠিক চিন্তা-ভাবনা করতে পারেনা। তারা সব সময় ভুল চিন্তা করে কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না। উপরন্তু তারা সব সময় নিজেদের চিন্তা ধারাকেই সঠিক বলে দৃঢ়তা পোষণ করে। তারা নিজেদের কাজকর্মকে সঠিক এবং এর বিপরীত কাজকে বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ মনে করে। কারণ তাদের চিন্তা, জ্ঞান ও বিবেক তাদেরকে ভুল তথ্য দেয়। সমাজে তারা বিভিন্ন প্রকারের অশান্তি, ফেতনা-ফ্যসাদ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাদেরকে যখন বলা হয় তোমরা অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরাই শান্তি স্থাপনকারী। তারা যা বলছে জেনে বুঝেই বলছে, যে তারা শান্তি স্থাপন কারী; আমরা অশান্তি সৃষ্টিকারী নই। কারণ, তাদের অন্তর রোগগ্রস্ত। রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন ভাল এবং মন্দকে সঠিক ভাবে বুঝতে পারে না, তেমনি অন্তরের রোগগ্রস্থ ব্যক্তিও কোনটি সঠিক এবং কোনটি সঠিক নয় এ দুই-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। শুধু এদের অন্তর-রোগের চিকিৎসার মাধ্যমেই সঠিক জীবন ধারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। অন্তর-রোগের এক মাত্র সঠিক চিকিৎসা হলো স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান 'আল-কুরআনের' বিধি-বিধান সঠিকভাবে মেনে চলা। অন্তর-রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে শুধু ব্যক্তি নয়, বরং সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্র এমনকি সমগ্র পৃথিবীবাসী পেতে পারে একটি সুন্দর জীবন ব্যবস্থা। অতএব সমাজের মঙ্গলের জন্য অন্তরে-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সঠিক চিকিৎসার প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৬. রোগের লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন ও সেবন কর্তব্য

প্রত্যেক রোগের ক্ষেত্রে, অন্যান্য শারীরিক লক্ষণের সাথে মনের ও প্রকৃতির অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করে রোগীর যন্ত্রণা দূর কল্পে, ঔষধসমূহের মধ্য হতে এমন একটি ঔষধ নির্ধারণ করতে হবে, যা রোগের অন্যান্য লক্ষণের সদৃশ লক্ষণ এবং মনের ও প্রকৃতির পরিবর্তনের সদৃশ অবস্থা উৎপাদন করতে পারে। তবেই আমরা প্রকৃতিসম্মতভাবে আরোগ্য লাভে সমর্থ হব। এরূপ আত্মিক ও স্নায়ূবিক শক্তি পারস্পরিক ধারণা বিনিময় করে নিজেদেরকে রোগমুক্ত করে তোলে এবং এই অবস্থায় রোগী দ্রুত রোগমুক্তির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ঔষধের রোগ নিরাময় লক্ষণ, রোগীর শারীরিক ও মানসিক লক্ষণের সঙ্গে সদৃশ হলে সে ঔষধ দ্বারা রোগ নিরাময় সম্ভব হবে। এছাড়াও রোগীর সঙ্গে অন্তরিক ব্যবহার এবং সেবা প্রদান দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য সহায়ক।

৭. রোগ নয়, রোগী চিকিৎসার বিষয়

আমরা যাকে রোগ বলি তা রোগ নয়, রোগের ফল মাত্র। এই ফলস্বরূপ রোগ আমাদের চিকিৎসার বিষয় নয়। প্রকৃত চিকিৎসার বিষয় হল রোগী। এই রোগীকে দ্রুততম উপায়ে তার বিশৃঙ্খল অবস্থা হতে সুশৃঙ্খল অবস্থায় ফিরিয়ে আনাই সুচিকিৎসা। তখন উক্ত ফলস্বরূপ রোগ এমনিতেই ভাল হয়ে যায়। এজন্য সর্ব প্রথমে রোগীর মানসিক লক্ষণ অতপর অন্যান্য লক্ষণ সংগ্রহ করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা একজন আদর্শ চিকিৎসকের কর্তব্য। রোগী চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগ নয় রোগীকে অর্থাৎ ব্যাক্তিকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

৮. রোগ চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ করা শ্রেয়

রোগ চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয়। আল-কুরআনের নির্দেশনায় রোগের উত্তম চিকিৎসা হলো রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এছাড়া ও ইসলামের স্বাস্থ্য বিষয়ক অমূল্য নীতি যেমন, পরিমিত আহার, সাধারণ জীবন-যাপন পালন, সুতি কাপড় পরিধান, নিয়মিত ব্যায়াম, সকালে ঘুম থেকে উঠা, অজু, গোসল, মেসওয়াক, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নামায, রোযা, এশার নামাযের পর পর ঘুমিয়ে পড়া, ফযরের পর নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা ইত্যাদি যথাযথ ভাবে অনুসরণ করলে রোগ-ব্যাধি অনেকাংশে কম হবে।

৯. রোগী দেখতে যাওয়া

রোগী দেখতে গিয়ে তার সঙ্গে হাসি মুখে ভাল ভাল কথা বললে, দু'আ করে রোগ মুক্তির আশার বাণী শুনালে ও সেবা শুশ্রষার মাধ্যমে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। দেখতে যাওয়ার কারণে রোগীর মন সান্ত্বনা লাভ করে, ফলে রোগের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। যে ব্যক্তির অন্তরঙ্গ ও সান্ত্বনা দানকারী বন্ধু বা সাথী তার থেকে পৃথক রয়েছে, তার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা মনোবেদনার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। সংসারে যারা একা, যাদের আপন কেহ নেই- এমন লোকদের একাকীত্বের অনুভূতি তাদেরকে দুর্বল করে দেয়। যাদের নিকটত্বম আত্মীয়-স্বজন অথবা ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধু নেই তাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছা অনেক কমে যায় এবং নিজেকে রক্ষা করার কোন ইচ্ছাই তাদের থাকে না। যদি কোন রোগীকে তার দীর্ঘ

Dhaka University Institutional Repository

জীবন লাভের দু'আ করা হয় তাহলে রোগীর মন অবশ্যই আন্দোলিত ও প্রফুল্ল হবে। রোগীকে যদি বলা হয় যে আল্লাহ চাহেন তো ভয়ের কোন কারণ নেই এবং যদি তার সাথে অতি উত্তম ব্যবহার করা হয় তাহলে রোগীর মনের ভয় দূর হবে, মনে সাহস সঞ্চয় হবে এবং মানসিক শক্তি বেড়ে যাবে। ফলে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। তবে কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার নিকট দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করা ঠিক নয়। কেননা, রুগ্ন ব্যক্তির নিকট বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে তার কষ্ট বেড়ে যেতে পারে। বিশ্রাম রোগীর জন্য খুবই প্রয়োজন।

১০. সদ্য আরোগ্য লাভকারী ব্যক্তির জন্য দ্রুত হজম যোগ্য খাদ্য উত্তম

সদ্য আরোগ্য লাভকারী ব্যক্তির জন্য দ্রুত হজম যোগ্য খাদ্য উত্তম, কেননা তার শরীরের সমস্ত যন্ত্রই দূর্বল। এমতাবস্থায় যদি সে ব্যক্তি কোন শক্ত জাতীয় খাবার অথবা যে খাবার হজম হতে দেরী হয় এমন খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে শরীরে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এমন কি পূনরায় অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। অসুস্থতার ফলে লিভার, পাকস্থলী, প্যানক্রিয়াস সহ অন্যান্য হজম যন্ত্রাদির দূর্বলতার কারণে সদ্য আরোগ্য লাভ কারী ব্যক্তিকে বেশী ক্যালোরি যুক্ত অথবা দেরীতে হজম যোগ্য খাবার দেওয়া উচিত নয়।

১১. রাতের খাবারের গুরুত্ব

রাতের খাবার পরিত্যাগ মানুষকে বৃদ্ধ করে দেয়। বর্তমান যুগে অনেক লোকই অজ্ঞতার কারণে অথবা অভ্যাসগত ভাবে রাতে খাবার খায় না। তাদের ধারণা এতে বদহজমী থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এটা তাদের ভুল ধারণা। তাদের এই অভ্যাস পরিবর্তন করা উচিত। ব্যক্তিগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা অন্য কোন সমস্যার কারণে পরিত্যাগ করলে ভিন্ন কথা। তা না হলে রাত্রের খাবার যৎসামান্য হলেও খাওয়া উচিত। রাত্রের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়া অথবা ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত নয়। কারণ খাদ্য শরীরে ব্যয় না হতে পারলে রক্তে ও শরীরে চর্বি ও গ্লুকোজ বৃদ্ধি করে, ফলে হৃদরোগ ও ডায়াবেটিক্স সৃষ্টি হয়।

১২. মিস্ওয়াকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পাকস্থলীর রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে মিস্ওয়াক দ্বারা দাঁত পরিস্কার করা অপরিহার্য। দন্তরোগের কারণেই পাকস্থলীর প্রায় ৮০% রোগ হয়ে থাকে। দাঁতের মাড়ীর অথবা মুখের ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ খাদ্য-পানির সাথে মিলিত হয়ে অথবা লালার সংমিশ্রণে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে সমস্ত খাদ্যসমূহকে দূষিত ও দুর্গন্ধময় করে তোলে। ফলে এই পুঁজ রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মিস্ওয়াক দাঁতের জন্য উপযোগী যার আঁশগুলো হয় কোমল, যা দাঁতের মধ্যে ফাঁকা বৃদ্ধি করে না এবং মাড়ীতে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে, প্রতিবার খাবারের পরে এবং আছর ও মাগরিবের অজুর পূর্বে মেস্ওয়াক করা স্বাস্থ্য সম্মত। তবে যোহর এবং এশার নামাজের পূর্বে খাবার খেতে হবে, যাতে খাবারের পরের মেস্ওয়াক করা ওজুর পূর্বে হয়। এভাবে দৈনিক ছয়বার মেস্ওয়াক করা উত্তম। তিনটি গাছের ডাল মিস্ওয়াকের জন্য উপযোগী (১) নীম গাছের মিস্ওয়াক (২) বাবলার মিস্ওয়াক (৩) পীলু গাছের মিস্ওয়াক। এই তিনটি গাছের ডালে দাঁত গঠনের মূল উপাদান ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বেশী পরিমাণে রয়েছে। সে কারণে এই তিনটি গাছের মিস্ওয়াক উত্তম।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. অজু একটি স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি

অজুর মাধ্যমে আমরা হাত, নাক, মুখমন্ডল, বাহু, মাথা সহ ঘাড়ের পিছনে এবং পা ধোয়ার মাধ্যমে প্রতিদিন অসংখ্য জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পায়। প্রতিদিন পাঁচবার করে অজু করলে শরীর জীবাণু মুক্ত থাকতে অনেকাংশেই সহায়তা করে। ফলে বিভিন্ন ধরণের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা যায়। অজু আমাদের শরীর ও মন উভয়ই পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে। এই পদ্ধতি রোগ প্রতিরোধের জন্য উত্তম।

১৪. নামায একটি স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি

নামায একটি স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি। ইহা যেমন একদিকে মানসিক প্রশান্তি আনয়ণ করে অপর দিকে একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম যা একজন মুসলমান দৈনিক পাঁচবার করতে পারেন। নামায আদায়ের সময় নামাযের কিয়াম, রুকু, সিজদাহ, বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরের অনেক ব্যায়াম হয়। জামাতে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়া-আসার সময় হাঁটার মাধ্যমে যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। এই ব্যায়াম শরীরের জন্য উপকারি। হাড়ের প্রতিটি জোড়া, চোখ, ঘাড়, রক্তনালি ও হৃৎপিন্ডের জন্য খুবই উপকারি। এতে উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক এবং হৃদরোগের সম্ভাবনা কমে যায়।হ্রাস পায় ডায়াবেটিক্স হওয়ার সম্ভাবনাও। আর ইতিমধ্যেই যাদের ডায়াবেটিক্স রোগ আছে, তাদের ডায়াবেটিক্স থাকে নিয়ন্ত্রণে। শরীরের ওজন থাকে সঠিক। শরীরের মাংশপেশী হয় সুঠাম ও জয়েন্ট বা হাড়ের জোড়াগুলো থাকে কর্মক্ষম। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমেও প্রায় একই ধরনের উপকার পাওয়া যায়। দৈনিক ৩০ (ত্রিশ) মিনিট করে হাঁটলে যেসব শারীরিক উপকার পাওয়া যাওয়ার কথা, দৈনিক নামাযের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়মতান্ত্রিক নড়াচড়ার ফলে তার প্রায় সবই অর্জিত হয়।

১৫. রোযা একটি স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি

রোযা রাখার ফলে খাদ্যনালী, স্বাদ গ্রন্থি বিশ্রাম পায়। রোযা রাখার মাধ্যমে শরীরের বাড়তি ওজন জনিত অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। রোযা রাখলে রক্তের চিনির পরিমাণ কমে। রোযায় রক্তে চর্বি কমে। আর চর্বি কমলে হৃদরোগ ও উচ্চরক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা কমে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য রোযা খুবই উপকারী। হেঁটে মসজিদে গিয়ে এশা ও তারাবির নামায পড়ায় শরীরের যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। মসজিদে যাওয়া-আসার সময় হাঁটার ব্যায়াম এবং নামায পড়ার সময় নামাযের মাধ্যমে ব্যায়াম হয়। দীর্ঘ সময় তারাবিহ্‌র নামাযের মাধ্যমে মাংসপেশী ও হাড়ের জোড়ার ব্যায়াম হয়। অস্থি ও সন্ধি অধিকতর কর্মক্ষম হয়, শরীর হয় ফিট। মাংসপেশী ও হৃদপিন্ডে রক্ত সরবরাহও বেড়ে যায়। হৃদপিন্ডে ও ফুসফুসের কর্ম ক্ষমতা বাড়ে। তারাবিহ্‌র দীর্ঘ নামায শরীরের বাড়তি ওজন কমায়। তারাবিহ্‌র নামাযের পূর্বেই রাতের খাবার খেতে হবে। রোযা মানসিক প্রশান্তি অর্জনে সহায়তা করে। আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রয়াসে মন তৃপ্তিতে ভরে যায় ফলে, মানসিক প্রশান্তি আসে। রোযা রাখার মাধ্যমে মানসিক অবস্থা, চিন্তা ও আচরণ উন্নত হয়। দুশ্চিন্তা ও হতাশা কমে। আত্মশক্তি বাড়ে। ক্রোধ দমন ও সংযমী হতে রোযা যথেষ্ট সহায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. খাদ্য গ্রহণের নিয়মাবলী

যতক্ষণ পর্যন্ত তীব্র ক্ষুধার অনুভূতি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া যাবে না এবং পরিপূর্ণরূপে পেট ভরার পূর্বেই খাবার খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে, তাহলে প্রতিটি মানুষেরই সুস্থতা বজায় থাকবে। দিনে-রাতে তিনবার খাবার গ্রহণ, মধ্যে দু'বার সামান্য নাশতা খাওয়া উত্তম। অতিভোজন নয় কখনো। সারাদিনের খাবারে পরিমাণ মতো শর্করা, আমিষ, তেল, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি থাকতে হবে, যাকে বলে সুষম খাবার। খাদ্য-আঁশও থাকতে হবে খাবারে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও চিকিৎসায়, কোষ্ঠকাঠিন্য, শরীরের ওজন কমাতে, মেদভূড়ি কমাতে, খাদ্যনালি ও স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমাতে খাদ্য-আঁশ উপকারী। বাইরের খাওয়া-দাওয়া করার সময়ও ভাবতে হবে খাবারটা স্বাস্থ্যসম্মত কি না। ধুলাবালি, মাছি, অপরিচ্ছন্নতা, বাসি, পচা বা নিম্ন মানের খাবার থেকে সতর্ক হয়ে খাবার গ্রহণ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তীব্র ক্ষুধার অনুভূতি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া যাবে না এবং পরিপূর্ণরূপে পেটভরার পূর্বেই খাবার খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে, তাহলে প্রতিটি মানুষেরই সুস্থতা বজায় থাকবে।

১৭. স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন

স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। হাত ধোয়া, সঠিক সময়ে পরিমিত আহার, বিশ্রাম, ঘুম, দাঁত মাজা, নখকাঁটা, গোসল, প্রস্রাব-পায়খানা, পোশাক-আশাক, ব্যায়ামের সবকিছুর অভ্যাস হওয়া চাই নিয়মিত ও স্বাস্থ্যসম্মত। প্রকৃতির বিধান অর্থাৎ ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। সময়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে হবে। এশার নামাজের পর ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস এবং ফজরের পূর্বেই ঘুম থেকে জেগে উঠার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

১৮. সুস্থ থাকতে হলে নিয়মিত ব্যায়াম প্রয়োজন

সুস্থ থাকতে হলে নিয়মিত ব্যায়াম প্রয়োজন। যেমন, হাঁটা, জগিং, দৌড়ানো, সাইকেল চালানো, সাঁতারকাঁটা, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা সহ আরো কত কী! হাঁটা একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। সহজ ও মোটামুটি ঝুঁকিহীন কিন্তু উপকার অনেক। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ প্রতিরোধ হবে; শরীরের মেদ কমবে। শরীর থেকে ঘামের মাধ্যমে দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায়, ফলে শরীর ও মন থাকে প্রফুল্ল। প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন একটু দ্রুত (মিনিটে ১০০ কদম) হাঁটলে শরীর থাকবে ফিট। সাঁতারকাঁটা একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। এর মাধ্যমে শরীরের সমস্ত অঙ্গের ব্যায়াম হয়। নিয়মিত ব্যায়াম করলে গ্যাস্ট্রিক, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ্বরোগ, মেদভূড়ি, হৃৎপিন্ডের রোগ, অনিদ্রা ইত্যাদি রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১৯. দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণ

শরীরের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক, রক্তে চর্বির আধিক্য, উচ্চ রক্তচাপ, মহিলাদের স্তন ক্যান্সার ইত্যাদি অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সুতরাং শরীরের ওজন রাখতে হবে সঠিক। এ জন্য একদিকে যেমন চাই পরিমিত খাবার, অন্যদিকে এ খাবার ব্যবহারের জন্য তেমনি চাই পরিমিত ব্যায়াম। যাদের শরীর মোটা তারা একটু কম খেলে এবং বেশি পরিশ্রমের মাধ্যমে শরীরের ওজন কমানো সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

২০. নেশার অভ্যাস ত্যাগ

যে কোন প্রকারের নেশাই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ধূমপান ও মদ পান তার অন্যতম। ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ধূমপানের কারণে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ফুসফুস, মুখ, গলা ও পাকস্থলির ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস, হাঁপানি সহ নানা রোগ হতে পারে। মদ পান মানুষকে ধ্বংশের দ্বার প্রান্তে পৌছে দেয়। মদ পানের মাধ্যমে লিভার, ফুসফুস, হার্ট, কিডনীসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। সুতরাং ধূমপান, মদ পান সহ যাবতীয় নেশা ত্যাগ করা প্রয়োজন।

২১. ব্লাডপ্রেশার নিয়ন্ত্রণ

স্বাভাবিক সিসটোলিক রক্তচাপ ১২০ এবং স্বাভাবিক ডায়াসটোলিক রক্তচাপ ৮০ মিলিমিটার পারদ। সিসটোলিক উচ্চ রক্তচাপই হোক বা ডায়াসটোলিক উচ্চ রক্তচাপই হোক কোনটাই শরীরের জন্য ভালো নয়। হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনির অসুখ অনেক কিছুই হতে পারে। রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকলে ৬ মাস পর পর রক্তচাপ পরীক্ষা করা ভাল। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করা প্রয়োজন।

২২. রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ

রক্তের কোলেস্টেরল পরিমিত পরিমাণ থাকা জরুরী। কোলেস্টেরল আমাদের শরীরকে সুস্থ সবল রাখে। প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে কোলেস্টেরল দুইশত মিলিগ্রামের মধ্যে থাকা উচিত। কোলেস্টেরলের আধিক্যের সমস্যা হচ্ছে অবচেতন ভাবে শরীরের রক্তনালীগুলো বিশেষ করে হৃৎপিন্ডের Coronary Artery তে চর্বির আস্তরণ পড়ে সংকীর্ণ হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপসর্গ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এটা ধরা পড়ে না। নিয়মিত রক্তের Lipid Profile চেক করা সবার জন্য জরুরী। কোলেস্টেরল হিসাব নিকাশে যদি গরমিল থাকে তাহলে অনেক শারীরিক অসুবিধা হতে পারে। 'এইচ ডি এল' হলো ভাল কোলেস্টেরল এবং 'এল ডি এল' হলো মন্দ কোলেস্টেরল। 'এইচ ডি এল' কোলেস্টেরল রক্তের সব কোলেস্টেরলকে লিভারে নিয়ে যায় প্রসেসিংয়ের জন্য, নিষ্কাশনের জন্য। এতে রক্তের কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে, রক্তনালির দেওয়ালে কোলেস্টেরল জমে কম। রক্তনালি ভাল থাকে। উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে। তাই 'এইচ ডি এল' হলো ভাল কোলেস্টেরল। আর 'এল ডি এল' কোলেস্টেরল রক্তনালির দেওয়ালে জমা হয়। রক্তনালির দেওয়ালে ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে পুরু ও শক্ত। ফলে দিনে দিনে বাড়তে থাকে রক্তচাপ; পরিণতি উচ্চ রক্তচাপ। কমে যায় রক্তের প্রবাহ। সম্ভাবনা বাড়ে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের। 'এল ডি এল' হলো মন্দ কোলেস্টেরল। অতএব নিয়মিত ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার মাধ্যমে আমরা রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি।

২৩. রক্তের এইচ ডি এল বাড়ানো এবং এল ডি এল কমানোর উপায়

ঔষধ ছাড়া নিম্ন পন্থা সমূহের মাধ্যমে এইচ ডি এল বাড়ানো এবং এল ডি এল কমানো সম্ভব।

- শরীরের ওজন কমানো।

Dhaka University Institutional Repository

- দৈনন্দিন কার্যাবলীতে কায়িক পরিশ্রম না থাকলে ব্যায়াম করা।
- সকল প্রকার নেশা ও ধূমপান ত্যাগ করা।
- ঘরের তাপমাত্রায় জমে যাওয়া রান্নার তেল অর্থাৎ সম্পৃক্ত তেল পরিহার করা। এগুলোর বদলে অসম্পৃক্ত রান্নার তেল যেমন : যয়তুন, সরিষা, বাদাম, সূর্যমুখী, ভুট্টা ও সয়াবিন তেল ব্যবহার করা।
- আঁশযুক্ত খাবার বেশী খাওয়া। যেমন : সব ধরনের শাক-সব্জী, ফল ও ডাল খাওয়া।
- রসুন ও ইছুপগুল ব্যবহার করা।
- মাছ, বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ বেশী খাওয়া।
- কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাদ্য পরিহার করা। যেমন : লালগোশত, ডিমের কুসুম, কলিজা, মাছের ডিম, চর্বি, হাঁসমুগীর চামড়া, হাড্ডি মজ্জা, ঘি, মাখন, ডালডা, গলদা চিংড়ি, নারিকেল ইত্যাদি।
- সর্বোপরি ডায়াবেটিস থাকলে তা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

২৪. মনমেজাজ নিয়ন্ত্রণ

কিছু কথা বা কাজ আছে যেগুলো করলে মন ভাল থাকে। আবার এমন কিছু কথা বা কাজ আছে যেগুলো করলে মন খারাপ হয়। আমাদেরকে মন্দটা পরিহার করে ভালটা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নে বর্ণিত কাজ সমূহ করলে সুফল পাওয়া যাবে।

- হাসুন প্রাণ খুলে। হাসলে 'এনডরফিন' নিঃসরণ হয়, যা মস্তিষ্কে ভালো লাগার অনুভূতি জাগায়। হাসি খুশি মানুষ সুস্থ থাকে দীর্ঘ দিন। আপনার প্রিয় কাজগুলো করুন। প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান, গল্প করুন, আর প্রাণ খুলে হাসুন।
- ব্যায়াম করুন নিয়মিত। ব্যায়ামে, এমনকি কেবল উঠ-বস করলে, যৌবনের হরমোন 'গ্রোথ হরমোন' এর নিঃসরণ বাড়ে। আর এই হরমোনের জন্য মন ভালো হতে পারে। ব্যায়ামের ফলে মস্তিষ্কে মন ভালো লাগার মতো কিছু 'নিউরোট্রানস্মিটারও' নিঃসরণ হয়।
- হাতের পরশও ভালো করতে পারে মন। পরশেও নিঃসরন হয় 'এনডরফিন', 'গ্রোথ হরমোন'। এগুলো স্ট্রেসের ক্ষতিকর দিক কমায়। নিয়মিত হাতের পরশ পাওয়া রোগীরা পরশ না পাওয়া রোগীদের চেয়ে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

২৫. শিশুর মেধা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয়

যে সমস্ত পরিবারের পিতা-মাতা উভয়ই পরিবারের বাহিরে শুধু মাত্র অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত থাকে এবং তাদের সন্তানদেরকে অন্যের মাধ্যমে লালন-পালন করে, তাদের সন্তানদের পরিপূর্ণ ভাবে মানসিক বিকাশ ঘটে না। পরবর্তীতে এরা মানসিকভাবে অন্যদের থেকে অনেক বিষয়েই পিছিয়ে থাকে। তারা সব সময় হিনমন্যতায় ভোগে। তাদের মন সব সময় দূর্বল থাকে। অতএব শিশুর মেধা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করতে হবে এবং তাদের সাথে সহজ ভাবে মেলামেশা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. অবৈধ যৌন সম্পর্ক ত্যাগ

অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও তার ক্ষতিকর দিক থেকে ফিরে আসতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। পুরুষ এবং নারী উভয়েরই দৃষ্টিকে নিম্ন ও সংযত করে রাখাতে হবে এবং লজ্জাস্থান সমূহের হেফাজত করতে হবে। মহিলারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বেড়ায়। তারা যেন তাদের বক্ষদেশকে মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে। মহান আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ না মানার কারণে আমাদের সমাজে যিনা-ব্যভিচারে ভরে গেছে। মানুষের শরীরে নানা প্রকারের রোগ-ব্যাধি বাসা বেঁধেছে। মানুষের জীবনী শক্তি ও রোগ প্রতিরোধ শক্তি দূর্বল হতে দূর্বলতর হচ্ছে। মানুষ নতুন নতুন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। সিফিলিস, গনোরিয়া, এইড্‌স, ক্যান্সার ইত্যাদি মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করছে। যারা বেঁচে আছে তারাও নানা প্রকার দূরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণায় পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে। বর্তমান সময়ে এমন একটি পরিবারও খুঁজে পাওয়া যাবে না যাদের মধ্যে শারীরিক অথবা মানসিক ব্যাধি গ্রস্ত ব্যক্তি নেই। সমস্ত সমাজই আজ অশান্তিতে ভরপুর। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের রীতিনীতি মানুষের কল্যাণের জন্য। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধি-নিষেধ-মেনে চলা শরীর ও মন উভয়ের জন্যই উপকারী। আর এই বিধি-বিধান না মেনে চললে শরীর ও মন উভয়ই অসুস্থ হয়। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে আজ সমাজে ঘটছে নানা প্রকারের অপরাধ। এর প্রভাবে বাড়ছে অবাধ মিলন, হচ্ছে অবৈধ গর্ভ। ফলে অবৈধ সন্তানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন যুবক যখন নিজেই নিজের যৌবনের অপব্যবহার করছে, তার শরীরে নানা রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। অবাধ যৌনাচারের ফলে মানুষের বিবেক আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? আবার যিনা-ব্যভিচারের মাধ্যমে আমাদের সমাজ হচেছ ক্ষত বিক্ষত। এক পুরুষ বহু নারীতে এবং এক নারী বহু পুরুষে মেলামেশার কারণে একজনের শরীরের রোগ বহুজনের মধ্যে বিস্তার লাভ করছে। এভাবে শত শত বছর ধরে রোগ-ব্যাধি ছড়ানো এবং এর সঙ্গে 'জিনেটিক' প্রভাবে গোটা বিশ্বে নির্মল চরিত্রের পরিবারের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে ঘরের প্রশান্তি বিদূরিত হচ্ছে, অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোটা পরিবেশকে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। অবৈধ যৌন সম্পর্ক অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

২৭. জন্মনিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন ব্যাধির উৎস

জন্মনিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম বিনামূল্যে ও সস্তায় অতি সহজলভ্য করার কারণে সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে দায়িত্বহীন যৌন সম্পর্কের সকল সুযোগ সৃষ্টির পর জন্মরোধ পদ্ধতি এক শ্রেণীর নারীকে ব্যভিচারীনী হতে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে অবাধ যৌন মিলনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। জন্মরোধ পদ্ধতি নারীকে অবৈধ মিলনের সাহস যুগিয়েছে, ফলে সমাজে যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পেয়েছে। এক পুরুষের বহু নারী এবং এক নারীতে বহু পুরুষের অবৈধ মেলামেশার কারণে সমাজে বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সোনার সংসার আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে। এ সমস্ত রোগ-ব্যাধি পুরুষানুক্রমে আজ সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে সিফিলিস, গনোরিয়া, এইড্‌স, ওভারীর টিউমার, বেদনা পূর্ণ ঋতুস্রাব, জরায়ুর ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, বন্ধাত্ব, কিডনী রোগ, লীভারের রোগ ইত্যাদি রোগে আমাদের সমাজ জরাগ্রস্ত। সন্তান কম হওয়ার জন্য ঔষধ ব্যবহার করার ফলেও মহিলারা অগণিত রোগ-ব্যাধিতে

Dhaka University Institutional Repository

আক্রান্ত হচ্ছে। অতএব জন্মনিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন ব্যাধির উৎস হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। সুস্থতার জন্য আমাদেরকে এর বিকল্প চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন।

২৮. রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বর্জন

রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অপরিমিত ব্যবহার স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য হুমকি স্বরূপ। অধিক ফসল প্রাপ্তির আশায় ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি ও ফসলকে পোকা-মাকড়ের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। এই রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বৈজ্ঞানিকরূপে করা হলে খাদ্যদ্রব্য এবং পরিবেশের উপর কম ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। আমাদের দেশের কৃষকেরা কীটনাশকের মত প্রাণঘাতী বিষের যত্র তত্র ব্যবহার করছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, আখ এবং বিভিন্ন প্রকারের সব্জিতে যেভাবে কীটনাশক ব্যবহার করছে তা রীতিমত শরীর শিউরে উঠার মতো। যে পরিমাণে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয় তাতে সমস্ত ফসলই বিষাক্ত হয়ে যায়। প্রতিটি ঔষধের কার্যক্ষমতা অন্তত ৭ থেকে ১৪ দিন। তবে ব্যবহৃত বেশির ভাগ ঔষধের মেয়াদ প্রায় ১৪ দিন। নিয়ম অনুযায়ী ঔষধের কার্যকারিতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন আখ বা সব্জি খাওয়া উচিত নয়। কিন্ত নির্মম বাস্তবতা, ক্ষেতে ঔষধ প্রয়োগের পরের দিনই ক্ষেত থেকে সব্জি সংগ্রহ করা হয়, যা সম্পূর্ণ বিষ যুক্ত। এই বিষ যুক্ত সব্জিই আমরা খেয়ে থাকি। ফলে, খাদ্য বিষের প্রভাবে জীবনীশক্তি দুর্বল হয়ে ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর যাদের জীবনী শক্তি দুর্বল তাদের প্রায় সারা বছরই লিভার এবং পাকস্থলীর বিভিন্ন পীড়া লেগেই থাকে। অতএব রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে আমাদেরকে তার সঠিক ব্যবহার অথবা বিকল্প চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন।

২৯. বিষাক্ত কেমিক্যাল পরিহার

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য যেমন, ভাত বা রুটি, সব্জি, কলা বা ফল-মুল, দুধ, মাছ, পোল্ট্রি মুরগী, ডিম ইত্যাদি যে সমস্ত দ্রব্য আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি এর বেশির ভাগই বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল দ্বারা বিষাক্ত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যেমন, প্লাস্টিক, এ্যালুমিনিয়মের পাত্র স্বাস্থ্য সম্মত নয়। আমরা যে কোমল পানীয় পান করছি তা কিডনীর জন্য ক্ষতিকর। এ সমস্ত ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে আমাদের লিভার, কিডনী, পাকস্থলী, প্যানক্রিয়াস, হার্ট, ফুসফুস এমনকি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষতি গ্রস্থ হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর চেয়ে মাটির পাত্র, কাঁচের পাত্র, চিনামাটির পাত্র ইত্যাদি ব্যবহার স্বাস্থ্য সম্মত। অতএব আমাদের বিষাক্ত কেমিক্যাল পরিহার করা উচিত।

৩০. লিপিস্টিক পরিহার

লিপিস্টিক ঠোঁটের জন্য ক্ষতিকর। লিপিস্টিক ব্যবহারের ফলে ঠোঁটের আদ্রতা ও মসৃণতা হ্রাস পায়। অনেক সময় এর ব্যবহারের ফলে ঠোঁট ফেঁটে যায় নতুবা ঠোঁটে ছত্রাক জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে এ কারণে ঠোঁটের জন্য লিপিস্টিক খুবই ক্ষতিকর। কিছু কিছু ব্রান্ডের লিপিস্টিকে 'রোডামিন বি' ও 'ব্রিলিয়েন্ট বু' নামের যে রঙ থাকে, তা ক্যান্সার সৃষ্টির সাথে জড়িত। অতএব আমাদের লিপিস্টিক পরিহার করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. নখপালিশের ব্যবহার পরিহার

বর্তমান যুগের মহিলারা নখের যে পালিশ ব্যবহার করে তা নখের জন্য খুবই ক্ষতিকর। নখপালিশ নখের বায়ুকূপ বন্ধ করে দেয় এবং নখের স্বাভাবিক আদ্রতা শোষণ করে। এর ব্যবহারে নখের উপর আস্তরণ জমে যায়। এ ধরনের অবস্থায় ফরজ গোসল ও অজু বিশুদ্ধ হয় না" নখপালিশের প্রধান রাসায়নিক উপাদান 'ফরমালডিহাইড প্লাস্টিক' ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে 'নিকেল'। 'ফরমালডিহাইড প্লাস্টিক' ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। এর থ্যালেট লিভার, কিডনী ও প্রজননতন্ত্রের ক্ষতি করে। নেইলপালিশের টলুইন অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থিগুলোর কার্যক্রমে কিছু বিঘ্ন ঘটায়। এর জন্য শিশু বিকোলাঙ্গ হয়ে জন্মানোর আশংকা থাকে। অতএব এ ধরনের ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার না করাই স্বাস্থ্য সম্মত।

৩২. নিয়োমিত নখ কাটা

লম্বা নখ রাখা বর্তমানে ফ্যাশন মনে করা হয়। অথচ এটা মারাত্মক নোংরামী। লম্বা নখ জীবাণু বহন করে, ফলে ক্রৃমি ও ডায়রিয়া সহ নানাবিধ মারাত্মক রোগ হতে পারে। নিয়োমিত নখ কেঁটে পরিচ্ছন্ন রাখা স্বাস্থ্য সম্মত ও সুরুচির পরিচয় বহন করে। অতএব আমাদের সকলকে সপ্তাহে অন্তত একবার নখ কাটা প্রয়োজন।

৩৩. ক্ষতিকর সুগন্ধি বর্জন

যে সব জিনিস মানব মনে উত্তেজনা বা আলোড়ন সৃষ্টি করে, তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম কিছু নিয়ম-কানুন বেধে দিয়েছে। বর্তমান সময়ে বাজারে অনেক ধরনের সুগন্ধি (পারফিউম) পাওয়া যায় যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এটা 'এসেনশিয়াল ওয়েল' এবং কিছু রাসায়নিক যৌগের মিশ্রণ। সুগন্ধটা নির্ভর করে ব্যবহারিক যৌগের উপর। পারফিউমে মিশ্রণ হিসাবে ব্যবহার করা হয় বালসাম, বেনজাইল, স্যালিসাইলেট ইত্যাদি। এগুলো ব্যবহারের ফলে চামড়ায় একজিমা, ইরাইথেমা বা লাল স্ফীতি, শোথ ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। আরো ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হিসেবে চামড়ায় 'বারলকডার্মাটাইটিক' নামক জটিল চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। পারফিউম ও ওডি কোলনের ৮ মেথোক্রিসোরালেন নামের রাসায়নিক উপাদানটি চামড়ার রঙ বাদামী হতে কালচে হয়। অতএব এ ধরনের সুগন্ধি ব্যাবহার না করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

৩৪. নিয়মিত হাঁটা

সাধারণত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে মেদভূড়িসহ শরীরের অন্যান্য রোগ হয়ে থাকে। মেদভূড়ি জীবনের জন্য অসস্তিকর ও কষ্টদায়ক। মেদভূড়ির জন্য মানুষ কত রকম অশান্তি ভোগ করছে। কোন ব্যক্তি যদি পেটের এক ভাগ খাবার, এক ভাগ পানি আর এক ভাগ খালি রেখে খাওয়া-দাওয়া করে এবং নিয়মিত শারিরীক কাজ-কর্ম ও হাঁটা-চলা করে তাহলে তার মেদভূড়ি হতে পারে না। আর যে ব্যক্তির মেদভূড়ি হয়েছে সে ব্যক্তি চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে কিছু ঔষধ সেবন সহ দৈনিক ৫ কিলোমিটার (মিনিটে নূন্যতম ১০০ কদম) নিয়মিত হাঁটলে মাত্র ৪০ দিনেই মেদভূড়ি কমে যাবে। নিয়মিত হাঁটলে শরীর অন্যান্য রোগ-ব্যাধি থেকেও মুক্ত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. হৃদরোগ প্রতিরোধে ইসলামের বিধান

হার্টের অসুখ, হার্টের রক্তনালির অসুখ, এ সবই হৃদরোগ। হৃদরোগ মারাত্মক রোগ। মৃত্যুর অন্যতম কারণ। নানা কারণে হৃদরোগ হয়ে থাকে। নিয়মিত ব্যায়াম উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়ক। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি। চর্বিযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া এবং ব্যায়াম না করা, কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ার বড় কারণ। চর্বিযুক্ত খাবার খেতে হবে কম, ব্যায়াম করতে হবে বেশি। ব্যায়াম করলে হৃদযন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ে। নিয়মিত ব্যায়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়ক। প্রতিদিন ৩০ (ত্রিশ) মিনিট করে সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন ব্যায়াম করলে রক্তচাপ কমবে প্রায় ৪ থেকে ৯ মিলিমিটার। মাত্র কয়েক সপ্তাহেই এরূপ ফল পাওয়া যাবে। নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে রক্তচাপ গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকবে। ইসলামী জীবনযাপনে দৈনন্দিন বেশ ব্যায়াম হয়। একজন মুসলমান দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার ফলে কিয়াম, রুকু, সিজদাহ, বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরের অনেক ব্যায়াম হয়। আর জামাতে নামায পড়ার সময় মসজিদে যাওয়া-আসার সময় হাঁটার মাধ্যমে যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। এই ব্যায়াম শরীরের জন্য উপকারি, হাড়ের প্রতিটি জোড়া, চোখ, ঘাড়, রক্তনালি ও হৃৎপিন্ডের জন্য ভালো। হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে হলে খাবার হতে হবে হৃদবান্ধব ও পরিমিত। ফলমূল, শাকসবজি আর আশযুক্ত খাবার খেতে হবে বেশি। তেল-চর্বি খেতে হবে অবশ্যই কম। বিশেষ করে, স্যাচুরেটেড তেল। মাছের তেল ভাল, মাছ খাওয়া যাবে বেশি। খাবার খেতে হবে কম, কারণ বেশি খেলে রক্তে চিনি ও চর্বির পরিমাণ বাড়ে। শরীরে মেদ জমে, শরীর বেশি মোটা হয়ে যায়। মোটা শরীরে ডায়াবেটিক্স, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি রোগ বেশি হয়। এরূপ শরীরে হৃদরোগের ঝুঁকিও বেশি। ইসলাম ক্রোধ পছন্দ করে না। রাগান্বিত হওয়ার দুই ঘন্টার মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অন্য সময়ের চেয়ে মুটামুটি দুই গুণ বেশি। ধৈর্য-ধারণ ও অত্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে হৃদরোগের হঠাৎ অক্রমন হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৩৬. সাধারণ জীবন-যাপন

সাধারণ জীবন-যাপন শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। পুরুষ ও মহিলা উভয়ে কাজের ধরণ অনুপাতে সংসারে নিজেদের কাজ নিজেরা করলে দিনের প্রয়োজনীয় ব্যায়ামের অনেকাংশই হয়ে যায়। যেমন, কাপড় ধোয়া, নিজেদের ঘর বাড়ি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, পানি আনা, খাবার রান্না করা, শিশুদেরকে খাবার খাওয়ানো, সেলাই করা, কাপড় বুনোনো ইত্যাদি। এই ব্যায়ামের মাধ্যমে নারী-পুরুষ অগণিত রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পায়। ফলে শরীর ও মন উভয়ই ভাল থাকে। নারী-পুরুষের মধ্যে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, মূত্র পাথরী, কিডনী পাথরী, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, মেদ, শিরা-উপশিরার খিঁচুনি, বিভিন্ন ধরনের স্ত্রী রোগ, স্নায়ুবিকদূর্বলতা, অস্থিরতা, অনিদ্রা, আত্মহত্যা ও মানসিক রোগের মতো কঠিন কঠিন রোগের প্রকোপ কমে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. সুস্থ থাকার সহজ উপায়

ঢিলে-ঢালা সুতি কাপড় পরিধান করা, পরিমিত আহার এবং পায়ে হেঁটে চলার অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে সুস্থ জীবন-যাপন পালন করা সম্ভব। খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও সচেতনতার মাধ্যমে অতি সহজেই পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা যায়। দৈনন্দিন জীবন-যাপনের জন্য খাদ্য হিসাবে আমরা কি গ্রহণ করবো? কখন (কোন্ সময়ে) গ্রহণ করবো? কতটুকু পরিমান গ্রহণ করবো এসম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান এবং পরিকল্পনা থাকতে হবে। খাদ্য দ্রব্য রান্নার সময়ে পুষ্টির অপচয় রোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে শুধুমাত্র পরিবারের ভূমিকায় যথেষ্ট নয়, রাষ্ট্রীয় ভাবে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। ইসলামের প্রতিটি বিধানই স্বাস্থ্য সম্মত, অতএব ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করাই সুস্থ থাকার সহজ উপায়।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যানে উন্নত হয়েছে জীবন যাপন-পদ্ধতি। বিরামহীন ভাবে মানুষ ছুটে চলেছে সুখের আশায়, কিন্তু সুখ কোথায় ? স্বাস্থ্যই মানুষের সকল সুখের মূল। বিশ্ব-আধুনিকায়নের যুগে মানবের জীবন পদ্ধতি হয়েছে জটিল ও কুটিল। প্রভাব পড়েছে মন ও শরীরের উপর। আজ আমরা ভুলে গেছি সব আদর্শ, বিসর্জন দিয়েছি সব নৈতিকতা, ধারন করেছি সব মন্দ। আমাদের কথা, কাজ, শিক্ষা, জীবন-ধারনের পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় উপকরণ, এমনকি স্বাস্থ্য রক্ষাকারী ঔষধ পর্যন্তও আজ স্বাস্থ্য সম্মত নয়। সর্বোপরি মানবের মন আজ অসুস্থ, দেহ জরাজীর্ণ। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি ও স্বাভাবিক জীবন-যাপনের দিক নির্দেশনা একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। ইসলাম নির্দেশিত জীবন-যাপন, শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এ ছাড়াও আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজ নিজেরা করার মাধ্যমে দিনের প্রয়োজনীয় ব্যায়ামের অনেকাংশই পূরণ করা সম্ভব। অতএব, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলামের দিক নির্দেশনা মেনে চললে আমরা রোগ-ব্যাধির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি এবং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণের আশা করতে পারি।

ইসলামে স্বাস্থ্য সুরক্ষা মানব সেবার অন্যতম একটি মাধ্যম। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা সম্পর্কিত বহুবিধ তথ্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসে উপস্থাপিত হয়েছে। **"স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলামের দিক নির্দেশনা : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভে ইসলামের চিকিৎসা সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। অতপর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক ইসলামী জ্ঞান ও দিক নির্দেশনা সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। অত্র গবেষণার প্রথমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে স্বাস্থ্য পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সর্ম্পকে আলোকপাত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত স্বাস্থ্য সুরক্ষার গুরুত্ব কত বেশী তা বুঝানোর জন্য আল-কুরআনে বর্ণিত এবং এতদ্‌সম্পর্কিত বেশ কিছু হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। যা থেকে আমরা সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করতে পারি যে, ইসলামে স্বাস্থ্য সুরক্ষা জীবনঘনিষ্ট একটি বিষয় এবং ইসলাম এ বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে।

পর্যালোচনায় দেখানো হয়েছে ইসলামকে অধিকাংশ মানুষ একটি ধর্ম হিসেবে মানে। তারা জানেনা ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা (আল-কুরআন, ৩ : ১৯)। এদেশের মানুষ ইসলামের অনুশাসন গুলো অত্যন্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে। তাই তাদের যদি বুঝানো যায় যে, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে তারা স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসায় ইসলামী নীতি পদ্ধতি অনুসরণ করতে সচেষ্ট হবে। তবে এক্ষেত্রে আলেম সমাজের ভূমিকা ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা একান্ত প্রয়োজন।

রাসূলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদার শাসনকাল পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি-পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ঈমানের বলে বলীয়ান হওয়ার পাশাপাশি সুস্থতা ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। দূর্ভাগ্য মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

জাতির, আজ তারা ইসলামের সুমহান নীতি-আদর্শের বরকত থেকে বঞ্চিত। মুসলিম দেশগুলো আজ সমস্ত প্রকার নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত। ফলে তারা আজ বিভিন্ন প্রকার রোগ-শোকে জর্জরিত। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল জাতি-রাষ্ট্রে ইসলামের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব হলে সাধারণ রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে মহান আল্লাহর দয়ায় সুন্দর ও সুস্থ জীবন যাপন করার প্রয়াস পাবে।

দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে অত্র গবেষণায় এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বে আজও যদি ইসলামের স্বাস্থ্যবিধি মোতাবেক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে মানবজাতি অগণিত রোগ-ব্যাধি হতে মুক্ত থেকে সুস্থ-সবল জীবন লাভ করতে পারবে। সেই সাথে অনাকাঙ্খিত রোগ-ব্যাধির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ-সুন্দর জীবন যাপনের সুযোগ পাবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থণা করছি তিনি যেন মানুষের খেদমতে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন। সেই সাথে এ কামনা করছি যে, দয়াময় মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলা সবাইকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত তালিকা

আল-কুর'আন ও তাফসীর

- আল-কুর'আন
- আল জাসসাস, *আহকামুল কুর'আন,* দারুল মা'আরিফা, কায়রো: ১৪০১ হি.
- ইসমাঈল ইব্ন কাছির, *তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম,* দারুল মা'আরিফ, বৈরুত: ১৯৮৩ খ্রি.
- তরজমা ও সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, *আল-কুর'আনুল করীম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ২২তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রি.
- মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তাফসীরে নূরুল কুর'আন,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: জুলাই ১৯৮৮ খ্রি.
- মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল-কুরতুবী, *আল-জামিলি আহকামিল কুর'আন,* তাহকীকুত তুরাস, কায়রো: ১৯৮৭ খ্রি.
- মুহাম্মদ ইবন্ জরীর আত-তাবায়ী, *জামিউল বয়ান আত-তাবীলির আ'ইল কুর'আন,* দারুল ফিকর, বৈরুত: ১৪৫ হি.
- রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারায়িব আল-কুরআন,* মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, কায়রো: ১৩২৪ হি.
- সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসির ফি যিলালিল কোরআন,* (অনুবাদ হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ), আল কোরআন একাডেমী, লন্ডন: সেপ্টেম্বর ২০১০ খ্রি.
- হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফি' (র), *পবিত্র কোরআনুল করীম (মূল:তাফসীর মা'আরেফুল ক্বোরআন),* অনুবাদ ও সম্পাদনা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, খাদেমূল-হারমাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ঢাকা: ১৪১৩ হি.
- হাফেজ আল্লামা ইমামুদ্দিন ইব্নু কাসীর (রহঃ), (বঙ্গানুবাদ ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান), *তাফসীর ইবনে কাসীর,* হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, বংশাল, ঢাকা: জুলাই ২০১০ খ্রি.

আল-হাদীস

- আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল বুখারী আল-জুফী (র), *আস-সহীহ,* ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: জুন ২০০৩ খ্রি.
- আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল কাযবীনী, (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ ও মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক), *সুনানু ইবনে মাজাহ্,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রি.
- আবূ আব্দুল্লাহ মালিক ইব্ন আনাস, *মুয়াত্তা,* দারুল ফিকর, বৈরুত: ১৯৯৫ খ্রি.
- আহমদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ,* দারুল মা'আরিফ, বৈরুত: ১৪০৯ হি.

Dhaka University Institutional Repository

- আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমান আদ-দারেমী, *সুনানে দারেমী,* দারুল মা'আরিফ, বৈরুতঃ ১৪১২ হি.
- আবূ জাফর আহমদ আত-তাহাবী, *শারহু মা'আনিল আসার,* দারুল কুতুবুল ইসলামিয়া, বৈরুতঃ ১৩৯৯ হি.
- আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আশ-শায়বানী, *মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (রহ),* অনু. মুহাম্মদ মূসা, ইসলামিক ফউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ আগস্ট ১৯৮৮ খ্রি.
- ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র), (অনুবাদ মাওলানা আফলাতুন কায়সার), *সহীহ মুসলিম,* বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকাঃ জুন ১৯৯৯ খ্রি.
- ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (র), (অনুবাদ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী), *সুনানু নাসাঈ শরীফ,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ জুন ২০০৮ খ্রি.
- মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী (র), (অনুবাদ মাওলানা সাঈদুল হক), *মা'আরিফুল হাদীস ৩য় খন্ড,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকাঃ তা. বি.
- মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ,* কুতুবখানা রশিদীয়া, দিল্লীঃ ১৩৮৭ হিজরি
- সম্পাদনা পরিষদ কতৃক সম্পাদিত, *তাজরীদুস্ সিহাহ্* (পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ্ হাদীস) ১ম খন্ড, ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ জুন ১৯৯৭ খ্রি.

বিশ্বকোষ

- সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া, (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ), বাংদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকাঃ প্রথম প্রকাশ ২০০৩ খ্রি.
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* প্রথম খন্ড, ই.ফা.বা. ঢাকাঃ পঞ্চম সংস্করণ, মে ২০০৭ খ্রি.

অভিধান

- Prof. Md. Nur nobi, *Oxford Dictionary of contemporary English,* Joneki prokashani, Dhaka: March 2012.
- ডক্টর মুহাম্মদ এনামূল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,* বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ পরিমার্জিত সংস্করণ, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১১ খ্রি.

ফিকহ

- আবুল হাসান আল-বালাযুরী, *ফতুহুল বুলদান,* দারু মাকতাবাতিল হিল্লাল, বৈরুতঃ ১৯৮৮ খ্রি.
- আব্দুল্লাহ যায়ল'ঈ, *নাসবুর রায়াহ,* দারুল হাদীস, কায়রোঃ ১৩০৫ হি.

Dhaka University Institutional Repository

- আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, *কানুযুল উম্মাল,* মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত: ১৯৮৫ খ্রি.
- আহমাদ শারাবী, *আল-হুকমাতুল ইসলামিয়া,* দারুল আরব, কায়রো: ১৯৯১ খ্রি.
- আবূ মুহাম্মদ বদরুদ্দীন আল-আইনী, *উমদাতুল কারী,* মাকতাবাতে রশিদীয়া, দিল্লী: ১৯৮১
- ইমাম আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ,* দারুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, লাহোর: ১৯৮৬ খ্রি.
- ড. আবদেল রহীম উমরান, *তানজিম আল উসরাত ফীত তিরাসিল ইসলামী,* জামেয়া আল-আযহার, কায়রো: ১৯৯৪ খ্রি.
- ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিলাতুহু,* দারুল ফিকর, বৈরুত: ১৯৮৯ খ্রি.
- সাইয়েদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ,* দারুল ফাতহ লিল ইলমিল আরাবী, কায়রো: ১৯৯০ খ্রি.

বিবিধ

- অধ্যাপক খুরশীদ আলম, *ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি,* আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা: ১৯৯০ খ্রি.
- অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ্, *সুস্বাস্থ্যের জন্য,* ঐতিহ্য, ঢাকা: ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রি.
- অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম ও স্বাস্থ্য,* ঐতিহ্য, ঢাকা: ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রি.
- আবুল ফাদাল মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানযূর, *লিসানুল আরব,* নাশরু আদবিল হাওযা, ইরান: ১৪০৫ হি.
- আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,* বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা: জুন,১৯৯৪ খ্রি.
- আহমাদ মুহাম্মদ আস্‌সাফ, *আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম,* দারুল ইহয়া'ইল 'উলূম, বৈরূত: ১৯৮৮ খ্রি.
- আবদুল হামীদ তাহমায, *আল-ফিকহুল হানাফী ফী ছাওবিহিল জাদীদ,* দারুল কলম, বৈরূত: ২০০১ খ্রি.
- আবদুর রহমান ইবনু খালদুন, *আল-মুকাদ্দামাহ,* অনু: গোলাম সামাদানী কোরায়শী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৮৯ খ্রি.
- আব্দুল মতিন, *মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০,* মাদল প্রকাশনী, ঢাকা: ১৯৯৫ খ্রি.
- ইবনুল জাওযী, *আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তফা,* লায়ালপুর, পাকিস্তান: ১৯৭৭ খ্রি.
- ইমাম গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন,* ভাষান্তর: মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা: সেপ্টেম্বর ২০০৪ খ্রি.
- এ.কে. নাজিবুল হক, *মন ও মনোবিজ্ঞান,* সম্পাদনা: এ খালেক ও এ. ইউ. আহমেদ, ঢাকা: ১৯৮৯ খ্রি.
- এ. কে. নাজিবুল হক, *মন ও মনোবিজ্ঞানী,* সৃজনী প্রকাশনী, ঢাকা: ১৯৮৯ খ্রি.
- এ. কে. এম. নাজির আহমেদ, *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি,* বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা: ফেব্রুয়ারী ২০০৫ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

- এ. কে. এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলাম নেশা,* মা প্রকাশনী, ঢাকা: ১৯৯৩ খ্রি.
- এ. কে. এম. মনিরুজ্জামান, *মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন,* খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা: ১৯৯৯ খ্রি.
- ওয়াকিল আহমদ, *মুসলিম বাংলার বিদেশী পর্যটক,* নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা: ১৯৬৪ খ্রি.
- কালকাশান্দী, *সুবহুল 'আশা,* আল-মাতবা'আতুল আমীরিয়্যা, কায়রো: ১৯১৪ খ্রি.
- গোলাম মোস্তফা কিরন, *আজকের বিশ্ব,* প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ৩৬ তম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রি.
- গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী,* আহমেদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা: ১৯৯৩ খ্রি.
- জাওয়াদ আলী, *আল-মুফাছ্ছল ফী তারীখিল আরব কাবলাল ইসলাম,* দারুল 'ইলম, বৈরূত: ১৯৭১ খ্রি.
- ড.ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান,* অনু: মুহাম্মদ আবদুর রহীম, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা: ১৯৯৫ খ্রি.
- ড.আবদুল কারীম যায়দান, *আল-মুফাছ্ছল ফী আহকামিল মার'আতি ওয়াল বায়তিল মুসলিমি,* মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরূত: ১৯৯৭ খ্রি.
- ড.আহমাদ আলী, ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক, পাইওনিয়ার ট্রাস্ট, চট্রগ্রাম: ২০০৫ খ্রি.
- ড.আহমদ আলী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক পর্দা ও সাঝসজ্জা,* বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা: ২০১০ খ্রি.
- ড.মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: আগস্ট ২০০৪ খ্রি.
- ড.দেওয়ান আব্দুর রহীম, *স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে ইসলাম,* এশিয়া পাবলিকেশনস, ঢাকা: ২০০৬ খ্রি.
- ড.মোঃ মামুনুর রশীদ, *মৌলিক পুষ্টি পরিচিতি,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ফেব্রুয়ারী ২০০৩ খ্রি.
- ড.মরিস বুকাইলি, অনুবাদ আখ্তার-উল্-আলম, *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান,* জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা: সপ্তম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৬ খ্রি.
- ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, অনুবাদ, হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আধুনিক বিজ্ঞান, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড,* আল-কাওসার প্রকাশনী, ঢাকা: নভেম্বর ২০০৯ খ্রি.
- ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, অনুবাদ, হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আধুনিক বিজ্ঞান, তৃতীয় ও চতুর্থ খন্ড,* আল-কাওসার প্রকাশনী, ঢাকা: নভেম্বর ২০০৯ খ্রি.
- ডাক্তার এম. এ. ওয়াহেদ *চক্ষু চিকিৎসার বিকাশে ইসলামের অবদান,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: সেপ্টেম্বর ১৯৮০

Dhaka University Institutional Repository

- ডাঃ ইবনে আখতার, *যুগে যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানী,* মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ খ্রি.
- ডাঃ জি. দীর্ঘাঙ্গী, *অর্গ্যানন,* রায় পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা: ১৯৯৯ খ্রি.
- ডাঃ নীলমণি ঘটক, *প্রাচীন পীড়ার কারণ ও তাহার চিকিৎসা,* দি হ্যানিম্যান হোমিও ফার্মেসী, কলিকাতা: পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০১ খ্রি.
- ডাঃ এস. এন. পান্ডে, *ফিজিওলজী শিক্ষা,* আদিত্য প্রকাশালয়, কলিকাতা: পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৯ খ্রি.
- ডাঃ এস. এন. পান্ডে, *এ্যানাটমি শিক্ষা,* আদিত্য প্রকাশালয়, কলিকাতা: চতুর্দশ সংস্করণ মাঘ ১৪০১ ব.
- প্রফেসর, ড. এমাজউদ্দীন আহ্মদ, *ইসলাম ও উন্নত জীবন ব্যবস্থা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.
- প্রফেসর, ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, *ইসলামে পোষাক : প্রাথমিক সূত্র ও শর্তসমূহ,* সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ঢাকা: ২০০৩ খ্রি.
- প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুয্ যমান, *তিব্বে নববী (স),* হক লাইব্রেরী, বাইতুল মুকাররম, ঢাকা: মার্চ ২০০২ খ্রি.
- ফুয়াদ আল খতীব, *ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা,* বাংলাদেশ-সৌদিআরব মৈত্রী সমিতি, ঢাকা: জুলাই, ১৯৮০ খ্রি.
- মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস আশ-শাফিঈ, *আল উম্ম,* দারুল মাআরিফাহ, বৈরুত: তা. বি.
- মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান,* আহসান পাবলিকেশন, ফ্রেব্রুয়ারী, ঢাকা: ২০০৮ খ্রি.
- মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম,* ই.ফা.বা. ঢাকা: মে ২০০৭ খ্রি.
- মুহাম্মদ ওয়াজিদুর রহমান ও মোঃ সাহাব উদ্দীন, *ইসলামী শিক্ষা পরিচিতি,* পূর্বদেশ পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ১৯৯৬ খ্রি.
- মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা,* আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা: ২০১০ খ্রি.
- মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, *বেহশতী জেওর,* অনু : মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, খ. ৫ বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি:, ঢাকা: ১৯৯৭ খ্রি.
- শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, *আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ,* মাকতাবাতে রশিদীয়া, দেওবন্দ: ১৪১২ হি.
- শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ,* কুতুবখানা রশিদীয়া, দিল্লী: ১৩৭৩ হি.
- সাইয়েদ কুতুব, *আল-ইসলাম ওয়া সালামূল আলম,* দারুস সালাম, বৈরুত: ১৯৯৩ খ্রি.
- সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ২০০০ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

- সম্পাদনা পরিষদ *খাদ্য, পুষ্টি রোগব্যাধি,* বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, ঢাকা: সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ খ্রি.
- সুকুমার সাহা, *মাদকদ্রব্য, সমাজ ও আইন,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৯১ খ্রি.
- সৈয়দ আমীর আলী, *দি স্পিরিট অব ইসলাম,* অনুবাদ: মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৯৩ খ্রি.
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *হযরত রাসূলে করীম (সা) : জীবন ও শিক্ষা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৯৭ খ্রি.
- হাফিজ ইব্ন হাযম, *আল-আহকাম,* মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, কায়রো: ১৪১০ হি.
- S. Dheer, Dr. Mitra Basu, *Indruction to Health Education,* Frends publications, 6, Mukherjee Tower, Mukherjee Nagar, com. Complex, Delhi-110009, India: N.D

পত্র-পত্রিকা

- ডা. নাজমূল আলম, প্রসাধনী, *মাসিক পৃথিবী,* নভেম্বর ১৯৯৪ খ্রি.
- ডা. দিদারুল আহসান, রমণীর মুখের রঙ বদলাতে মলম, *দৈনিক নয়াদিগন্ত,* ২৩ মার্চ ২০০৮ খ্রি.
- *দৈনিক প্রথম আলো,* ১৮ অক্টোবর ২০১২ খ্রি.
- *দৈনিক প্রথম আলো,* ১৮ অক্টোবর ২০১২ খ্রি.
- *দৈনিক প্রথম আলো,* ১৮ অক্টোবর ২০১২ খ্রি.